শুকতারা

শারদীয় ১৪০৫

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

★ এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২% শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।

★ আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।

★ 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধা আছে।

★ মনে রাখবেন এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।

★ ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।

★ ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা, গড়িয়াহাট,
গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগণা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১টি শাখা আছে।

দিবা ও সন্ধ্যা শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি

শারদীয় ১৪০৫

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত ঃ ১৩২৫ বঙ্গাব্দ/১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা, ১৯৯৮

সম্পাদকমণ্ডলী

সুনীলকুমার ঘোষ	ঃ	সভাপতি
শিশির গুপ্ত	ঃ	সহ-সভাপতি
বাপ্পা রায়	ঃ	সদস্য
সুভাষ রাহা	ঃ	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	ঃ	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	ঃ	সদস্য

সম্পাদক ঃ বিনয়গোপাল মিত্র

মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মানবসাধন বিশ্বাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১ ফোন ঃ ২২০- ৮১৯৮

সম্পাদকীয়

উপন্যাস

বিনয়গোপাল মিত্র — অসময়ে সময় নেই

প্রবন্ধ

সুনীল ঘোষ — ভারতীয় রেলমন্ত্রীদের অমূল্য অবদানসমূহ

প্রসাদ ভট্টাচার্য — শ্রমিক নেতৃত্বে ঔচিত্য প্রতিষ্ঠা

তরুণ সান্যাল — প্রকৃতির নির্বাচন

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু — 'আমার জন্মদাতা ও ধাত্রী' : প্রসঙ্গ ঘোষ

জোছনারা দত্ত — বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও চিও-র ভূমিকা

পরিমল চৌধুরী — সভ্যের সন্ধানে

অমীম রায় — সমবায় শিক্ষায় সমবায় সংস্থার আন্তরিকতা

কমলেশ মুখোপাধ্যায় — ইন্টারনেট

সুজয় মৈত্র — জন্মান্তরবাদ নিরসন

দীপালী ঘোষ — প্রতিশ্রুতিরক্ষার সংগ্রামে

মৌসুমী বসু — শিশু শ্রমিক

অরুণোদয় সান্যাল — পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনতম সমবায় সমিতি

অমিয় মজুমদার — জাতীয় ফ্রেমপাটে সমবায় আন্দোলন

ড. দুলালচন্দ্র সেন — পল্লী সুরভি

অনুবাদ গল্প

মানবসাধন বিশ্বাস — চার টাকা ০১

অমিত মজুমদার — যে রাতে আমার জন্ম হয়েছিল ০১

দেবেশ রায়	এবারই নিয়ে আসব	১
নীল গঙ্গোপাধ্যায়	উমেশের আড়াল	৮৭
নিবেদন সাহিড়ি	হিমঘরে অনুপ্রবেশ	১৭
মুকুলেশ মুখোপাধ্যায়	আশ্রয়	৪৩
জীবন সরকার	সমুদ্রমন্থী	১৭৪
প্রবীণকুমার জমাদার	আর পথের শেষের	১০৩
সমর বসু	মোহনীয়	১৩১

শুভেন্দুশেখর ঘোষ	সমুদ্র কালসাগরে রাজা এঁকেছে মুকুটের অনন্ত ছবি	৪৭
অমল বসু	আমার খেলা? না আমার খেলা।	২৩
অর্ঘ্য ঘোষ	টৌরাল মুকুটল এবং এদেরে বিবরণ	১১৫

নবকুমার ঘোষাল	মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ	১৫১

বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	এই আঁধারে	৫৫
কৃষ্ণ ধর	এ রক্ত তার ঘরে প্রয়োজন	৫৬
আশিস ঘোষ হালদার	উপেক্ষাইনাস	৫৬
বিজন রাজগুরু	পরিণতি	৫৫
সাজাদ হোসেন	একা	৫৭
বীরেন সাহা	চেতনা	৫৭
প্রদ্যুম্নকুমার ঘোষ	অভিমান	৫৭
পরমেশ্বর মুখোপাধ্যায়	এক নক্ষত্রে চৈতালি	৫৮
বিজনবালা টোধুরী	সেই দিন	৫৮
অপরাজিতা চৌধুরী	কে কোথায় নিজেকে	৫৯
অমলকান্তি রায়চৌধুরী	চৌদ্দে ফেব্রুয়ারি	৫৯
অমিয় মুখোপাধ্যায়	অনেক কথা বাকি	৬০
টৌরাল হালদার	একটা কবিতা	৫৮
কাজী মুসলিমুল আরেফিন	অন্তরীন	৬২
অমিত চৌধুরী	বৃষ্টির আলো	৬১
উমি দে	নিজে দেখা	৬১
অনুপম চট্টোপাধ্যায়	সমীক্ষা	৬১
প্রবীরকুমার সরকার	উপেক্ষা	৬২
অমিতাভ দাস	আরো অনেক পরে ফেরি হাতে শেষল	৬৩
সৌমেন্দু রায়	অন্ধ এক সূর্যের পথরে	৬৩

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণভাণ্ডারে মুক্ত হস্তে দান করুন

পশ্চিমবঙ্গে এবারের ভয়াবহ বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে এখন পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে ৭২। শারদ আনন্দ প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত এ-সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বোঝা যাচ্ছে না। কারণ বাংলাদেশ থেকেও জল ঢুকছে। পশ্চিমবঙ্গের সব নদীতেই জল বাড়ছে। ভীষণ ভয়ঙ্করের রূপ এবারই ভয়াবহ যে সেনাবাহিনীও ত্রাণে মৃত্যুর খবর সন্ধানীন। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত। দিনে-রাতে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পানীয় জলের সঙ্কটের সাথে রাতের অন্ধকার ভয়ঙ্করকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে শারদোৎসব এসে গেল। উৎসবের আয়োজনও চলছে। এই আয়োজনের প্রাক্কালে আমুল আবদ্ধ সবাই ভাবি বানভাসি দুর্গত মানুষদের কথা। তাঁদের পাশে দাঁড়াই মানসিক ও আর্থিক শক্তি নিয়ে পূজার আড়ম্বর ও পূজা উপলক্ষে পারিবারিক খরচের বাহুল্য বর্জন করে - ব্যয় বরাদ্দের বেশির ভাগ বন্যাত্রাণেই এখন আমাদের দান করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি অঞ্চলের কষ্টকে আমরা কেন সারা পশ্চিমবঙ্গের কষ্ট বলে ভাবি।

এ-বিষয়ে সমবায় সমিতিগুলির দায়িত্ব রয়েছে সবার আগে। তার অন্যতম মৌলিক নীতি হ'ল "সমীর জন্যে সকলে"। এ নীতি আন্তর্জাতিক । সমবায় সংস্থাসমূহের সদস্য ও কর্মী-নির্বিশেষে সমবায় সংস্থাগুলিকেও এই নীতির অনুসারী হয়ে বন্যাত্রাণে মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে বদান্যতা দান করার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের হাত এখনও প্রসারিত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে আমাদের দায় ও দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

[redacted]

সব দেখে, সব জেনে, সব বুঝে আমরা থাকব স্থির। কলব ভাল আছি।

সারা বৎসরের একঘেয়ে 'কেমন আছেন'। শুনতে শুনতে পুজোর নতুন জামাকাপড়ের সাথে আসবে নতুন প্রশ্ন — 'পুজো কেমন কাটল'। 'পুজোয় কোথায় যাচ্ছেন?' যদি অস্বস্তিতে পড়ি তবু মনে হবে কুশল বিনিময়ের আগিয়ে এ-প্রশ্নগুলো বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে আছে। সমীরণের বাবার সাথে দেখা হয়েছিল সকালে। কুশল বিনিময়ও হয়েছিল। সন্ধ্যায় সমীরণের বন্ধু কৌশিকের কাছে হঠাৎই জেনেছিলাম সমীরণ গত কয়েকদিন ক্যান্সার রোগের যন্ত্রণায় হাসপাতালে দিন কাটিয়েছে। শোভনার মা নেই। বাবার সুস্বাসারে সন্ধ্যারতি। মেয়ে হয়েও সন্ধ্যার পর বাবার কাছে যাওয়ার তার সাহস হয় না। শোভনার মামা জানেন তাঁর ভগ্নিপতি ভগ্নির নিরাপত্তার জন্য সন্ধ্যার মধ্যে বাড়ি ফেরেন। মানবের সংসারে ঘোর দুর্দিন। শ্রমিক আন্দোলনের জেরে কর্মহীন। দিনরাত কঠিন সংগ্রামে কোনরকমে যদি একবেলা খাওয়া জোটে! ঘরের বাইরে এলে পাড়া পড়শির সাথে কুশল বিনিময়ের ঘটতি নেই। কেউ জানে না মানবের এখন কী অবস্থা। এমনি করে আমরা চলছি, হয়ত চলবও। পথে চলতে চলতে কিম্বা টেলিফোনে, অফিসে বা বাজারে দেখা হলে ভাবলেশহীনভাবে বলি 'ভাল আছি'। আন্তরিকতা নেই, ঘনিষ্ঠতা নেই, ঘরে ঘরে যাতায়াত নেই ; সঙ্কোচ আর সঙ্কীর্ণতায় ঘেরা এ-জীবন। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধের অভাব আমাদেরকে ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হওয়া থেকে দূরে রাখছে। নিজের তৈরি পরিমণ্ডলে হতাশা কেন আবদ্ধ হয়ে আছে বাইরে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই ; তাই সুস্থতাও নেই। নানাবিধ বিকার ঠাঁই পাচ্ছে আমাদের আচার আচরণে।

শারদীয় মিলনোৎসবের দিনে আমরা আনন্দ ভাগ করে নেব। উদারভাবে সবার কাছে সবার সাথে শ্রদ্ধা বিনিময় করব। পুজোর দিনগুলো যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা কেন রিক্ত না হই। আমরা কেন সমাজে সংসারে মিশতে পারি।

WBFC

পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম (W.B.F.C.)-র উজ্জ্বল ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শিল্প উদ্যোগের জন্য আপনার কি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন ? পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগমের কিন্তু আপনার জন্য প্রয়োজনীয় প্যাকেজ আছে। আমরা কোন নতুন শিল্প / পরিষেবামূলক ইউনিট স্থাপন অথবা আপনার চালু ইউনিটটি ভিন্নমুখীকরণ / আধুনিকীকরণ / সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকি।

ডব্লিউ বি এফ সি প্রযুক্তি, পরিচালনা এবং আর্থিক বিষয়গুলিতে পরামর্শ (প্রকল্প সম্পাদন যোগ্যতা প্রতিবেদন সহ) সুনিশ্চিত করবার জন্য সুদক্ষ অফিসারগণকে নিয়ে একটি শক্তিশালী প্রযুক্তি পরামর্শদানের সেল গঠন করেছে।

রাজ্যের সর্বত্র শাখাগুলি (১৪টি কেন্দ্রে) আপনাকে সাহায্য করতে সর্বদা প্রস্তুত। শিলিগুড়িতে আঞ্চলিক কার্যালয়টি উত্তরবঙ্গ এবং জেলাগুলিতে নিগমের কাজকর্মের প্রতি সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখে চলেছে।

আরও বিস্তারিত বিবরণাদির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের জেলা শাখা কার্যালয়গুলিতে অথবা ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১ ঠিকানাস্থিত প্রধান কার্যালয়ে লিখুন / চলে আসুন।

- ★ রপ্তানিসহ বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণে ঋণের ব্যবস্থা।
- ★ ভিন্নমুখীকরণ, নতুন পণ্য উৎপাদনের উন্নয়ন ও দ্রুত পরিষেবা প্রদানের উপর গুরুত্ব প্রদান।
- ★ চালু ও লাভজনক সংস্থার Viable Project-এ ERS/ECFS প্রকল্পে ৭ দিনের মধ্যে ঋণের ব্যবস্থা।
- ★ নতুন প্রকল্পগুলির জন্য বিশেষজ্ঞ পরামর্শ পরিষেবার ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ বিত্ত নিগম

প্রধান কার্যালয় : ১২এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৪র্থ ও ৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১
টেলিফোন : ২২০-০০৫৫, ২২০-৩২৫৯, ২২০-৪৯৫৪, ২২০-৩০৮৩ ★ ফ্যাক্স : (৯১) (৩৩) ২২০-১২৫০
আঞ্চলিক কার্যালয় : ৪৫, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ৪র্থ তল, সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি, পিন - ৭৩৪ ৪০১
টেলিফোন : (০৩৫৩) ৪২৬৬১৫

প্রবন্ধ

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীত্বের অসূর্যী উত্তরাধিকারী

সুশীল ঘোষ

প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতীয় নাগরিক অবশ্যই যারা অটলবিহারীর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করেন না অথবা তাঁর অন্তরঙ্গ নন এতদিনে একটি বিষয়ে একমত হবেন যে, তাঁর চেয়ে অসূর্যী প্রধানমন্ত্রী নিয়ির গণিতে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আর কেউ আসীন হননি।

প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর চলন-বলন, কাজকর্ম, আচার-আচরণ ও কেতাদুরস্ত জীবনযাত্রা তাঁকে এবং তাঁর সদ্য স্বাধীন দেশকে এক নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। যদিও দেশনায়ক হিসাবে তাঁর চিন্তাধারার অনেকখানি সুদীর্ঘকাল কমবেশীন থেকেও রাপায়িত করতে পারেননি তবু তাঁর কিছু কিছু অবদান, যেমন মিশ্র অর্থনীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার নীতি, বিদেশ নীতি, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে জোটবদ্ধ করে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার প্রয়াস প্রভৃতি দেশবাসী এখনও সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। নিজের ইচ্ছামত মন্ত্রীসভা তৈরি করা, নিজের ইচ্ছামত নেতৃত্ব দেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা তিনি ভোগ করে গেছেন। দেশের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়কের ভূমিকা পালন করে গেছেন এবং বিদেশেও যথাযথ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আমার মনে হয় গান্ধীজির জীবনী ও কাজকর্ম নিয়ে যেমন বেশ কিছু নাটক লিখিত ও অভিনীত হয়েছে অনুরূপ অনেক উপাদান আছে যা নিয়ে নেহরু সম্পর্কেও একটি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের রাঙ্গালী পর্যায় ছবি তৈরি করা যায়। বিশ্ব রাজনীতি এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চাপে অবশ্য জীবনের শেষদিকে কার্যত তিনি বিমর্ষ, বিচ্ছিন্ন ও একক হয়ে পড়েন। কিন্তু পার্টি ও সরকারের নেতৃত্ব নিজের কব্জায় থাকায় জন্য তিনি সবসময়ই স্বাধীনভাবে দেশের নেতৃত্ব দেবার সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করে গেছেন এবং এ জন্য কোনো দুশ্চিন্তা ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি।

সমকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের উচ্চমহলের নেতৃত্বের ঐকমত্যের ভিত্তিতে কোনরকম মানসিক প্রস্তুতি ছাড়াই পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের দায়িত্ব নিতে হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে। তাঁর পূর্বসূরির ন্যায় প্রথম ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হয়েও তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন মূলত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জন্য। দল অথবা সরকারের উচ্চপদে আসীন হওয়ার উপর বাসনারও কোনো পরিচয় তাঁর আচরণে ছিল না, তামসিক জীবনযাত্রার পরিবর্তে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই ছিল তাঁর পছন্দ। ভারতের চিরশত্রু পাকিস্তান এই সময়ে নেহরু-নেতৃত্বের অভাব এবং চিনের সঙ্গে শত্রুতার সুযোগ নিয়ে ভারতকে আক্রমণ করে, কিন্তু বহুত দুর্বল লাল বাহাদুর অভাবনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে তার সমুচিত জবাব দেন এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর স্বল্পকালীন প্রধানমন্ত্রীত্বে ভারতীয় রাজনীতিতে এক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যান। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্ব অথবা উপযুক্ত সমর্থনের অভাবে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অসুবিধা অবশ্য তাঁকেও পোহাতে হয়নি।

অতঃপর এলেন ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরু-তনয়া শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। প্রথম দিকে স্বাধীনভাবে চলতে প্রবল অসুবিধা হলেও অবশেষে দলকে দু'টুকরো করে রাষ্ট্রক্ষমতার উপর নিজের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন এবং অচিরে অরিক্ষু দলের উপরও আধিপত্য স্থাপন করে দলকে টেনে তোলেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে এরপর থেকে ক্ষমতা ভোগ ও প্রয়োগ করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি।

কংগ্রেস দলকে তিনি রক্ষণশীল নেতৃত্বের কবল থেকে মুক্ত করে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে নিজের পছন্দের ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে আনা, রাজন্যভাতা বিলোপ, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে সক্রিয় সহায়তা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অবলুপ্ত করা প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে স্বৈরাচারী শাসনের পথ গ্রহণ করে জনগণের রায়ে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে অনৈক্য এবং নিজের দল সংগঠনীশক্তির সাহায্যে তিনি অল্পকালের মধ্যেই হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হন।

প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্তির জন্য মোরারজী দেশাইকে প্রায় সারাজীবনই অপেক্ষা করতে হয়। জনতাদলের অভ্যন্তরে তিনি অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন না, কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যস্থতায় তিনিই প্রধানমন্ত্রী হন। এতে তাঁর সন্তুষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু কেনো কিছুতেই তাঁর সন্তুষ্টি বিধান ঘটত না। তিনি ছিলেন কঠোর, নিয়মনিষ্ঠ এক ব্যক্তি। সন্তুষ্টি, অসন্তুষ্টির অনেকটাই তাঁর নিজের সৃষ্টি। তিনিও ছিলেন নিঃসঙ্গ ও একক।

রাজীব গান্ধী অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী পদের সুখ চুটিয়ে ভোগ করে গেছেন। বয়সে তরুণ, মাতামহ ও মায়ের উত্তরাধিকার নিয়ে তিনি পুরির মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছুটি কাটিয়েছেন কখনও মালদ্বীপে, আন্দামানে অথবা রণথম্ভোরে। জনসংযোগের নামে রাজস্থানের মরুভূমির বুক চিরে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সফর করেছেন, বিশ্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ঘুরেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ। একই বিশেষ বিমানে দিল্লি-মস্কো-ওয়াশিংটন ছুটেছেন, কখনও হয়েছেন অতিথি আবার কখনও অতিথি-সেবক আর বিশ্বস্ত ডায়েরির পাতায় তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। মন্ত্রীসভা গঠন করতে তাঁকে কোনো বেগ পেতে হয়নি। পছন্দের লোকেরা অনায়াসেই সাড়া দেয়ে গেছেন। রাজধানী দিল্লির রাঃ পথে যথেচ্ছ গতিতে নিজে গাড়ি চালিয়েছেন। রাজনীতিতে তাঁর অনীহা এবং প্রথমদিকে প্রধানমন্ত্রী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেও এই পদটিতে তিনি অফেল সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ উপভোগ করে গেছেন এবং এই বিষয়টি নিজের স্ত্রী ও কন্যার মধ্যেও সঞ্চারিত করে গেছেন। ফেরারী শাসন পাওয়ার প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করেও প্রাথমিকভাবে গররাজি সনিয়ার কাছে হৃদয় দ্বার মানতে বাধ্য হন।

ইন্দিরা গান্ধীর পতনের পর জনতা সরকার গঠনের সময় থেকেই চন্দ্রশেখরের লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী পদের প্রতি। কিন্তু সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে সরিয়ে কংগ্রেস সমর্থনে তিনি সংখ্যালঘু সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। এতে তিনি তাঁর খুশি খুশি ভাব গোপন রাখতে পারেননি। যদিও তাঁর কপালে বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বিদেশ ভ্রমণ অথবা বিশ্ব সমস্যা সমাধানের সুযোগ ঘটেনি তবু পর পর দু'জন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল এবং ইটালিয়ান কথাবার্তা হুড়-বলে শেনা যায়। এর জন্য বিদেশ মৃত হিসাবে কথাবস্তু সিং-এর প্রয়োজন হয়নি। অতঃপর কয়েকমাস আগে তিনি দৌড়ঝাঁপের আসর থেকে

এসেছিলেন পুনরায় সেখানেই ফিরে যান। একসময় রাজধানীতে জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করে প্রচারিত ছিল যে, তিনি দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবেন।

বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বেশি খুশি হয়েছিলেন, না পদত্যাগ করে বেশি খুশি হয়েছিলেন বোঝা মুস্কিল। কিন্তু যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁর হাতে ছিল। তিনি যা চেয়েছিলেন তাঁর সবই কাছে পরিণত করেছিলেন, যদিও অনেকেই তাঁর অনেক কিছু পছন্দ নাও করতে পারেন। তাঁর মুখ ছিল অবলোকহীন, কিন্তু লোকসভার তাঁর শেষ ভাষণ, "নিষ্ঠুর পৃথিবী বিদায়" চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নরসীমা রাও-এর মুখটি ছিল ওয়েস্ট-মার্কা, দেখে বোঝা যেত না খুশি না অখুশি, কিন্তু অনুমান করা যায় যে প্রধানমন্ত্রীর পেয়ে তিনি বেশ খুশিই ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রীর ছিল অনেকদিনের স্বপ্নের মত ঈপ্সিত অধিকার, কেন না তিনি দীর্ঘদিন পার্লামেন্টের সদস্যপদে এবং কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। কংগ্রেস দলের প্রতি কোনদিনই অনুগত্যের অভাব দেখা যায়নি। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তিনিই সবচেয়ে লম্বতম হয়ে গেলেন। একদার অর্থনৈতিক উদারীকরণের বিষয়টি ছাড়া আর কোনও ব্যাপারে, তা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তিনি নিজস্ব গ্রহণে তৎপরতা দেখাতে পারেননি যদ্দ মূর্ত প্রতীক হয়ে আছে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা। তাঁর বিরুদ্ধে আদালতঅবজ্ঞা রুজু অপরাধ করেক বছর ধরে জমা হয়ে আছে, কিন্তু একটারও ফয়সলা হয়নি এবং আশঙ্কা করা যেতে পারে হবেও না, যেমনটি হয়েছে তাঁর ছেলে প্রভাকর রাওয়ের বেলায়। একটু বিলম্ব ব্যাতায় মেলে একথা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে যে, যে নরসীমা রাও ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনিই আবার অদ্ভুত হয়ে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং এই পদটি তাঁর কাছে এতই উপভোগ্য হয় যে, তিনি হৃত স্বাস্থ্য একদমে পুনরুদ্ধার করেন যে স্বাস্থ্য তাঁর বয়সকে চাপা দেয় এবং ঐ বয়সে পরিপূর্ণ মানসিক উৎফুল্লতা ছাড়া ঐ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী সচরাচর নয়।

সরকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হলেও দেবেগৌড়া এই পদটি খুব ভালভাবেই উপভোগ করেছেন। তাতে তাঁর এই পদে অভিষিক্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকলেও অচিরেই তিনি একটি বৃহৎ পরিবার নিয়ে নিজিতে বসতি গড়ে তোলেন এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পদাধিকারের সুযোগ নিয়ে একদমে সম্পত্তিবৃদ্ধে হোম এবং সম্পত্তি সকল করেন যেন 'ভুলে কেন অন্তর করতে পারেন না'। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে কোন সম্পত্তিই ছিল না, তাঁর এই পদে আসীন হওয়ার পর এমন কিছু কিছু কাজ করবার ইচ্ছা হয় যার ফলে তিনি দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারেন, যেমন পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতি আলোচনার অবসানে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান, কিন্তু সময় তাঁকে সে সুযোগ দিল না। অনেকে তাঁকে তাঁদেরই সঙ্গে তুলনা করলেও তাঁর প্রস্থান পর্বটি ছিল মহাসমারোহে।

অন্তরঙ্গ সময়কে প্রধান করেন ঘটল ইন্দ্রকুমার গুজরালের। অনেক ছত্রছায়ার দীর্ঘদিনের রাজনীতিক এবং একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ও কূটনীতিক ইন্দ্রকুমার তাঁর পদের তাবৎ অনুযায়ী তার সদ্ব্যবহার করেন। যখন প্রধানমন্ত্রীত্বের স্বপ্ন ও সাধ তাঁর হাতে কাছেও ছিল না, এবং যখন তিনি তাঁর নিজস্ব ইতিহাস ই স্টারন্যাশনাল হাউসের কবি হাউসে হাউটিতে কাটাচ্ছিলেন তখন হঠাৎই কিংবদন্তি এচিবিমেন্স প্রয়োগের মাধ্যমেই তাঁর এই পদে অভিষেক ঘটে। অত্যন্ত সহজভাবে, শান্তচিত্তে, সহীক তিনি সমস্ত ব্যাপারটি উপভোগ করেন। পদের গুরুত্ব তাঁর উপলব্ধিতে ছিল। অবশ্য একজন এক্সিকিউটিভ প্রধানমন্ত্রীর থেকে একজন প্রকৃত রাজনীতিক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ছিল তার বেশি ঝোঁক। দাড়িটি সঠিকভাবে ছেঁটে, ওয়ার্ডরোব থেকে পুরনো পোশাকগুলি বেড়ে ইস্ত্রি করে তিনি অধিকাংশ তাঁর নিজের শহরে লাহোরের বন্ধুবান্ধব অথবা তাদের সন্তান-সন্ততিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন প্রতিবেশী পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করবার উদ্দেশ্যে। যতদিন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন ছিলেন ততদিন তিনি পদের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিলেন তেমনি অকস্মাৎ চলে গেলেন।

কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ হয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহনসিংয়ের জন্য দেখে, যাঁর দল বিগত সরকারের পরিবর্তে "স্থায়ী সরকারের দক্ষ প্রধানমন্ত্রী"-র আওয়াজ তুলে নির্বাচনে জিতে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসায়। সংখ্যাতত্ত্ব যে কত নির্মম তা এই অভিজ্ঞানের চেয়ে এই পৃথিবীতে আর কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভিজ্ঞতায় ঝুলিতে নেই। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ার নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা লাভের জন্য তাঁকে নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর আঁতাতের দল ও ব্যক্তির প্রলোভন ও পরোক্ষ সহায়তা নিয়ে সরকার গড়তে হয়, অথচ জোটের দলের ভিড়ি সরকারকে কখনই না ব্যস্ত করে ঘাটে-বন্দরে সাংবাদিক সম্মেলনে ও মেনি-মিনি টিভির পর্দায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা করেছিলেন তিনি ও তাঁর পার্টির নেতারা অনেক সময়ে ধরে। তবে পরপর দুটি ভিড়ি সরকারের মতো উন্নয়ধোগ্য পার্থক্য বা ইতিমধ্যে জনমানসে কখনও উদ্বেগ, আবার কখনও হাসি-ঠাট্টা-তাচ্ছিল্যের খোরাক যুগিয়েছে তা হল পূর্ববর্তী সরকারের ভিত এত কাঁচা ছিল না যে-হাল বর্তমান সরকারের। ঘটনাচক্রে সরকারের বিপদ নিজের অন্তরমহলেই। প্রথমেই বিপদসূচিত হয় দক্ষিণের এক স্বাধীনিকে মন্ত্রিসভার ঠাঁই না দেওয়ায় এবং শপথ গ্রহণের ক্রেম মেলাতে না মেলাতেই তিন পূর্ণমন্ত্রীকে দুর্নীতির দায়ে মন্ত্রীত্ব থেকে অপসারিত করাতে। সাম্প্রদায়িক দলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অসাম্প্রদায়িক হিসাবে চিহ্নিত, যোগাযোগী সরকারের বিদেশমন্ত্রীর পদে তাঁর কার্যকর্ম প্রশংসিত এবং ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির জন্য অনেক নেতৃত্ব তুলনায় জনমানসের কাছে গ্রহণযোগ্য। কেন শাসনের জাতীয় কর্মসূচি থেকে সাম্প্রদায়িকতা মুছে বিষয়গুলি বাদ দিলেও উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র ও গুজরাতে তাঁর দলের সমর্থপুষ্ট সাম্প্রদায়িক হৈরব বাহিনীর তাণ্ডবলীলা এবং তজ্জ নিত প্রতিক্রিয়া প্রতিনিয়ত পীড়াপীড়ার কারণ হয়ে পড়ছে। ৩৫৫ দিয়ে যখনলনাকে সামলানো গেলেও বিহারী মিত্রের চাপ থেকেই যাচ্ছে, আর রাষ্ট্রপতির রমণীয় কাণ্ডকারখানা তো তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিপক্ষীয় শিবির রমণীটি তিনি এতদকোল নীরবে সময় ও সুযোগের জন্য ওঁত পেতে ছিলেন সম্প্রতি সরব হয়েছেন এবং এই সরবতা প্রধানমন্ত্রীর দুশ্চিন্তাকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করেছে। শপথ গ্রহণের পর থেকে এমন একটা দিন যাচ্ছে না যাতে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন এবং এই অবস্থার কারণ সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর নিজের দল, সহযোগী দল এবং মন্ত্রীসভার সদস্যদের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও কার্যকর্মের ফলে। পোখরানের আণবিক বিস্ফোরণে সম্মতি নিয়ে তিনি এই অন্তর্দাহকে চাপা দিয়ে জাতীয় ভাবাবেগকে উস্কে দিয়ে জনমনের দৃষ্টি তাঁর সরকারের উপর থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিতে পারবেন আশা করেছিলেন। কিন্তু আশা যে, 'কুহকিনী', 'তবু বিষে ছলনা' আরও একবার প্রমাণিত হল। উল্টে নিজের ভিতরী দেশকে করে ফেললেন একঘরে এবং আমেরিকার কাছে নতজানু। অবশ্য, বিদেশি বিদ্যাভূন, উদয়পুর, কয়েরী, মন্ত্রীসভার উল্টো-পাল্টা বিবৃতি, বল ও রাষ্ট্রিক রমণীর অভিমান ও আস্ফালন ওঁকে সমস্যার জড়া করে চলেছে। জোরী অটলবিহারী এর মধ্যে অন্তরঙ্গ ঘান

গ্রহণ করবার অবকাশই পেলেন না, জনতাকে ধরে রাখতে প্রতিনিয়ত এত হিমসিম খেতে হচ্ছে। মোটামুটি সৎ ও পরিচ্ছন্ন অটলজি বুঝে গেছেন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তিনি ব্যর্থ প্রমাণিত। এই ব্যর্থতা মূলত পারিপার্শ্বিক কারণে। অন্ধকার জগতে বিচরণে অনভ্যস্ত প্রধানমন্ত্রীর কথাবার্তায়, মুখের অভিব্যক্তিতে এই ব্যর্থতার হতাশা তাই ধরা পড়ে যাচ্ছে। একদা বিদেশমন্ত্রীর একমাত্র সার্ক সম্মেলন উপলক্ষে কলম্বো যাওয়া ছাড়া অন্যত্র যাবার সুযোগ ঘটেনি, পরিকল্পনাও নেই। সত্যিই ভারতবর্ষ এই পঞ্চাশ বছরে বেশ কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছে নেহরু থেকে রাজপেয়ী, কারও স্থায়ীত্ব দীর্ঘ সময়, কারও পূর্ণ সময়কাল, কারও স্বল্পকালীন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পেয়ে এত অসুখী হতাশ ও অপমানিত কাউকে হতে হয়নি। অটলবিহারীকে তাই, তার যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন না তুলেই, এই অভিধায় ভূষিত করতে হয় যে, তিনি শুধু ভারতের নন, বিশ্বের সবচেয়ে অসুখী প্রধানমন্ত্রী। ❑

শারদীয়া শুভেচ্ছাসহ

খাজুরদহ-বলাগড়ী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পোঃ — খাজুরদহ, * জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৭৭ এইচ জি * তাং - ১৫-২-৬১

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ	হবিবর রহমান মল্লিক	মুকুন্দ ঘোষ
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

নতুন সাজে নতুন ভঙ্গিতে

মালদা সমবায়িকা

মালদার সর্বসাধারণের জন্য তার ডালিতে নিয়ে এসেছে প্রয়োজনীয় সবকিছুই। এবারের নতুন সংযোজন 'ধারা' খাঁটি সরিষার তেল ও আমূলের খাদ্য সম্ভার। তাই স্বয়ংসেবা বিপণী আপনাদের সকলকে জানাচ্ছে শুভ শারদীয়ার সাদর আমন্ত্রণ।

দূরভাষ - ৫২৫০৬
এস টি ডি - ০৩৫১২

নিমাই দাস	লক্ষ্মণ বণিক
সভাপতি	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

কিষাণ বিকাশ পত্র

যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে
পাওয়া যায়

২½ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা

উৎসমূলে কোন আয়কর কাটা হয় না

[redacted]

সঞ্চয় অধিকার
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

[redacted]

একই নিয়মে আজও

শেখর বসু

কথা উঠেছিল ডাকাতির বাদ্যযন্ত্রটি নিয়ে।

অরিন্দম বলল, 'বাদ্যযন্ত্র বাদ্যযন্ত্রটি করবে, এ তো স্বাভাবিক, কিন্তু সে-আমলে ডাকাতরা পর্যন্ত বাদ্যযন্ত্রটি করত। ডাকাতি সেরে যে ফিরতে বাদ্যযন্ত্রটি করছে তা কিন্তু নয়, ডাকাতি করার সময়ও গলাইলস্করি চাল, পুরো বাদ্যযন্ত্রটি মেজাজ।'

অরিন্দমের গল্পের ঝুলি সব সময় ভর্তি থাকে। আর, গল্প বলতেও পারে বেশ জমিয়ে। দরকার মতো চোখ ছোট-বড় হয়, ভুরু নাচে, মুখমণ্ডলে সংলাপ চলার সময় মুখভঙ্গি পাল্টে যায় কয়েক। এই মানুষটি আজকাল থাকলে সে-আড্ডা জমতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না।

ইতিমধ্যে চা, ভেলেভাজা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আনন্দী চট করে উঠে গিয়ে পটভর্তি চা আর চায়টে কাপ নিয়ে এসে বলল, 'এবার বলুন আপনার বাদ্যযন্ত্রটি ডাকাতের গল্প।'

গল্পবিলাসের হাতে চায়ের কাপ প্রথম তুলল আনন্দী। কাপে ছোট্ট একটা চুমুক মেরে অরিন্দম বলল, 'ভাল লোকের লেখা থেকে বলছি। গুলপট্টি নয়। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগের ঘটনা। কলকাতার কাঁসারিপাড়ার দিকে বারাণসী ঘোষের তখন খুব নামডাক। বড়লোক মানুষ। বড়লোক হয়েছিলেন সাহেবদের দেওয়ানিগিরি করে। ভাল ইংরেজি জানতেন বলে সাহেব বেশ খাতির করতেন। বিরাট এক বাড়ি বানিয়েছিলেন থাকার জন্যে। ওঁর নামেই পরে ওই রাস্তার নাম হয় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট। তখন সাহেবরা বেশ শাসন করলে কী হবে, ডাকাতরা নির্ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে ডাকাতি করে বেড়াত। সেই সময় তিন ডাকাত সর্দারের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। এদের নাম রঘুনাথ, বিশ্বনাথ আর কালীনাথ। আমি যে বাদ্য-ডাকাতের কথা বলছি, তার নাম বিশ্বনাথ। লোকে বলত বিশ্বনাথবাবু।'

'সত্যি!'

আনন্দীর প্রশ্নের উত্তরে চায়ের কাপে আর একটা বড় চুমুক দিল অরিন্দম, তারপর বলল, 'ঐতিহ্যের উপর নেই। আমি একেবারে ঐতিহাসিকের কথা শোনাচ্ছি তোমাদের। বিশ্বনাথবাবু যে বিরাট বড়বাবু ছিলেন তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল তিনি পালকি করে ডাকাতি করতে যেতেন।'

এবার সুদর্শন হেসে ফেলল।

ওকে হাসতে দেখে, অরিন্দম একটু চটে উঠে বলল, 'না, গালগল্প শোনাচ্ছি না। যদি চাও একেবারে ঐতিহাসিক ডকুমেন্ট দাখিল করতে পারি।'

আনন্দী তার ওর বর জন্য তর্কাতর্কি থামিয়ে দিয়ে অরিন্দমকে আসল গল্পে ফিরিয়ে আনল আবার। ও গল্পের খেই ধরল যেন। 'ডাকাত সর্দার বিশ্বনাথবাবু থাকতেন ঘুঘুডাঙায়। সে আমলে একটা দস্তুর ছিল চিঠিপত্তর দিয়ে ডাকাতি করতে আসা। একদিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, এ ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা সাহেবিয়ানা আছে। এটিকেট মেনে ডাকাতি - যাকে বলে ডেকোরেটি ধাই অ্যাপরেচমেন্ট। তাই না।' অরিন্দমের কথায় সবাই হেসে উঠেছিল। আনন্দী লম্বা করে বলল, 'ঠিকই তো।'

চায়ের কাপে একটা পর-পর তিনটে চুমুক দিল অরিন্দম। একটু স্লান পর জুড়ল আবার। 'তা, একদিন বিশ্বনাথবাবু চিঠি পাঠালেন বারাণসী ঘোষের কাছে : অমুকদিন সন্ধ্যাকালে আপনার বাড়িতে ডাকাতি করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া সেইদিন সন্ধ্যায় ঘুমপরান সামগ্রী একত্র করিয়া রাখিবেন।'

সুদর্শন আবার একটা ঝামা সৃষ্টি করল। 'ওই চিঠিটাও কি তোমার ওই ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেছে।'

'না। তবে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে গেলে ডাকাতরা তো এই ধরনের চিঠিই লিখবে। আর কী-ই বা লেখার আছে।' সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল অরু। 'ঠিকই। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে গেলে এই রকমের চিঠিই লিখবে। এছাড়া আর তো কিছু লেখার নেই। কিন্তু তখন চিঠি দিয়ে ডাকাতি করার চল হয়েছিল কেন বলো তো?'

অরিন্দম বড় একটা চুমুকে কাপের বাকি চা-টুকু শেষ করল, তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবার পরে বলল, 'প্রশ্নটা তো মন্দ জেগেছে। তবে আমার কি মনে হয় জানো, আজ থেকে দুশো বছর আগে কলকাতার রাস্তাঘাট তো তত ভাল ছিল না। তার ওপর তখন কলকাতার আশেপাশে বিস্তর জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সন্ধের চারদিকের জঙ্গল থেকে শেয়াল বেরোত। বাঘও বার হত মাঝেমধ্যে। বর্ষাকালে হেঁটে পথ চলায় ডুবে যেত। এই অবস্থায় পাঁচ-ছ ক্রোশ দূর থেকে ডাকাতরা ডাকাতি করতে গিয়ে যদি শোনে বাদ্য সপরিবারে ঊর্ধ্বে গেছেন কিংবা দূরের কোনও গ্রামে আত্মীয়ের বাড়িতে লোক-লৌকিকতা করতে গেছেন - তাহলে তো কেলেঙ্কারি! একলের একশেষ। জলকাদা ভেঙে অতদূরে গিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসা। ডাকাতি করা তো তাহলে কস্মিনকালে পোষাবে না।' কথা শুনে শ্রোতরা একটু হাসল, কিন্তু কেউ আর কোনও প্রশ্ন তুলল না।

সিগারেটে লম্বা একটা টান মেরে আবার মুখ খুলল অরিন্দম। 'যথাসময়ে ডাকাতের চিঠি হাতে পৌঁছল বারাণসী ঘোষের। কৃত্যাত ডাকাত, বিরাট দলবল, কথাকাজে কোনও নড়চড় হয় না। কোম্পানির লোককে জানালে বিপদ আরও বাড়বে। সাহেবদের দৌলতে সে যাত্রা হয়তো উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তারপর? ওরা চলে গেলেই ডাকাতরা ফাঁসিয়ে পড়বে। তখন শুধু লুটপাটেই ক্ষান্ত হবে না, বাড়ির সবাইকে নৃশংসভাবে খুন করবে। কিন্তু সে তো শেষ পরের কথা : টাকা-পয়সা, সোনাদানা মনোমত না হলেও তো ডাকাতরা ঘু-চায়টে দাগ কেটে দিতে পারে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলেন বারাণসী ঘোষ। কী করবেন মুখে উঠতে পারছিলেন না। ওই বাড়িতে এক খানসামা ছিল, সে অবশ্য সাহসী আর পাকা তীরন্দাজ। খানসামা মালিককে বলল : এ বাড়ির ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আপনারা অন্য কোথাও গা ঢাকা দিন। আমি একাই সব সামলে নেব। অবশ্যে বারাণসীবাবু বললেন : তা

কী করে হয়। তুমি একা, ওরা অতজন। প্রত্যেকের কাছেই আমার মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র থাকবে। ঘনশ্যাম অভয় দিয়ে জানাল : ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। সব দায়িত্ব আমার। আর সময় নষ্ট করবেন না এখন। আপনারা নিরাপদ কোনও আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে পড়ুন। অন্য কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ঘনশ্যাম হাতে ঘড়ি ছেড়ে দিয়ে সপরিবারে অন্য জায়গায় গিয়ে উঠলেন বারাণসীবাবু।'

চোখেমুখে কৌতূহল ফুটিয়ে তুলে আনন্দী জিজ্ঞেস করল 'তারপর?' গম্ভীর মুখে সিগারেটে কয়েকটা টান মারল অরিন্দম। তারপর অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে বলল, 'নির্দিষ্ট দিন সন্ধ্যাবেলায় মশালের আলোয় চারদিক আলো-আলো করে দলবলসমেত এসে পড়লেন ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবু। ডাকাতদের অবশ্য চেহারা। কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে সড়কি, কারও হাতে খোলা তরোয়াল। বাবু বিশ্বনাথ কিন্তু হু-বেহারার পালকিতে। বারাণসী ঘোষের অট্টালিকার সামনে এসে দেখলেন, সদর দরজা হাঁ করে খোলা। এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না। কুখ্যাত ডাকাতের নামে গৃহস্থের বুকে কাঁপুনি ধরে। জানালা-দরজা বন্ধ করে ইষ্টনাম স্মরণ করে। তারপর ডাকাতরা হা-রে-রে-রে করে উঠে দরজা খুলতে বললেই কেউ একজন ঠকঠক করতে করতে দরজা খুলে দেয়। গৃহস্বামী ডাকাত-সর্দারের হাতে সর্বস্ব তুলে দেয় তখন। সে-আমলে বড় বড় ডাকাতির এটাই ছিল ধরন। কিন্তু এখানে তো তা হয়নি। সদর দরজা আগে থেকেই হাট করে খোলা। ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবুর কাছে এই বেনিয়মটা একেবারেই ভাল ঠেকল না। বাবু ডাকাত তো। ডাকাতি করতে গেলেও সঙ্গে থাল চাকরকে নিয়ে যান। সদর দরজা খোলা দেখে খটকা লাগতেই মাথাটা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে বিশ্বনাথবাবু চাকরকে বললেন : তামাক সাজ।'

'কী বলছ কী! ডাকাতি করতে এসে ওই সময় চাকরকে তামাক সাজার কথা বলা। না, এটা যোগাযোগ তুমি বাড়াবাড়ি করে ফেলছ।'

সুদর্শনের কথায় আর একবার বিরক্ত হল অরিন্দম। 'কী আশ্চর্য, আমার এখনে বাড়াবাড়ি বা কমবেশি করার ব্যাপার নেই, আমি তোমাকে একজন পণ্ডিত লোকের লেখা থেকে তথ্য দিয়ে যাচ্ছি শুধু।'

সুদর্শন যেন আরও কিছু তর্ক করতে যাচ্ছিল, কিন্তু আনন্দী আর তার প্রায় কাঁপিয়ে পড়ে থামিয়ে দিল ওকে। গম্ভীর মুখে সিগারেটে কয়েকটা টান মারার পরে আবার গল্পের খেই ধরল অরিন্দম। 'তখন নাকি ডাকাতদের মধ্যে মালসাট শব্দটার খুব চল ছিল। মালসাটের মানে হল আস্ফালন। অন্তরঙ্গ চেহারার ডাকাতদলের ওই অন্ধকার রাতে ঘনশ্যাম মশাল নিয়ে মালসাট মারছিল, আর অপেক্ষা করছিল সর্দার বিশ্বনাথবাবুর আদেশ শোনার জন্যে। আদেশ শোনা মানে হে-রে করে বাড়ি চড়াও হওয়া। কিন্তু বিশ্বনাথবাবুর মাথায় তখন অন্যরকম চিন্তা। ডাকাতের চিঠি পাওয়া সত্ত্বেও বারাণসী ঘোষ আগে থেকে সদর দরজা হাট করে খুলে রেখেছে কেন? নিশ্চয়ই ওর জন্য কোন মতলব আছে। খোলা দরজা হয়তো একটা ফাঁদ। মাথা সাফ করার জন্যে আলবোলার দুটো টান দেওয়া দরকার। চাকর বেশ তন্ময় হয়ে কল্কে সেজে আলবোলার মাথায় বসিয়ে দিল, কিন্তু বিশ্বনাথবাবু নল হাতে নিয়ে যেই না টান মারতে যাবেন অমনি ওই খোলা দরজা দিয়ে একটা তীর ছুটে এসে কল্কে কেটে মাটিতে ফেলে দিল।'

'এ্যাঁ! বলো কী।'

আনন্দীর বিস্ময়ে সায় দিয়ে অরিন্দম বলল, 'তোমার মতো বিশ্বনাথবাবুও চমকে উঠেছিলেন ওই কাণ্ড দেখে। এত নিখুঁত তীরন্দাজ তো যে সে লোকের কম্ম নয়। কে বা কারা আছে ওই বাড়ির ভেতরে? তবে, আকটার অল ডাকাত-সর্দার তো-তরটর অনেকের তুলনায় যথেষ্ট কম। ওই নিস্তব্ধ রাতে বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠে বললেন : বাড়ির ভেতর থেকে তীর ছুঁড়ল কে? তবে যেই হোড়ো না কেন, তোমার বাহাদুরি আমি একদমই মানতে রাজি নই। আমি আবার তামাক সাজাচ্ছি, যদি সত্যিই জবুর তীরন্দাজ হও, ওইভাবে আর একবার কল্কে কেটে দেখাও তো। অমনি চাকরকে বললেন : নে ব্যাটা আর একবার সাজ। চাকর তামাক সাজল, তারপর আলবোলার মাথায় কল্কে বসিয়ে দিল আবার। বিশ্বনাথবাবু যেই না আলবোলার নল-মুখ মুখের কাছে তুলেছেন অমনি বাড়ির ভেতর থেকে আর একটা তীর ছুটে এসে সেই কল্কেটাও কেটে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে তারিফ করার গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন বিশ্বনাথবাবু : তুমি সত্যিই ওস্তাদ। বেরিয়ে এসো তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করব। কথা দিচ্ছি, এখনে আমি ডাকাতি করব না।'

'বেরিয়ে এসেছিল কেউ?'

'কেউ বলতে তো একজনই। গোটা বাড়িতে ওই ঘনশ্যাম ছাড়া আর কেউ ছিল না। ঘনশ্যাম তীর-ধনুক নিয়ে একটা লুকনো জায়গায় বসে ছিল। বিশ্বনাথবাবু অল্প-একটায় হাঁক পেড়ে বললেন : আমার কথা-কাজে কোনও অমিল থাকে না। তোমার বাহাদুরি দেখে আমি সত্যিই খুব খুশি হয়েছি। এখনই খুশি যে এ-বাড়িতে আর ডাকাতি করব না। তীরন্দাজ, তুমি বেরিয়ে এসো। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা হওয়া দরকার। কিন্তু ঘনশ্যাম কথার জবাবও দিল না। বাহাও হল না তার থেকে। ডাকাতের এসব কথা যে আর চট করে বিশ্বাস করে। তার ওপর আবার একা মানুষ। ঘনশ্যাম ভয় পেল, ওইসব বড়-বড় কথা হয়তো স্রেফ চালাকি। ওকে বাগে পেলে বিশ্বনাথবাবু নির্ঘাত তরোয়ালের এক কোপে ওর বড়মুণ্ডু আলাদা করে দেবেন। কী দরকার অযোধ্যা ঝুঁকি নিয়ে। ঘনশ্যাম কোনও সাড়াশব্দ না দিয়ে লুকনো জায়গায় বসে রইল চুপ করে। কিন্তু অট্টালিকার কোথাও আলোর কোনও চিহ্ন ছিল না। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বিশ্বনাথবাবু একটু হেসে বললেন : বুঝতে পারছি, বেরুতে তোমার অসুবিধে আছে। ঠিক আছে, আমরা চললাম এখন। আবার ঠিকপুত্তুর বাগানে তোমাদের নেমন্তন্ন রইল। নিশ্চয়ই এসো একদিন। শোনা যায়, পরে নাকি ওই ডাকাত-সর্দার বিশ্বনাথবাবুর সঙ্গে বারাণসী ঘোষের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল।'

আনন্দী হাঁ করে গল্প শুনছিল। অরিন্দম থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'তারপর।'

'তারপর আর কিছু নেই। গল্প এখানেই শেষ।' আনন্দী ছেলেমানুষের গলায় বলল, 'ধুস, এত তাড়াতাড়ি গল্প শেষ হলে ভাল লাগে না।'

অরিন্দম হাসতে হাসতে বলল, 'এটা তো বানানো গল্প নয়, সত্যকাহিনী। সত্যি গল্প এইভাবেই শেষ হয়।'

সুদর্শন বলল, 'না, গল্পটা বেশ ভালই, তবে পুরোপুরি সত্যি বলে মনে হয় না। আজ থেকে পুরো বছর আগে এই কলকাতার ইংরেজদের শাসন ছিল খুব জবরদস্ত। তখন কি আগে থেকে ওইভাবে চিঠিপত্তর পাঠিয়ে ডাকাতি করা সম্ভব ছিল? তার ওপর আবার বারাণসী ঘোষ ইংরেজের দেওয়ান, ইংরেজদের সঙ্গে অত খাতির। একটা খবর পাঠিয়ে দিলে তো গোরা পুলিশ এসে দলবলসমেত তোমার ওই বিশ্বনাথবাবুকে ঠেঙিয়ে পাট্টা করে দিত।'

গল্পের সত্যি-মিথ্যে নিয়ে প্রশ্ন তুললে সব গল্পগুলিই চটে যায়। বিরক্ত হয়ে জবাব দিল অরিন্দম - 'দেখে হত বড় শাসনব্যবস্থাই থাক না কেন একটা আন্ডারওয়ার্ল্ড সব সময় কাজ করে

হয়। তখনও করত, আজও করে। এই যে মাফিয়া তনয়া — গোটা পৃথিবী জুড়ে আজ তোলপাড় করছে — পুলিশ তাদের কতটা কাছে আসতে পেরেছে?'

'মাফিয়াদের কথা ছেড়ে দাও।'

'কেন হাজরা? মাফিয়া মানেও তো একধরনের ডাকাত।'

জয় এবার অরিন্দমের সমর্থনে এগিয়ে এল। 'তুমি যদি সত্যের ডাকাতদের কথা বলো, তাও তো আছে এখন। এই যেমন চন্দনের ডাকাত। দস্যুরানি ফুলনদেবী তো এখনও খবরের হেডলাইন।'

সুদর্শন তর্কে হারার লোক নয়। বলল, 'চন্দনের ডাকাতদের কার্যকলাপ নিয়ে প্রচুর গালগল্প তৈরি হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য মিডিয়াই দায়ী। কিন্তু চুনি-ডাকাতি সব সময়ই ছিল, থাকবেও। কিন্তু ওই যে চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসা, বিশেষ করে পুরনো কলকাতার এক বড়লোকের বাড়িতে — এটা বেশি বেশি। আমি তো ওনেছি সে-সময় চুনি-ডাকাতির ওপর একটু বেশি ছিল বলে বড়লোকরা বাড়িতে নিজস্ব একটা সিকিউরিটি ফোর্স রাখত। এই যেমন ভোজপুরী দারোয়ান, তেলেগি বা বাঙালি লাঠিয়াল —। তোমার এই বারাণসী ঘোষের বাড়িতে শুধু একজন খানসামা ছিল কেন?'

'আমি কক্ষনো একথা বলিনি যে ওই বাড়িতে বাইরের লোক বলতে শুধু একজন খানসামাই ছিল। গল্প শুনেই বোঝা যায় ওই খানসামা ছিল অসম্ভব সাহসী আর বীরপুরুষ। তার সাহসী বলেই ওই মহিলার সঙ্গীহারে অন্য কোথাও চলে যেতে বলেছিল। ঠিকই করেছিল সঙ্গে তিনু লোক থাকলে ও তার স্টাটেজি কাজে লাগাতে পারত না।'

'ঠিক আছে একটা বড় বাড়িতে একজন অসম্ভব বীরপুরুষ থাকাটা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু গল্পটি চেপে ডাকাতি করতে আসাটা — তার ওপর আবার সঙ্গে চাকর, চাকরের কাজ শুধু আমাকে সেজে দেওয়া —। এটা কি বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না?'

এবার এগিয়ে এল আনন্দী। 'কেন, ইতিহাসে তো পড়েছি — মুঘল-পাঠান বাদশাদের কেউ কেউ যুদ্ধ দেখে যুদ্ধ করতে গেলে সঙ্গে গাইয়ে-বাজিয়ে আর নর্তকীদের দল নিয়ে যেত।'

'সে-তো যখন যুদ্ধ।' যুদ্ধ আর ডাকাতি কি এক হল?'

আনন্দীর মুখ দিয়ে আর একটু হলেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, হ্যাঁ একই। কিন্তু ও নিজেকে সামলে নিয়েছিল কোনও মতে।

সুদর্শন এবার জিতে যাওয়ার ভঙ্গি করল, 'আসলে, ইতিহাসের সঙ্গে এর কোনও মিলে আছে না —। একটা অবশ্য স্বাভাবিক। তবে মুশকিল হয় যখন আমরা ওধুমাত্র ওই গল্পোটাকেই ইতিহাস বলে চালাতে যাই। অরিন্দমের গল্পটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বিস্তর ফাঁক চোখে পড়ে যায়। আজ কাল গল্প সত্যি কি মিথ্যে যাচাই করার জন্যে সব সময় তথ্যপ্রমাণ পরীক্ষা করার দরকার হয় না, একটু কাণ্ডজ্ঞান খাটালেই হল। যাকগে, বিস্তর ডাকাতের গল্প হয়েছে, এবার তোমাদের নতুন এই ফ্ল্যাটটার গল্প একটু শোনা যাক। ফ্ল্যাটটা কিন্তু জব্বর হয়েছে। ফ্লোরিং জাপানী সুদৃশ্য। তার ওপর আবার বেশ খোলামেলা। ভাল আর্কিটেক্টের কাজ।'

সবে একমাস হল নতুন ফ্ল্যাট কিনে নতুন পাড়ায় উঠে এসেছে জয় আর আনন্দী। সুদর্শন ও অরিন্দম নতুন এই ফ্ল্যাটে আজই প্রথম এল। আসার পরে ঝকঝকে ফ্ল্যাটের খুটিনাটি ঘর, বারান্দা, কিচেন এমনকি টয়লেট পর্যন্ত দেখে নিয়েছে। চমৎকার ফ্ল্যাট। তখন এক দফা চা-সহযোগে আড্ডা-কাম-মিটিংয়ে বসে গল্প শুরু হয়েছিল। এ গল্প সে-গল্পের শেষে ডাকাতের গল্প। সেটা শেষ হওয়ার পরে আবার ফ্ল্যাটের গল্প।

ফ্ল্যাটের প্রশংসায় আনন্দী আর জয়ের চোখমুখ ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। ঝলমলে মুখে জয় বলল, 'ফ্লাট তো সুন্দর, কিন্তু এই ফ্লাট কিনতে গিয়ে দেনার দায়ে মাথার সব চুল তো বিকিয়ে গেছে।'

'সে সবারই হয়। দেনা শোধ হলেই বিকিয়ে-যাওয়া চুলের সব কিরে আসবে আবার।'

উত্তরে জয় হেসে বলল, 'সব যখন কিরবে তখন দেখব মাথায় সব চুল জুড়ে নিয়ে মত টাক বেরিয়ে পড়েছে।'

'তা হোক না, দেনাহীন টাক খারাপ নয়। কেউ তো আর তখন বলতে পারবে না যে, দেনার দায়ে চুলের মায়া বিকিয়ে গেছে।'

সুদর্শনের কথায় আনন্দীও হাসল, কিন্তু ঠিক তার পরেই তার মুখে ফুটে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া খেলে গিয়েছিল। একটু ভেবে ভেবে ও বলল, 'ফ্লাটটা ভালই, তবে পাড়া কেমন হবে কে জানে।'

'আরে বাবা পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে কেউ এখন আর মাথা ঘামায় না, যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে।'

'না-মা, সে-কথা বলছি না আমি। এখানে বড্ড চাঁদার উৎপাত। মাসখানেকও আসিনি, এর মধ্যে তিন দফা চাঁদা দিতে হয়েছে। একটা ক্লাবের, একটা পার্টির আর একটা চ্যারিটি শোয়ের বিরাট চাঁদা। আমরা যার কাছে চাঁদা দিয়েছি। মানে সেক্রেটরি গোছের লোক। পরশুদিন এসে কালীপুজোর চাঁদার বিল ধরিয়ে দিয়ে গেছে। কত চাঁদা জানো? পাঁচ হাজার এক।'

'আঁ। বলো কী। এতো চাঁদার নামে জুলুমবাজি।'

'জুলুমবাজি নয়, ডাকাতি। তোমরা এক পয়সাও ঠেকাবে না। আসলে তোমরাই ভুল করে ফেলেছ। তিন দফা মোটা চাঁদা দেওয়া ঠিক হয়নি। এখন দেখে নেবে ওরা। সাধারণ চাকরিজীবী জানুষ, তার কাছে পুজোর চাঁদা চাইছে পাঁচ হাজার এক টাকা!'

তিনজনের কণ্ঠস্বরই অবাক বিস্ময়ে শোনার পরে জয়, আনন্দীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'পাঁচ হাজার এক টাকার চাঁদার বিল কেটে দেছে। অথচ তুমি তো আমাকে একবারও বলোনি!'

'বলার আর সময় পেলাম কোথায়। পরশু বিকেলে এসেছিল, আজ সন্ধেয় আপনি আসবে বলে গেছে।'

জয়ের মেয়ে এখনও বুঝি কাটেনি। ঘরঘরে মুখে বলল, 'পাঁচ হাজার এক টাকার বিল কেটে দিয়ে গেল। আর তুমি ওদের কিছুই বললে না!'

'কেন বলব না, বলবার বলেছি। তার উত্তরে কী বিচিত্রি-বিচিত্রি সব কথা শুনিয়ে দিল। ছেলেওলোকে দেখতেও ঠিক গুণ্ডার মতো। শেষে শাসিয়ে যাওয়ার গলায় বলে গেল — পরশু সন্ধেয় আসছি, চাঁদাটা রেডি রাখবেন, ঠাকুর বরণ দিতে লাগবে।'

'মামার বাড়ি পেয়েছে। কিন্তু দেবে না। তয় পেলে এরা আরও পেয়ে বসে। বেশি জুলুমবাজি করলে পুলিশে খবর দেবে। এই তো তিন-চার দিন আগেই কালকে পুলিশের একটা সার্কুলার বেরিয়েছে। চাঁদার জন্য কেউ জুলুম করলে লালবাজারে খবর দিন। পুলিশ ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে একবার লক-আপে পুরলেই দেখবে জীবনে আর কখনও ওরা তোমাদের বাড়িতে সাহস পাবে না। এক কাজ করা যাক, একটা ফোন করে দিই। ফোন নাম্বার আছে ওদের।'

কিন্তু অরিন্দমের তৎপরতার আনন্দী কিংবা জয় কেউই সাড়া দিল না। সাড়া না পেয়েও অরিন্দমের উৎসাহে ভাটা পড়ল না একেবারেই। বলল 'মোড়ের ওষুধের

দোকানটায় টেলিফোন আছে দেখেছি। নাম্বারটা দাও, আমি টুক করে একটা ফোন করে দিয়ে আসি। এখনই তো ওদের আসার কথা, একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।'

এ-কথার জবাবেও ওরা কিছু বলল না। অরিন্দম এবার হিসহিসে গলায় বলল, 'শোনো, আজকের দিনে বেঁচে থাকার একমাত্র উপায় হল রুখে দাঁড়ানো। এক মাসের মধ্যে তিন-তিনবার চাঁদার নাম করে ওরা ছেলেদের কাছ থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে গেছে — এখনও যদি প্রতিবাদ না করো, কবে আর করবে।'

আনন্দীর শুকনো মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। ও নিচু সুরে বলল, 'কিন্তু পাশের বাড়ির মিসেস ব্যানার্জি তো আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। ওঁরা তো এ-পাড়ায় অনেক দিনের বাসিন্দা —।'

'কী বলেছেন মিসেস ব্যানার্জি?'

'বলেছেন এ-পাড়ার ছেলেগুলো একেবারে গুণ্ডাদের হদ্দ হয়ে গেছে। চাঁদা তোলার একটা না একটা ফিকির ওদের সব সময় লেগে থাকে। এই করেই নাকি ওদের চলে। বসে খায়, অথচ কেউ চাকরি-বাকরি করে না। পাড়ার পুরনো বাসিন্দাদের ওপর জুলুম কম, তবে আমাদের মতো যারা নতুন তাদের অবস্থা রীতিমত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আমরা আসার আগে এখানে একটা পুরনো বাড়ি ছিল। মিসেস ব্যানার্জি বলছিলেন পাড়ার ছেলেগুলো নাকি বাড়িওলার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভাঙাটেদের তুলে দিয়েছে। ওই জমিতেই এই বাড়ি। এখন আবার শুনছি, বাড়িওলা নাকি আবার ছেলেগুলোকে টাকা খাইয়ে আমরা যারা এখানে এসেছি তাদের তাড়াতে চায়।'

'তাড়াতে। কেন?'

'তাড়াতে পারলে ফ্ল্যাটগুলো আবার চড়া দামে বেচতে পারবে।'

'তা কী করে হয়। কেউ যদি কোনও কারণে ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিতে চায়, সে তো তার পছন্দমতো লোকের কাছেই বিক্রি করবে। বাড়িওলাকে দেবে না।'

'দিতে চাইবে না ঠিকই, কিন্তু অন্য খদ্দের পাবে কোথায়? যারা ফ্ল্যাট কিনবে তারা তো আশেপাশে খোঁজখবর নেবে। তখনই ফাঁস হয়ে যাবে নতুন ফ্ল্যাট বিক্রির রহস্য। কেউ তখন আর এগোবে না। বাধ্য হয়ে শেষে বাড়িওলা কিংবা বাড়িওলার চেনা অন্যদেরকেই কম দামে বেচতে হবে।'

'আশ্চর্য কী, এ তো রীতিমত চক্রান্ত।'

চোখ বড়-বড় করে সুদর্শন কথাটা বলার পরে অরিন্দম বলল, 'তোমরা একটু বেশি ভেবে ফেলেছ। এসব এত সহজ হলে সবাই এই-ই করে বেড়াত। চাঁদা চাইতে এসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলবে — এর বেশি তোমরা দিতে পারবে না। তাতে রাজি না হলে অন্য ব্যবস্থা তো আছেই।'

'অন্য ব্যবস্থা মানে পুলিশ? না-না এখুনি এ-ব্যাপারে পুলিশকে জানতে চাই না। পুলিশ না হয় একবার বাঁচাল, কিন্তু তারপর? অফিসে কাজের চাপ থাকলে ওর তো বাড়ি ফিরতে বেশ রাতির হয়ে যায়। আশেপাশে পাড়া বলেই বলছি —।' একেবারে অসহায় মানুষের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল আনন্দী।

হাতের কাছে সমস্যা সমাধানের কেউই কোনও উপায় খুঁজে পেল না। ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর নীরবতা। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে আটটায় এসে পৌঁছেছিল। সাবান আগে-পরে সবাইই মনে হয়েছিল — এখুনি সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা যাবে, তারপরেই হাজির হবে হুল্লোড় এক চাঁদা পার্টি।

কিছুক্ষণ বাদে সুদর্শন হঠাৎই মুখ তুলে বলে উঠল, 'এতে দেখছি পদ্মের ওই বিভীষণ ডাকাতের মতো। চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসা। ওখানে চিঠি, এখানে চাঁদার বিল। কিন্তু ব্যাপারটা তো একই।'

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে আনন্দী বলল, ঠিক বলেছেন, আমারও তাই মনে হচ্ছে। ইশ্। আমাদের যদি বারাণসী ঘোষের ধনলক্ষ্মীর মতো একজন বীরপুরুষ থাকত।' আধঘণ্টা আগে যদি এই কথাটা আনন্দী বলত, সবাই নির্ঘাত হা-হা করে হেসে উঠত। কিন্তু এখন আর কেউ হাসল না। সবাই টের পাচ্ছিল, ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব চেপে বসেছে।

মিনিটির এই অবস্থাওয়াটা কাটাবার জন্য প্রত্যেকেই নানা ধরনের প্রসঙ্গ টেনে গল্প জোড়ার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হয়নি। একটু থানি এলোথেলো পর বেয়াড়াভাবে গল্পের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল প্রতিবার।

দেয়ালঘড়িতে আটটা থেকে ন'টা বাজল যেন ঘণ্টা ঘুরেক বাদে। অরিন্দম আর সুদর্শন এখান থেকে অনেক দূরে থাকে, সুতরাং এবার ওদের উঠতেই হবে।

অরিন্দম একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, 'উঠি এবার, আমরা তো আবার অনেক দূরের বাসিন্দা। কই, তোমাদের চাঁদা-পার্টি এল না তো? আমার মনে হয় ব্যাপারটাকে আমরা বড্ড বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছি।' তখনো মুখে জবাব দিল আনন্দী — 'সিরিয়াসলি নেওয়ার মতনই ব্যাপার। এখনও আসেনি, তবে কখন তখন এসে পড়বে। এরা তো পাড়ারই। মিসেস ব্যানার্জি বড়ো কড়া কথার মহিলা নন। আমার মনে হয় যা সত্যি তার থেকে একটু বোধহয় কমিয়েই বলেছেন —।'

'এটা যদি কম হয়, বেশিটা কী?' একজন বিপন্ন মানুষের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলল জয়।

'সত্যিই তো, আমাদের চলাফেরার মধ্যে এইটুকু নিরাপত্তা যদি না থাকে। দুশো বছর আগের কলকাতার মানুষজন জঙ্গলের ভয়ে বেলাবেলি দিন কাটাত আজকালও কি সেইভাবে কাটাতে হবে।'

সুদর্শনের কথাটা শুনে অরিন্দমের ঠোঁটে ছোট্ট একটা বাঁক খেলে গেল। 'যাক, ডাকাত বিভীষণের গল্পটা তুমি তাহলে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করলে।'

'বিশ্বাস না করে আর উপায় কী, আসলে —।'

সুদর্শনকে আসল কথাটা বলার সুযোগ না দিয়ে আনন্দী অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনি বলছিলেন না — পরে ডাকাত বিভীষণের সঙ্গে বারাণসী ঘোষের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল — এটা কি সত্যি?'

একটু থতমত খেয়ে নিয়ে অরিন্দম বলল, 'যিনি ওই কাহিনীটি লিখেছেন তাঁর লেখার ধরনের দিকে তো ওইরকম কথাই আছে।'

ছটফট ভঙ্গিতে আনন্দী বলল, 'কিন্তু ঠিক কী ভাবে ওই ডাকাতের সঙ্গে বারাণসী ঘোষের ভাব হয়েছিল তা নিয়ে ওই ভদ্রলোক কি একটা লাইনও লেখেননি?'

ওর চোখমুখের চেহারা আর প্রশ্নের ধরনে এই ফ্ল্যাটের দুই অতিথিরই মনে হয়েছিল — উত্তরটা জানতে পারলে আনন্দী বুঝি ওদের সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলবে এখুনি।

ন'টা ঘুরিয়ে দুই বন্ধু আনন্দী আর জয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল ফ্ল্যাট থেকে। কিন্তু বেরি না ওরা রাস্তার পা দিয়েছে অমনি ঝুপ করে পাওয়ার কাট। সঙ্গে সঙ্গে আলো-ঝলমলে গোটা পাড়াটা কালো অন্ধকারে ঢেকে গেল।

ঝাপসা বাড়ি আর হাট করা সদর দরজা দেখে দুই বন্ধুরই সামান্য আগে-পরে একই ধরনের একটা বিভ্রম তৈরি হয়েছিল। মনে হয়েছিল, অলৌকিক কোনও উপায়ে আজ থেকে দুশো বছর পিছিয়ে গিয়ে উত্তর কলকাতার একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। □

উপন্যাস

অসময়ে সময় নেই

বিনয়গোপাল মিত্র

তারপর অনেক বছরের পার হয়েছে। অরূপের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না। দেখা যেদিন হ'ল বলার কিছু ছিল না। যখন ওর মুখোমুখি হয়েছিলাম তখন একটু ভয় ভয় করছিল, সঙ্কোচও কম ছিল না। এখন সে প্রশাসনিক কবি। গদ্য করে বললেও সে মদ বলে না। আবৃত্তির মতো শোনায়। তার সাথে আর মিলিয়ে কথা বলা কঠিন। ওনতে হয় বেশি, তার কথার মধ্যে প্রশ্নগুলো করতে হয়। নইলে থেমে থেমে কথার ফাঁকে ফাঁকে জিজ্ঞাসা করবে 'বলো, ঠিক বলিনি?' আর বলবে, 'তুমি অরূপের মতো আর নেই। তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে। প্রায়ই তোমার কথা বলি। ভালো থেকো। চলি।' এ কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে যাবে। ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে জানিয়ে বলবে 'একদম সময় নেই।' অভিযোগ করতেও ভুলবে না যে আমি ওর সাথে যোগাযোগ রাখি না বা আমি ওকে সময় দিই না। তার বেশকে নয়। তার ও যখন তক্ষ করে পুরানো সেই দিনের কথা। ওর জীবনে সুমিতা এসেছিল, কৃষ্ণা থেকে ছিল। ছোট ভাই-এর বন্ধুর সুন্দরী স্ত্রী রমলাকে দেখে বিগলিত হয়ে তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দিয়ে উপস্থিত সবাইকে হতবাক করে দিয়েছিল। বাড়িওয়ালার পুত্রবধূকে কবি সম্বেধন, নানা বিচিত্রানুষ্ঠান আর গানের আসরের কার্ড দিয়ে কাবু টেনেছিল। শেষ পর্যন্ত বাড়িটাও ছাড়তে হয়েছিল। বাড়িওয়ালার অবশ্য লাভ কিছুই হয়নি কারণ অরূপের ভাই তারাপ ঐ পুত্রবধূকে ঘরছাড়া করে আমেরিকার পাড়ি দিয়েছিল। অনিন্দ্যসুন্দরী গৌরবর্ণা সুষমাকে নিয়ে আবেগভরে অরূপ গেয়েছিল, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'। এসব ঘটনার সাক্ষী ছিলাম আমি। হয়ত তাই অরূপের আমাকে এত মনে পড়ে। কৈশোর আর যৌবনের প্রথম দিনগুলি তার এমনি করেই কেটেছিল। অরূপ থামতে জানত না। কাল বা বয়সের কথাও ওর মাথায় ছিল না। দুই বোনের বিয়ে, ভাই-এর প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপারে ওর আর্থিক দিক তেমন সচ্ছল না হওয়ায় ও বিয়ের কথা ভাবতেও পারত না। প্রেম-ভালবাসার অফুরন্ত ভাণ্ডার নিয়ে ও যেন জন্মেছে।

অরূপ ছিল আমার স্কুলের সহপাঠী। আবৃত্তি করত ভাল। স্কুল-ম্যাগাজিন আর দেওয়াল পত্রিকায় নিয়মিত লিখত। একজন কবি-স্যারের বাড়িতে যেত। স্যারের স্ত্রী ওকে খুব ভালবাসতেন। এই স্যারের বাড়িতেই ওর কবিতার প্রথম পাঠ শুরু হয়েছিল। অরূপের সাথে আমার অন্তরঙ্গতা ছিল। স্কুলছাড়ি হ'ল কলেজ ছাড়ার পর। আমরা কত পথ কত প্রান্তর ছুটেছি। বীর পায়ে হেঁটেছি। রঙীন ভবিষ্যতকে যেন হাতের মুঠোয় দেখতাম। কত কী-ই না খুঁজছিলাম, কাকে যেন চাইছিলাম। স্পষ্ট না অস্পষ্ট মনে নেই হয়ত বা কোনদিন কোন ভবিষ্যতকে চিনেছিলাম, পরিচিত হয়েছিলাম হৌলুসের শক্তি ও সৌন্দর্যে। জীবনকে পদ্যে কিছু পেতে চেয়েছিলাম। একদিন ছিল যখন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটেছি, কথা ও গল্পের মধ্যে থেকেছি। সেদিন দেখা হল অনেক দিনের পর, মুখোমুখি বিস্ত, না ছিল বিষয় না ছিল গল্প। দূরত্ব অনেক বেড়েছে। কোন কারণ ঘটেনি। হয়ত বা আমরা কৃত্রিমের বোঝা বয়ে চলেছি। আলাপে আলাপনে মুখোমুখি এসে আমরা কী দেখলাম যাচাই করতে ভয় হয়। অথবা 'সময় নেই' বলে হয়ত আমরা অতীত জীবনের কাহিনীকে সংলাপে টেনে আনতে পারিনি।

সুমিতা অরূপের কাছাকাছি এসেছিল। কবি বলে নয়। কবিতার প্রতি ওর বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। সুমিতার সংস্কার ছিল। সামাজিক সংস্কার নয়। জন্মগত সংস্কার। স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাসী সুমিতা স্বামীকে একান্তভাবে জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার হিসাবে পেতে চায়। জীবন ও যৌবনের টানে সুমিতা অরূপের কাছে এসেছিল। মনের আদান-প্রদান ঘটেছিল। সংসার পাতার কথা কোন দিন তেমনভাবে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে স্থান পায়নি। সুমিতার কাছে অরূপের অস্থির জীবনের কোন পরিচয় ছিল না। ধীরে ধীরে কলেজ চত্বরে সুমিতার কাছে অরূপের অস্থিরতার প্রকাশ পেতে থাকল। সামনা-সামনি হাল্কা কথাবার্তায় অরূপের মিষ্টিজল সুমিতাকে আকৃষ্ট করেছিল। অরূপের অস্থির জীবনযাত্রা ক্রমেই সুমিতাকে শঙ্কিত করে তুলছিল। সুমিতার সমস্যাকুল যে সীমিত তাও স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সুমিতাকে অগ্রাহ্য করে সেদিন যখন সুষমার হাত ধরে অরূপ ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল তখন আমার খুব খারাপ লেগেছিল। সেটা কলেজ-জীবন শেষ হওয়ার দিনের ঘটনা। সুমিতা বিচলিত হয়নি। মনের দুঃখ মনেই চেপে রেখে সে দেখতে চেয়েছিল ঘটনা কোন্ দিকে গড়ায়। সুমিতা অরূপের বাড়ি গিয়েছিল। অরূপের মা বাড়ির বাইরে থেকেই সুমিতাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

সুমিতা এমনিতে ধীর স্থির ; ওর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে বয়সটা আবেগ আছে তার চাইতে বেশি আছে জীবনের বিশ্লেষণ ও জীবনদর্শন। একদিন সুমিতার সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম। খুব স্বাভাবিকভাবেই সুমিতা, অরূপের সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছিল। অরূপের কথা বলতে গিয়ে ও বলেছিল জীবন তো পিছু হাঁটে না, পিছনে ফেলে আসা দিনগুলো যত বড় হতে থাকে মানুষের চিন্তার রাজ্য তত প্রসারিত হতে থাকে। ও আরও বলেছিল, যে ঘটনা একদিন কেবলই নিজের মনে হত তা যে কত সুন্দরভাবে আমাদের চারদিকে ছড়ানো ছিল তা তখন দেখতে পাইনি। সেদিন সে-চোখ ছিল না, সে-মন ছিল না, সে হৃদয়বৃত্তিও তখন গড়ে ওঠেনি। মনের অন্তরতরে দিনের পর দিন কত ছবি আঁকা হয়ে গেছে তার খোঁজ রাখতাম না। অতীতকে সাথে নিয়ে চলাই বলেই এ একরকমের চলা। সৃষ্টি আমাদের সবাইকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, মূর্খার গতি কত স্পষ্ট। তাই যাত্রা শুরু করে সৃষ্টি যেমন অতীতকে

সাথে নিয়ে চলেছে যেমনি করেই চলতে হবে। এ-চলার আনন্দ সেই জানে যে কখনো নিজের ঘটনাকে কেবলই নিজের করে নেয়নি।

প্রথম দেখার পর অরূপ রমলার কাছে গেছে। পরে হাত নিয়ে প্রথম ডাকার পর থেকে 'বৌদি' ডেকে তাকে মুগ্ধ করেছে। বিনয়ী ভঙ্গি হয়ে রমলার রূপ বর্ণনা করেছে। রমলাকে কাছে টেনে আদরও করেছে। মুখের রঙিম আভায় রমলার মুখ ঢোপন থাকেনি। রমলা হয়ে উঠেছিল প্রসন্নতা ও প্রাচুর্যময়। রমলার স্বামী গুছির সংসার করে আর চুলিয়ে আসছে। রমলার কোন পরিবর্তন কোনদিন তার চোখে পড়েনি। কিন্তু রমলা বুঝতে পারছিল যে সে জড়িয়ে পড়ছে। পরিণতি কখনই সুখের নয়। তাই সে একদিন অরূপকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। রমলা বুঝতে পারে সংসারের সুখ যদি কিছুক্ষণের হয় সংসারের বাইরের সুখ কিরৎক্ষণের। অরূপকে সবের হওয়ার কথা বারবার বলে সে যখন নিজেকে ওপরে নেওয়ার চেষ্টা করছিল তখন অরূপ ধীরে ধীরে নারীর মুখ থেকে সবের হওয়ার কোমল পরামর্শের মধ্যে প্রমর খুঁজে নিয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। রমলা ছিল নিঃসন্তান। তার স্বামী ভুলে থাকতে চাইলেও তার মনে দুখ ছিল। রমলা এমনিতেই স্বজনবী। তারপর তার নিঃসন্তান অবস্থা তাকে আরও নীরব করে দিয়েছিল। পাড়াপড়শি আর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঐ একই প্রশ্ন বারবার শুনতে শুনতে তার আর কারও সাথে মিশতে ইচ্ছে করত না। নিজেকে খুবই গুটিয়ে নিয়েছিল। তার স্বামী পুলিশ বিভাগে সামান্য চাকরি করত। এক দুর্ঘটনায় তার স্বামী অকালে মারা গেল। রমলা তার স্বামীর চাকরিতে বহাল হ'ল। এরপর রমলার সাথে অরূপের যখনার দেখা হয়েছে। সৌজন্যমূলক হাসি আর দৃষ্টি বিনিময় করেই শেষ হয়েছে হঠাৎ দেখা হওয়ার পালা।

সুমিতার বিয়ে হয়েছিল প্রণবের সাথে। বাবা-মার দেখে দেওয়া পাত্র। পাত্র মেধাবী। উদার ও আধুনিক মনের। বাবলার অধ্যাপক।

অরূপ নারীসঙ্গ ছাড়া কিছুতেই দিন কাটাতে পারে না। জীবনে অনেক মেয়ের সাথে মিশেছে কিন্তু কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধবার কথা ভাবেনি। রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানে কৃষ্ণার গান শুনে ওর সাথে আলাপ হয়েছিল। তারপর কিছু মেলামেশা। লেকে, বেড়োবাঁধ আর ভিক্টোরিয়ার এদের সম্পর্কটা গভীর হয়েছিল। দুজনেই দুজনের কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। একদিন ওরা ঠিক করেই ফেলল যে বিয়ে না করে ওরা সহবাস করে জীবনটা কাটিয়ে দেবে। বিয়ের মধ্যে যে একধেয়েমি আছে তা নিয়ে ওরা অনেক আলোচনা করেছে। বিয়ে করলে পরস্পরের ওপর যে দায়িত্ব এসে পড়ে সে-দায়িত্ব পালন করার মতো মানসিকতা দুজনেরই ছিল না। ওরা ভেবেছিল উভয়ে উভয়ের সঙ্গ পাবে অথচ মুক্ত থাকবে, কেউ কারও কাছে বাঁধা পড়বে না। ওরা দু-জনেই বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে সংসার দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে গেছে। নতুনত্ব একটা কিছু চাই। ওরা ঠিক করেছিল কেউ কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না, কেউ কারও ব্যাপারে নাক গলাবে না আর যখন ইচ্ছে হবে একজন আরেকজনকে ছেড়ে যেতে পারবে। ওরা ভাবত আর বলত সহবাসের মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে, বিয়ের মধ্যে তা নেই। দুজনেই স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে ভেবেও ওরা আনন্দ পেত। কৃষ্ণা আর অরূপ সহবাস করে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগল।

সুমিতার দিন যায় সাধারণভাবে। প্রণবের সাথে বয়সের তফাত একটু বেশি-ই। সুমিতার সাথে তেমন উচ্ছল হয়ে মিশতে পারে না। সংসারে যদি অভাব কোন কোনও থাকে তো আছে কিন্তু সংসার পুত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই চলে এবং সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার মতো কোন ঘটনা কারও দিক থেকেই ঘটেনি। প্রণবকে একটা চিন্তা ঘিরে রাখে, সেটা হ'ল চাকরির কারণে ভটর হওয়া নইলে কোন উন্নতি নেই। স্বামীর সাথে বাড়িতে থেকেও সুমিতার প্রায়ই একা একা লাগে। পত্রিকা, ম্যাগাজিন আর চিঠি দিয়ে সময় কাটে। বাইরে বেরুলেই বন্ধুর বাড়ি যেতেই বেশি ভালো লাগে। মার্কেটিং-এ তেমন কোন উৎসাহ নেই। যা না হলে নয় সেটুকুতেই সুমিতা সন্তুষ্ট থাকতে পারে। সবের মধ্যে বেশী একটু চোখে পড়ে সেটা হ'ল প্রসাধন জিনিসের মার্কেটিং। সময়ে সুমিতা একটি কন্যা সন্তানের জননী হয়েছে। মেয়ের তদারকির কাজ হাতে আসার পর সুমিতার সময় বেশ ভালভাবেই কাটে। কখনো কখনো বেশ সময়ের অভাবও ঘটে। প্রণব ভালো মানুষ। শান্ত প্রকৃতির। কারও সাথে উঁচু গলায় কথা বলে না। এমনিতে অমায়িক স্বভাবের। প্রণব শুধু যা পারে না তা হ'ল বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে যতটা সময় দিলে ভাল হয় তা দিতে পারে না। স্বাধীন বেড়িয়ে আসা, লক্ষ্যহীনভাবে স্ত্রীকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কিংবা লেকে-পার্কে যাওয়া ইত্যাদি বিবাহিত জীবনের বাইরের এই অনুষঙ্গগুলির প্রতি প্রণবের কোন আগ্রহ ছিল না। সুমিতা প্রথম প্রথম ওর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল কিন্তু কোনদিন তার ইচ্ছা জোরালো করতে চায়নি। সবই মেনে নিয়েছিল। এক অর্থে সুমিতার সংসার আদর্শ সংসার ছিল।

অরূপ সুমিতার সাথে যোগাযোগ রেখে চলত। মাঝে মাঝে সুমিতার বাড়িতে এসে প্রণবের সাথে গান কবিতা আবৃত্তি নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠত। প্রণবের কাছে অরূপের কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না। স্বেচ্ছায় পরিচয় পেয়ে প্রণব অরূপকে গ্রহণ করেছিল তা সুখের ও আনন্দের। অবশ্য অধ্যাপক অরূপের আলোচনার বিষয়বস্তু সহায়ক বলেই মনে করত। সুমিতা অরূপের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে কখনো কখনো কল্পনার অনুরণনে কাকে যেন ছায়া দেখতে পেত। কিন্তু সুমিতার অবস্থা এমন যে ও সর্বস্ব খুলে প্রণবকে কাছে বুঁকি নিতে পারছিল না। সুমিতা ও অরূপের পূর্ব পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার কথা না জানলে আপাতভাবে ওদের দুজনের কারও কাছে এমনকী প্রণবের কাছেও ওদের সম্পর্ক নির্মল এবং সন্দেহ বা আপত্তির কোন অবকাশ ছিল না। বরং অরূপ সুমিতার বাড়িতে সম্মানিত অতিথি। অরূপ সুমিতার সাথে অন্তরঙ্গ বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার কোন চেষ্টাই করেনি।

কৃষ্ণা অরূপের মতোই উদ্দাম। বছর তিনেক পার হতে না হতেই কৃষ্ণা ও অরূপের মধ্যে নানাবিধ কারণে কলহ শুরু হ'ল, এমনকী হাতাহাতিও। অথচ কেউ কাউকে ছেড়ে যাওয়ার উদ্যোগ নিতে পারছে না। অরূপের অনেক ভাল দিক আছে তারপর পুরুষ বলে ওর পক্ষে একা হয়ে যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই কিন্তু কৃষ্ণার যাওয়ার কোন জায়গা নেই। কৃষ্ণা সহবাস করতে করতে অরূপকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করল। অরূপের ওপর ধীরে ধীরে চেপে বসতে চাইল। অরূপের গতিবিধির ওপর জবাব চাইতে শুরু করল। অরূপ এই রকমের সহবাসের কথা সরে নিতে পারছিল না আর তাইতেই শুরু হল কলহাকাটি। কৃষ্ণা একটা থিয়েটার গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিল। ঐ থিয়েটার গ্রুপের কয়েকজন এসে একদিন অরূপকে শাসিয়ে গেল। কৃষ্ণার ওপর কোন অত্যাচার তারা সহ্য করবে না। কৃষ্ণা যখন এইভাবে বাইরের লোক এনে অরূপকে শায়েস্তা তখন অরূপ বুঝল কৃষ্ণাকে নিয়ে আর চলবে না কিন্তু কিভাবে কৃষ্ণাকে ছাড়বে বা কৃষ্ণার কাছ থেকে

মুক্তি পরে তাও বুঝতে পারছিল না।

এদিকে সুমিতার ছেলে দুর্দিন, তাকে পাশে বসিয়ে সান্ত্বনা করা দরকার। প্রণব অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে, তার একদিক প্যারালিসিস। ডাক্তাররা বলছেন ভরসা কিছু নেই। কিন্তু সারতে সময় লাগবে। হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরার পর ফিজিওথেরাপি বহুদিন চালাতে হবে এবং হাঁটা-চলা ফিরিয়ে আনতে সময় লাগবে। অরূপ হাসপাতালে যায় সুমিতাকে যতটা সাহায্য করা যায় তা অত্যন্তিকভাবেই করে। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পর অরূপ সুমিতার বাড়িতে অল্প সময়ের জন্য হলেও প্রতিদিন যায়। সুমিতার সংসারের বাইরের অনেক কাজ করে দেয়। মাঝে মাঝে প্রণবের সাথে আগের মতোই আলোচনা করে, সুমিতাও যোগ দেয়। অরূপ এলে প্রণবের সাথেই কথা বলত, সুমিতা বড় একটা আসত না, অন্য ঘরে বসে-শুয়ে কাটাত। এখন প্রণব, অরূপ ও সুমিতা একসাথেই বসে আলোচনা করে। ছোট মেয়েটা এসে মাঝে মাঝে সবাইকে বিরক্ত করে সবাই-এর মনোরঞ্জন করে। এমনি করেই চলল অনেকদিন। কৃষ্ণা চলে গেছে। বাবা তার দেখতে এসেছিল তারা কৃষ্ণার এই উপকারটুকু করতেই এসেছিল। কৃষ্ণাকে ছাড়িয়ে তাদের একজনের সাথে জড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কৃষ্ণার হয়ে আসাতে এলে কৃষ্ণাকে কোমল করা শিখেছিল। তারপর বোঝানো সহজ ছিল যে এইভাবে সহবাস করা যায় না। পুরুষশাসিত সমাজে সহবাসেও নারীর ওপর অত্যাচার হতে পারে এ-কথা একজন পুরুষই কৃষ্ণাকে বোঝাতে পেরেছিল। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্বাধীনতা লোপ এবং লাঞ্ছনার কথা পুরুষের মুখেই নারীর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়।

তারপর যে কী হল। সুমিতা ধীরে ধীরে কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকল। অরূপের কাছ থেকে কবিতার বই চেয়ে পড়তে আনল পেত। কবিতার বই কিনতে শুরু করল। প্রণবের সাথে কবিতা, আবৃত্তি, গান আর সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় বেশ আগ্রহী হয়ে উঠল। অরূপ এলে সুমিতাকে খুব উজ্জ্বল লাগে। আজ কখনো সুমিতা হয়ে উঠত বেশ গম্ভীর, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছে। সুমিতা তবে জীবনের কোন ঘটনাই বিশেষ নয়। একটির পর একটি ঘটনা আমাদের কেবলই সামনের দিকে ঠেলে এগিয়ে নিচ্ছে। মুহূর্তটিতে আমরা কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত রূপ সবাই আমরা কোন ঘটনার কৃতিত্বের বড়াই করছি। ঘটনার রূপ পাল্টায়, শুধু দেখতে পাই না। একই ঘটনা একেকটি একটি মহা ঘটনা সময়ের অন্তরালে মুখর ও গ্লানিময় জীবনের সূচনা করে আবার উজ্জ্বলতর পথ ধরে একদিন আনন্দময় করে তোলে। চোখ মেলে দেখলে এ-সবই সকলের চোখে পড়ে।

প্রণবকে অসহায় লাগে। শয্যাশায়ী। কখনো কখনো অরূপ বাড়িতে এলে অরূপ ও সুমিতা অস্ফুটস্বরে চুপি চুপি কিছু কথা বলছে দেখা যায় কিন্তু কি কথা বলছে জানা যায় না। মনটা খুঁত খুঁত করে। কী যে হল! অরূপ এত ভাল ছেলে, সুমিতা এত ভাল মেয়ে তাছাড়া বিবাহিতা, ওরা কি ভুল কাজ করবে! সুমিতা প্রকৃত গৃহবধূ, ওকে নিয়ে ভয় করার কি আছে! প্রণব আবার অন্যভাবেও ভাবে। পৃথিবীতে যত ঘটনা ঘটছে এবং ঘটে চলেছে সবই নিজের জীবনে ঘটলে অবশ্যই তা বুঝতে পারব এমনটি কী ভাব যায়! তবুও অনেককে দেখলে তাই মনে হয়। এই মনে হওয়ার মধ্যেও মনের বিস্তর অবকাশ আছে। সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে যেমি সাহিত্য তখনই খুব ভাল লাগে যখন সেমি কোন ঘটনা হয় নিজের জীবনের সাথে মিলে তার কিন্তু আমার মনোরাজ্যে যে অসংখ্য জীবনের ছবি আছে তাদের সাথে মিলে যায়। সাহিত্য যাঁরা রচনা করেন তাঁরা কত অসংখ্য জীবনের সৃষ্টি করেন — সবই কি তাঁদের নিজের জীবনে পাওয়া! তবে বুঝতে অসুবিধা কোথায়।

অরূপের মধ্যে সুমিতাকে নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি নেই। অরূপ আসে-যায়। সুমিতাকে দেখতে পায়, সুমিতার সাথে কথা বলতে পায়, সুমিতার উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে — এতেই তার আনন্দ, এতেই তার সুখ, এতেই আছে তার বাস্তব ও স্বপ্নরাজ্যের সব কল্পনা। অরূপ তবে পথ চলাতেই আনন্দ, পথ চলাতেই অনুভূতির আলরূপ, পথ চলার আয়োজনটুকু যেন শেষ না হয়। কে যে কিভাবে আমাদের সকলকে এগিয়ে নিচ্ছে জানি না, চোখে পড়ে আমরা সকলে সকলকে এগিয়ে দেওয়ার কাজ করে চলেছি। যে আসছে তাকে আসতে দাও, ঘটনা যে-রূপে প্রকাশ পাচ্ছে তাকে সেইভাবে প্রকাশ পেতে দাও, আসল চেহারাটা দেখতে দাও, সেই চেহারার মধ্যে যদি প্রথম দেখার অকল্যাণের বোধ জাগে সেই অকল্যাণের পরশটুকু পেতে দাও, সেই চেহারার মধ্যে যদি ভীষণ-ভয়ঙ্কর কিছু ধরা পড়ে তার মুখোমুখি হতে দাও। যে আসছে তাকে সময়ের দান বলে গ্রহণ কর। সময়ের কাছে আছে চাওয়া-পাওয়ার অসংখ্য সম্ভার। সময়ের মধ্যে অসময় নেই। ভয় পেতেও ভয় হয়।

তারপর যে কী হল! ❑

"ভারতের সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল করবার উপায় নাই। সকলের উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা।"

— স্বামীজি

"কিছু একটা দীর্ঘদিন ধরে কেবল চলে আসছে বলেই তা ভালো হয়ে যায় না ...। মাঝে মাঝে তাকে যাচাই করে বিচার করে নিতে হয়।"

— কথাশিল্পী

বুকে সংকল্প

চোখে মোদের সোনালী ভবিষ্যৎ

দেশের কৃষিক্ষেত্রে বইছে দিন-বদলের হাওয়া। জনসংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খাদ্যের চাহিদা। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কৃষির অগ্রগতি। কালের চাহিদা-সারের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার। তিন দশক ধরে মাঠে মাঠে সাফল্যের ফসল তুলছে একটি নাম—ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড, বা ইফকো। তৈরি করছে চেতনা। সবুজ বিপ্লবের তাগিদে জেগে উঠছে সারা দেশ।

নতুন দিন আনে নতুন চ্যালেঞ্জ। ইফকোও নতুন শতাব্দীর জন্য তৈরি হচ্ছে। সার্বিক বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়েছে এক ব্যাপক, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা-'ভিসন ২০০০'। সারের দুনিয়ায় ইফকো হবে শুধু দেশের সেরা নয়, বিশ্বের সেরা। বিরাট পরিকল্পনা, রূপায়ণে চাই অবাধ গতি। আরো প্রসার। আরো বৃদ্ধি। আরো বিশাল বিকাশ। নক্‌শা তৈরি। কাজও শুরু।

IFFCO

একটি স্বপ্ন, একটি সন্ধান

ইণ্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিমিটেড

হিমঘরে অগ্ন্যুৎপাত

দিব্যেন্দু পালিত

হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ঢুকেই দাওয়ার ওপর নেতিয়ে পড়ে নকড়ি। ডাকি-বেড়ার গায়ে ঝোলা ট্যাংরা-পলা আর চুনকুটে বিড়ে যেন ঝড়ে বাদুই-বাদার মতই চোখের সামনে দুলে ওঠে। আপনা-আপনিই চোখের পাতা দুখানা বন্ধ করে কাঁপতে থাকে। বুকের মধ্যে ঢিবঢিব। গলার কাছে বমিবমি। হাত-পা সারা শরীর ঝিমঝিম অবশ। — একটু পরেই শশিবালার কাপড়া কাঁচানো হাউ-হাউ কান্না।

কান্না শুনেই ঘরের পেছনের কলা গাছের আড় ছেড়ে গামছা কাঁধে পড়ি-মরি বেরিয়ে আসে ফুলমণি। নকড়িকে ওই অবস্থায় দেখে ভাবে — আর রক্ষে নেই, এবারে নির্ঘাত অসুরের পালা। দাস পাড়া, হাট পাড়া সেব করে শয়তানের দল এবারে নিশ্চয়ই এদিকে ছেড়ে আসছে। তাহলে উপায়? এক ছুটে ঘরে ঢুকে জানলা সরজা দুদ্দাড় বন্ধ করে দেয়। পাশের কোকড়ে নেকড়া খোঁজে। তারপরে উঠোনে প্রায় শুরু নিয়ে নেমে ছালুনি তকনো পাতা ও আবাদ্য উঁই করে জমা করে। মনে মনে কষি আঁটে — আসার আগেই আগুন দিতে হবে। ধোঁয়ার নিশ্চয়ই পালাবে। দু-দিন আগে পঞ্চমুড়োর মা এরকম কথাই বলেছিল। কথিটা যার কলা হলেও ট্যাপা-টোপা বোকা চাউনি ফুলমণি নিজেই নিজেকে অরিক করে বেশ নিশ্চিন্ত হয়। তারপরে পায়ে পায়ে নকড়ির সামনে এসে ঘরে এসে দাঁড়ায়।

বাঁ-হাতে নাকের সিকনি মুছে কোঁপাতে কোঁপাতে নকড়ি জিজ্ঞেস করে, — ও তখনে কি হবে?

— আগুন দিব।

— কুথায়? আমার মুখে?

বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে ফুলমণির। কি অলক্ষুণে কথা রে বাবা। মানুষটার কি মাথা খারাপ হয়েছে! আপনমনে বলে, — ওনিহি আগুন উঁয়া পালায়।

বিরক্ত হয় নকড়ি, — ইখনে আসবে কেন? ইখানে কি বস্তা উপুর করা হয়েছে?

— তাহলে তুমি ভুলমাল কাঁদ কেন?

নকড়ি হাঁ হয়ে যায়। এ মাগী বলে কি? আমার এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল আর আমি কাঁদব না। বউকে গাল দিতে নিজেও পারে না। তবে তখনে যদি ও অজ্ঞান হয়ে যায়। ওর কি দোষ? ও তো এখনও জানে না? দেখে চোখ রাখতেই আর নিজেকে সামলাতে পারে না। — ঘুলী রে, সক্কনাশ হয়ে গিছে, সক্কনি গিয়ে একদম এ-কোঁড় ও-কোঁড়।

— আই মা! কাকে মারল? খুন পাটি?

— কাকেও না, আমাকে - আমাকে। সকাল থিকে লাইন দিয়ে দশ বস্তা খাদ করেছি, দশটা বস্তাই — চাতলে উপুর করা মাত্রই।

আর খুলে বলতে হয় না। ফ্যাল-ফ্যাল করে ফুলমণি এদিক ওদিক তাকায়। অপরিচিত দৃষ্টিতে নকড়িকে দেখে। তারপরে ধুপ করে পা ছড়িয়ে বসে দু'হাতে বুক চাপড়ে চিৎকার করে ওঠে, — অত্তো আমার কি হল রে — এত বড় সক্কনাশটা খুন ওতন করল রে — হে ভগবান তুমি অকে কলা করে নেও। তার গায়ে পুকা পড়ুক, কিরে কুটে হোক — নিপাত হোক। ঘরে আসছা টানু রে —

কান্না শুনে আশ-পাশ বাড়ির দু'একজন উঁকি-ঝুঁকি মারে। কিন্তু বাড়িতে কেউ ঢোকে না। আন্দাজেই বুঝতে পারে হিমঘরে লাশের সংখ্যা আর একটা বাড়ল।

ক'দিনের মধ্যেই গাঁয়ের চেহারাটা বদলে গেছে। কান্না, ঝগড়া, চিৎকার, উত্তেজনা, মিছিল, মিটিং, ঘেরাও, সরকারি আমলা কর্মচারিদের আনাগোনায় সর্বদাই টান-টান। এবেলা ওবেলা নতুন নতুন গুজব। দুর্গন্ধে বাতাস ভারি। সঙ্গে উপসর্গ — মাছি।

লক্ষ লক্ষ নীল-কালো মাছি। আকারে গে-মাছির মতই কিংবা একটু বড়। আকাশ কালো করে ধেয়ে আসছে। যেখানেই বস্তা খোলা হচ্ছে সেখানেই আক্রমণ। রোদের ভয়ে অনেকেই পালিয়েছে। সমর্থ যাদের আছে তারা ওষুধ ছড়িয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কেলাকৌশল আপনাচ্ছে।

সমবায়মন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, বিদ্যুৎমন্ত্রী ও সচিবমন্ত্রীদের জন জন কাজিয়া-বৈঠক। পরস্পর দোষারোপ এবং সংবাদপত্রের চাপান-উতোর রাজনীতিই শান্ত নিরুপ হরিত প্রশ্নকে খাস্ত করে তুলেছে। ছোট চাষী প্রধান প্রশ্ন এই হরিত। এ গাঁয়ের প্রধান চাষ বস আর আলু। যারা চাষী নয় তারাও মরশুমে আলুর ব্যবসা করে দু-পয়সা কামায়। দশ-বারো মাইলের মধ্যে সাত-আটটি হিমঘর। ঘরেসে সর্বকনিষ্ঠটি এখানে, এবং সেটি সমস্তর হিমঘর।

ঘটনার সূত্রপাত ক'দিন আগে। সমবায় হিমঘরের বস্তা খোর করা মাত্রই দেখা যায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ আলুই পচা। ঘাট কেজির বস্তার দু-আড়াই কেজি স্বাভাবিক-ভাবেই নষ্ট হতে পারে। এতকাল তাই হয়েও এসেছে। কিন্তু সব আলু। এ যে বজ্রপাত। চাষী, ব্যবসাদার, দালাল, কর্তৃ, হিমঘর-কর্তৃপক্ষ-কর্মচারি সবার মাথাতেই হাত পড়ে। আশপাশের ব্যক্তিমালিকানা হিমঘরের আলুও বের হয়। কিন্তু সেখানে সব ঠিকঠাক, যত কালো হরিত গাঁয়ে। খবর চলে হুহুরে। যাদের এ সময়ে আলু বের করার কথা নয় তারাও বের করে ফেলে পড়ে। বস্তা বস্তা আলু পচা। যাঁরা থেকে বের করে চাতালে ওজনের আগে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়নি। কিন্তু মাঁতা ছিঁড়ে ভেতরে কাটা মাত্রই দুর্গন্ধ। সে দুর্গন্ধে কেউ টিকতে পারে না। হাজারে হাজারে নীল-কালো মাছি কোথা থেকে ধেয়ে এসে শব ভুলে ভনভন করে। কেউ সেখানে থেকতে পারে না। হিমঘরের সভাপতি, সম্পাদক পালায়। অফিসার, ম্যানেজার মায় যায়। সমর থেকে, কলকাতা থেকে, অফিসাররা ছুটে আসে। বিজনসভায় হৈ-হট্টগোল-ধাওয়াধাওি। দুষ্টচক্রের আলুব্যাজিতেই আলু নষ্ট অভিযোগে সভা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। প্রশাসন নড়ে-চড়ে বসে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা গাঁয়ে এসে ওষুধ ছিটায়। পচা আলু পুঁতে দেয়। শেষে তারাও হাল ছেড়ে পালিয়ে যায়।

কীস আশায় বুক বাঁধে কিছু মানুষ। যদি অসের বস্তা রক্ষা পায়। নকড়িরও বিশ্বাস ছিল। সে কোনদিন কারও ক্ষতি করেনি। সুতরাং ভগবান তারও কোন ক্ষতি করবে না। তার বস্তা ঠিকই থাকবে। এলাকার সবচাইতে বড় হিমঘরের সব আলু কি কখনও খারাপ হতে

পারে?

তিন কিস্তির মধ্যে এইবারই প্রথম কিস্তির আলু বেচা করা। আর ক'দিন পরেই বেচা করবে বলে ঠিক করেছিল। কিন্তু পচা আলুর খবরে দুশ্চিন্তায় উত্তেজনায় আর স্থির থাকতে পারেনি। এ চাষ ও ব্যবসার হাতে খড়ি বলে খুব স্বাভাবিক কারণেই আগ্রহটা ছিল একটু বেশি।

গতকালই গণেশবাবুকে ছুটির জন্যে বলেছিল, — বাবু, কাল কিন্তু আসতে পারবনি।

— কেন রে, তারকেশ্বরে জল ঢালতে যাবি?

— না বাবু, মনস্থির করেছি মোট। আর যাবনি। কাল আলু বালাস করব। কি যে কপালে আছে।

গণেশবাবুর কপালেও ভাঁজ পড়েছিল, — খপর সুবিধের না। অন্য হিমঘরের থেকে আড়া কম বলে তোরা সব ওখেনে — তোর আলু তো রুয়?

— মাল সত্তর বস্তা।

— কিন্তু অবিশ্যি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ভরসা পায় নকড়ি। গণেশবাবুকে ভাল এ জন্যেই লাগে। কত বড় মানুষ — তেলকলের মালিক, ইদিকে বড় ইস্কুলের মাস্টার, পার্টির মাথা, পঞ্চায়েতের কর্তা — কিন্তু কোন দেমাক নেই। এমন উপকারি মানুষ এ যুগে দেখা যায় না। ওই মানুষটাই তো বলেছিল — তুই কি চিরদিন গোলামী করেই কাটাবি নাকি? তিন, তিসি, রাই, সরষেকেড়ে ওদিকে ক'দিন চলবে? তুই নিজেই যে শুকিয়ে যাবি।

মুখ ফুটে না করে বলেই ফেলেছিল নকড়ি। — একটা চাকরি দেন না বাবু।

— দূর বুদ্ধু, চাকরি কি গোলপর খান যে, ফুকো ফুলালেই গলগলিয়ে বের হবে? আরে —

চাকরির রাজা সরকারি
তো চাষের রানী তরকারি

সরকারি চাকরি ছাড়া যুৎ নাই যেমন, তেমনি আলু ছাড়া তরকারিতেও স্বাদ নাই। বুঝলি নকড়ে — আলুর চাষ কর।

— ন্যাংটা ফকিরকে রাজভোগ খেতে বলছেন বাবু?

— নকড়ে। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমার বাবা তেলকল করে যেতনি। দুই একটা ছমলো জোয়ান হয়ে যদি কানে পাতা চাপা দেওয়া ছাগলের মত ন্যাদোস হয়ে থাকিস তাহলে পেট ভরবে? ভরবে না। গর্জে ওঠে। সরষে থেকে তেল বের করতে না জানলে তোর তেলও যে আর একজন বের করে নেবে।

— হ্যাঁ বাবু, শিয়লকাঁটার তেলও নেয়।

— তাহলেই বোঝ। — তাই বলছি, আলুর চাষ কর। করবি? গোলাবাড়ির পেছনের জমিটা। দেখেছিস? আড়াই বিঘে। পড়েই আছে। রাজি থাকলে বল বন্দোবস্ত করে দিই। দুই করলে কেউ আর বাগড়া দেবে না। আমিও নিশ্চিন্ত হব।

জীবনের আসল যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ওই আড়াই বিঘেতেই।

এক সময়ে মুক্তনের কান্নাই বন্ধ হয়ে যায়। কেউ কোন কথা বলে না। কারও দিকে তাকায় না। সন্ধ্য আগুনে পোড়া বাড়ির ভাঙ্গে স্তূপের ছাই-কালি ধোঁয়ার দিকে যেন শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নকড়ি উঠে দাঁড়ায়। ক্লান্ত পায়ে বেরিয়ে যায়। কুলমনি ওমনি বসেই থাকে। কাল কিরতেই আস্তে আস্তে কত কথাই না মনে পড়ে।

দু'শাস্ত্র রোজের চুক্তি, নাকছাবি আর সরু চেন পাঁজা-খুড়োর কাছে বন্ধক রেখে, গণেশবাবুর কাছে কর্জ নিয়ে জমি তৈরি শুরু হয়েছিল। বন্ধক রাখার কথা গণেশবাবুকে জানায়নি। জানলে রেগে যেত। কেননা বাবুই ওকে বলেছিল — নকড়ে, ঘরের লক্ষ্মীর গয়না বাঁধা দিয়ে কখনও চাষ বা ব্যবসা করনি, ওতে অলক্ষ্মীর হয়। মা অন্নপূর্ণা বেজার হয় —, তাই কি এই সর্বনাশ। মানুষটা কত পরিশ্রম, কত কষ্ট করে খাড়া হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল — আর পারবে না। তিন খড়ের ঘরটুকুও যাবে এবারে। বাবুর কর্জ মেরিতে ওখনেও না হয় চলবে। কিন্তু পাঁজা-খুড়ো? আলু উঠতেই দু-বস্তা এমনিতেই দিতে হয়েছিল খাওয়ার জন্যে। তাও কত কথা।

— অ কুলি, তোর কত্তা ঘরে আছে?

— না, এখনি আসবে। বলেন খুড়ো।

— না রে। সময় বড় কম। তা নকড়েকে ওখুন তো ও কি খেয়ে খেয়ে আমাকে খুড়ে আলু আর চাকি -আলু খেতে দিয়েছে? লজ্জা পেয়েছিল কুলমনি। তাও কি কখনও সম্ভব? গরু খুঁড়ের চপে কি সব আলুই খামি হয়? তা যদি হত তাহলে তুলতে তো কেউই লাগল দিত না। লাল চাকি রোগ তো ভেতরের ব্যাপার। বাইরে থেকে তা কি টের পাওয়া যায়? অস্ফুটে বলেছিল — কি যে বলেন খুড়ো, দু'একটা হবত —

— না রে মা, দু'একটা না — গোটা বস্তাই। যাক ওকে বলিস আর এক বস্তা যেন দিয়ে আসে।

নকড়িকে সে কথা বলতেই সে খারাপ কথা বলেছিল, — শালা বুড়া ভতন। কেমন লোক দেখিছ। বলতি হত আপনের আলুগুলির চিটা ওড় মাকরে খান।

আলু বীজ বোনার দু'হপ্তা আগে যেদিন জমিতে কলিচুন মেশানো হয়েছিল প্রায় সারাদিন সেও পাশে পাশে ছিল। সরু টিনমিতে উকুন সাবের মতই জমির খড়-কুটো-কাঠি-টিল পরিষ্কার করে মাটিতে চুন মরান দিয়েছিল। তাই দেখে লাজুর মা মুখ টিপে হেসেছিল। — কোলে নাই মাণিক, ও আলু যাবে কে? আলু না কলাবে —

প্রথম সর্বনাশ টমুর মৃত্যু। তিন দিনের জ্বরে দু'বছরের বাচ্চা চোখ বুজেছিল। আর খেলেনি। ওর মুখটা মনে করলেই বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে। — বাবা রে। দুই থাকলে তোকে জড়িয়েই বাঁচতাম। কত আশা ছিল তারকেশ্বরে জল ঢেলে আর তো তোকে পেলাম না। ভাক্তার, কবরেজ, হেকিম, তাবিজ-কবচ সবেতেই ধ্বসা রোগ। আর দ্বিতীয় সর্বনাশ এই আলু। হিমঘরের না দেখা আগুনে সব ছারখার। সে আগুন মাছি হয়ে, মাছি ঘরে ঘেরে আসছে। কেউ রেহাই পাবে না। মাছি — মাছি — নীল কালো ডেঁয়ো মাছি লাখে লাখে তাড়া করছে পচা গলা দুর্গন্ধের ভাগাড়ে যেন শকুন হামলে পড়ছে। চারদিকে শ্মশান শ্মশানের মশান-বাতাস বইছে। অথচ এই আলু ওঠার বহু আগে থেকেই যেন বাতাসে তার বুক-ভরা সুঘ্রাণ ভেসে আসত। প্রতিটি গাছ-গাছালি শাক-সব্জির আলাদা আলাদা গন্ধ আছে। চোখে না দেখলেও ওই গন্ধেই বলে দেওয়া যায় বছরের একটা কোন সময়। সজনে-ডাঁটার গন্ধে গরমকাল, বাতাবি লেবুর গন্ধে বর্ষাকাল, আলু-কপির গন্ধে শীতকাল। আলু বীজ বোনার আগে নকড়ি একদিন মুচকি হেসে বলেছিল, — কোন আলু লাগাই বল দেখি?

— সবাই যা লাগায়। — কিন্তু না ভেবেই উত্তর দিয়েছিল কুলমনি।

— দূর, জাল-ফল জাত আছে না। সব বউই কি এক? কেউ টোপা কুল, কেউ বুনো কুল, কেউ সুস্বোর খেদানের ওল, কেউ মাকন গলা ওল। বাঁদর খোস্তও আম — মধুচুষকিও আম।

— যা রে আমি কি অত জানি?

— ওকথা শুনবনি। তোমাকেই বলতে হবে। জ্যোতি — না চন্দ্রমুখী।

— মুটের মধ্যে ভালত?

— তোমার আমার যা — ঠিক তাই। জ্যোতি আমার মত গায়ে কাটা দাগ — খসখসে। আর চন্দ্রমুখী তোমার মত তেলতেলে।

— অসভ্য।

শক্ত দু'হাতে হঠাৎই তাকে বুকে টেনে নিয়েছিল নকড়ি। তারপরে ফিসফিস করে

বলেছিল — চন্দ্রমুখী, চন্দ্রমুখী।

গ্যাবার্ডিন নিয়ে আলু পটা বন্ধ করার একটা মন্ত্রণা হয়েছে কি করে যেন চাউর হয়ে যায়। নিস্তরঙ্গ পাথরের মূর্তির মত নকড়িকে দু'দিন একটু অন্যরকম দেখায়। পনেরো বস্তা আলু। বেতনোতে পচন ধরে, এনে উঠোনে রাখে। গ্যাবার্ডিন মেলায়। দু'দিন পরে অবাক হয়ে দেখে — আর পচছে না। মাছিও উড়ছে না। খুশিতে ফেটে পড়ে, খুলি রে, আমি জানতেম ভগবান অতি করবেনি। আসছে বার তারকেশ্বরে দিন ধড়া চালব। দুই মাসের মধ্যেই চালের ঘড় পাল্টাব। না না, মজুর লাগাবনি, আমিই ছাইব। তুমি ছুড়ে ছুড়ে আটি যোগান দিবে আর ব্লাউজের হাতায় ঘাম মুছবে।

বেশ কিছু কম দামে সস্তা আটা বস্তা আলু বিক্রি হয়ে যায়। নকড়ি হাতেই সন্তুষ্ট। বিড়ি টানতে টানতে বলে, — লাভই আছে। লোকসান হয়নি। ভেবেছিল এলুমিনিয়ম ঘড়া এবার আমি কিনবই কিনব। সেই সঙ্গে লোহার একটা দু'মুখো হাতা, ডাবু ও খোন্তা। ইদিকে ভাল বেঁচি। তো উদিকে কুচো মাছের চকড়ি। কিন্তু একদিন যেতে না যেতেই মাথায় বাড়ি পড়ে। গ্যাবার্ডিন দেওয়া আলু কোনমতেই পাওয়া সম্ভব নয়। চাষা করলেও তাতে ভগবান ওষুধের গন্ধ। টাকা ফেরত দিতে হয়।

জমির ওপরেই আলুর বস্তা সাজিয়ে রাখে নকড়ি। রাতদিন পাহারা দেয় কেন যাছি না বসে। দু'হাতে একটা পলপার টুকরো নিয়ে ছুটে ছুটে বাতাস করে বস্তায়। কিন্তু কিসের কি? পলপার বাতাসে এদিকের মাছি ওদিকে তো ওদিকে ভনভন করে। আরও ঝাঁক বেঁধে আসে। দুর্গন্ধ ছড়তে থাকে। কোন কোন বস্তায় পোকা কিলবিল করে। পাড়া প্রতিবেশী পঞ্চায়েতীদের বসি ঠেলে আসে। নকড়িকে আলু নষ্ট করে দিতে বলে। কিন্তু নকড়ি নির্বিকার। শুধু মাছি তাড়ায় আর গাল দেয়। চোখ পাকিয়ে মাছিদের সঙ্গে ঝগড়া করে। শাপ দেয়, অমন বিচ্ছির কথা ছোটায়। তাই দেখে সবাই বলে নকড়ি পাগল হয়ে গেছে।

ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে নকড়ি একেক সময়ে ভাবে — হায় রে আমার চন্দ্রমুখী। কত স্বপ্ন কত আশায় রয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম চালের লাউডগার ওপরে প্রজাপতি নাচবে। গদাধরিং ঘাড় উঁচু করে অবাক হয়ে তাই দেখবে, তারপরে একদিন পুড়ওভার কৃষি মেলায় খুলনামিকে নিয়ে সস্তাদিন ঘুরবে।

— ও খুলি, কি নেবে? ধনেখালি, না শান্তিপুরী?

— তুমার যা পছন্দ।

— আমার পছন্দ টিকির সাদন সুপারীচের মত পাতলা জমিয়া।

— আই যা, উসব পত্তে নাকি। তুমি কি গ? খুলমকে —

— চুপ চুপ, মাইকে আমার নাম বলে কেন? — চোখ বুঁজেও নকড়ি দেখতে পায় অফিসারের হাত থেকে সে পুরস্কার নিচ্ছে। — এবারে এ মেলায় সব চাইতে কম জমিতে বেশি আলু ফলিয়েছে হরিণ গ্রামের —

বুক চিরে দীর্ঘশ্বাস বেরোয়। টাবুর মত সবাই ফাঁকি দিল। কেউ বাধা বুঝল না। এভাবে বাঁচার মানে কি? সুনিলের আশা নিয়েই মানুষ বাঁচে। সেই সুনিলই যদি বেজায় হয় তাহলে তো বলা পচা জীবন। পটাল দিয়ে আর কি তাকে শোধন করা যাবে? যাবে না। নারী ব্যবসা ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। কি দরকার ছিল এই চাষের। বেশ তো দিন গুজরান হচ্ছিল বাতাসহীন ওমোটে স্থির পাতার মত। রসহীন মাটিতে গজানো হলুদ শুকনো মত। পোকার খাওয়া ফুটি ফাটা ছিবড়ে পাতার মত। শিশড়ে লাগা অটাক্স চাকুলের মত। মাথার মধ্যে ভোঁ-ভোঁ করে। আর ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয় হিমঘরে।

বুক খুঁড়ে অসুর হাসা সমুদ্র কটি পাতে যেদিন বেরিয়েছিল সেদিন নকড়ির মূর্তি দেখে কে। টাবুর প্রথম কান্না শোনার মতই এও এক রোমাঞ্চকর অনুভূতি। আনন্দের চোটে নাচিতে, দরকার নেই জেনেও, সেচ দিয়েছিল। এক ছুটে বাড়ি এসে খুলমণিকে বলেছিল, — ভগবানের কি আশ্চর্য লীলে। বীজ থিকে গাছ। গাছ থিকে ফল। প্রতিটি চারায় জীবন মুকুলিত করছে। পাতার পাতা মোটা হলেই বাচ্চার মত হাত-পা ছুড়ে খলখলাবে।

— অসুর ,াতে তুমি মনতেগ।

— না খুলি না। ছোট্ট শাকের জীবন কতগুলো জীবনকে বাঁচাচ্ছে। এ পৃথিবীতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক আছে। চাঁদ সূর্য মাটি জল গাছ মানুষ সবাই একই গতিতে বাঁধা।

খুলমণি বুঝতে পারে না নকড়ি কি বলতে চায়। হাঁ করে শুধু তাকিয়েই থাকে।

— সেই গতিতে হাত টান পড়ে। বাঁধন আলগা হয়। গতগোলটা লাগে তখুন। তক হয় পরস্পরের দেশা। — কি, মাথায় চুকলনি? মনে কর এক নাগাড়ে বিষ্টি। রোদ নাই, কাপড় শুকায় না। চিতি পড়ে। ওই আবহা কমজোর হয়ে কুটো হবে। কাপড় ছিড়ে যাবে। আবার পয়সা করে কিনতে হবে। কিন্তু হিসেবের বাইরে টাকা নিবে কে? ধার করতে হবে। মানে এক বিষ্টির ঠেলায় বান। ফসলের ক্ষতি, জিনিসের দাম আগুন, চিলিক, ধার

— সব জীবন আলাদা। কখুনো তেমনি তুমি একা বাঁচবে, সম্পর্ক সবার সঙ্গে।

ঘুম থেকে উঠেই প্রতিদিন জোরে নকড়ি ছুটত খেতে। অবাক হয়ে দেখত সমুদ্র পাতার বুকে হিমের মুক্তো নরম রোদে কেমন বিকমিকাচ্ছে। কচি-কলাপাতা সমুদ্র রঙ দিনে দিনে কেমন গাঢ় হচ্ছে। ফুরফুরে হাওয়ার পাতাগুলো কাঁপছে, মাথা দোলাচ্ছে। তাকে দেখতে পেয়েই কেন দু'হাত বাড়িয়ে কোলে ওঠার জন্যে ছটফট করছে। খুব সাবধানে কাছে নিয়ে আলতো ঠোকায় — কেন বাচ্চা না হলে — আদের আবর করত — ও টাবু সোনা, টাবুমণি। তেমার গাল কেমুন নরম, শিউলির মত পাতলা চুল। মোটা শরীলটাই যেমি কেঁড়ের মাথায় দুধের ফেনার মত ফুলফুলে। চেয়েরা রাজপুকুর — উঁহু, কমীচেরা কালো কেষ্ট — উঁহু, সেরটি পরা পাথরে কোঁলা কলের বাগাল। আর কমিন সোনা, তারপরেই তুমি মুক্তো জোয়ান। তোমার বাতাস আমার প্রাণ জুড়বে। হাত ছাড় সোনা, কত কাজ আমার।

একটা ঘোরের মধ্যে দিন কাটছিল। সারা দেহ-মন ফুর্তিতে চনমন করত। স্বাচিত দু-এক কলি গানও ছেঁড়ে গলায় সেরে উঠত —

চন্দ্রমুখী নাও আমার হাওয়ায় উড়ে যায়

আর হালে বসে নকড়ে মাঝি উলুক ঝুলুক চায়।

গান শুনে খুলমণি হেসেই খুন। — ই আবার কেমন ধরার গান? তুমি মাঝি নাকি!

— আহলি কি "না না না নারে নারে নারে" গাব? তোমার নারে আমি হে মাঝিই।

— অন্য কোন নারে যাও কিনা কে জানে।

— এমুন মহুলপথী থাকতে অন্য নারে যাব কেন?

আলু উঠে বস্তা বন্দী হতেই শুরু হল আর এক যুদ্ধ। বস্তা নিয়ে হাহাকার। কালোবাজারী। কখন বেশি হওয়ার সময় থেকেই বস্তা পাওয়ার জন্যে ঘুষাঘুষি কাণ্ড। হিমঘরের দরজায় ট্রাক, গরুর গাড়ি, ভ্যান, বস্তার লাইন। পঞ্চায়েতে ঝগড়া। সমবায় হিমঘরের ভাড়া কম, খাঁচা বেশি — তাই ভিড়ও বেশি, বেশির ভাগ আলুর ফুল ও পেটমোটা বস্তা মাঠেই পড়ে থাকে।

অবহার মেরে নকড়ি যখন নিশ্চেষ্টায় তখন একদিন গণেশবাবুই দেখতে হয়ে দেখা দিল, — নকড়ে। কিমু অবস্থাপন্ন। বস্তু পুঁই পাবি। কিন্তু সমবান, বেশি টাকার বিক্রি করে দিসনি যেন।

— কি যে বলেন বাবু। আপনাকে আমি

অমান্য করতে পারি? — আপনিই আমার পিতৃদাতা — অন্নদাতা — মা অন্নপূর্ণার পুত্তুর।

— আমুর ব্যবস্থা না করে অনেকেই মতের ব্যবস্থা করছে। পার্টির টাইগ্রাও আছে এর মধ্যে। মেশটার কি হল বল তো। পয়সার লোভে মানুষ পিশেচ হয়ে যাচ্ছে। এর জন্যেই কি মুনিয়ার ঝাঁসিতে যুদ্ধেছিল। মাথা যন্ত্রীন প্রাণ বিরেছিল। এদেশের খোল-নলচে পা-টানো দরকার। আজ যদি নেতাজি থাকত তো দেখতে পেতিস কোন শয়তান চা-বো করতে পারত না।

নকড়ি রামভক্ত হনুমানের মত বসে গণেশবাবুর কথা শোনে আর ভাবে বাবুর কত দিকে চিন্তা। আমি ভাবি আলুর কথা, বাবু ভাবে দেশের কথা। এই না হলে মাথা।

মন্ত্রির অত্যাচারে দোটা গ্রামখানা অতিষ্ঠ।

কয়েকটি পাড়ায় ছেটিদের পেটের রোগও দেখা দেয়।

সরকারি অফিসারদের অসাধ্যেদ্য সারতেই থাকে।

মাছি তাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শ দেয়, আলুর চাষ কর না।

রাজ্য সরকার এই অন্যায় পরামর্শের প্রতিবাদে একদিন বন্ধ ডাকে।

এর মধ্যে একদিন সকালে গাঁয়ের ওপর হেলিকপ্টার ঘুরে ঘুরে ধোঁয়ার মত ওষুধ ছড়ায়। মাছি পালিয়ে যায়। কিন্তু হেলিকপ্টার ফিরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই আবার তারা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসে। আলোচনা সমালোচনা উত্তেজনায় মুখর হয়ে ওঠে সভাই।

চাষীদের নিয়ে বিরাট মিছিল বের করে গণেশবাবু। 'বন্ধেমাতরম, আমাদের দাবি — মানতে হবে, মানতে হবে। ক্ষতিপূরণ — দিতে হবে, দিতে হবে।' ধ্বনি তুলে মিছিল গাঁয়ের পথ পরিক্রমা করে। নকড়ি ও সঙ্গে ফুলমণি মাসখানেক আগের মাছিমিছিলের মতই তাতে সামিল হয়। সবার সঙ্গে আওয়াজ তুলতে গর্বে তাদের বুক টনটন হয়ে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতেই নকড়ির মনে পড়ে সেই মাছিমিছিল ও সভার কথা। কলকাতার। জীবনে প্রথম কলকাতার মাঠে সে কথা ভেবেই দু'রাত ভাল করে ঘুম হয়নি। ফুলমণিরও ওই দশা। গণেশবাবুই তাদের সবাইকে ডেকে বলেছিল, — তোমাদের কলকেতা যেতে হবে। জমায়েত একা কলকেতা। সেই জলে সাড়া না দিলে তোমরাই ঠকবে, পিছিয়ে পড়বে। জেনে শুনে বুঝে আমরা দেশটাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না। দিলে পাপ হবে। তোমার আমার ছেলে-মেয়ে চের চরম-দিন জানোয়ার তৈরী হবে। তাই আমাদের জরী নেত্রী কলকেতার ময়দানে সভা ডেকেছে। সবাইকে পাড়া প্রতিবেশী মেলা লোক নিয়ে যেতে হবে। ট্রেনে জায়গা লাগবেনি। দুপুরে পাউরুটি আলুর দম পাবে। জন রেখ, এ লড়াই বাঁচার লড়াই — এ লড়াই জিততে হবে। আমাদী ভোটে যেসের প্রাণ তোমরা আমাদের হতেই হবে। সবাই মিলে জোরসে বল, তুবড়ি কন্যা — জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

সেই মাছিমিছিল ও বৃষ্টি ভেজা সভা মনে রাখবার মত ঘটনা বটে। কষ্ট হলেও সে অনেক ভোলবার নয়। ট্রেনে মারাত্মক ভিড়। ট্রেনের দেখলেই 'বন্দেমাতরম', 'তুবড়ি কন্যা' লড়াই কর — আমরা তোমার সঙ্গে আছি। হাওড়া ব্রিজ, মা গঙ্গা, জাহাজ, পাঁ-পোঁ-মোটর গাড়ি। আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি, প্যান্টলুন পরা বাড়ি মেয়ে। ঝিলমিলে লোক আর দোকান — পেল্লাই ব্যাপার, আশ্চর্য দুনিয়া। মিছিলের টেনের গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ। মনুমেন্টের কাছে আসতেই সব লাইন ভেঙে ছুট। চলা পাতলা রোদ। সে আর এক অনুভব। চলার সিঁড়ি উঠছে, নামছে। ওই সিঁড়ির ঘটনা মেনে পড়তেই কিক করে হেসে ফেলে নকড়ি। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে দেখে কেউ তার হাসি লক্ষ্য করেছে কিনা। সিঁড়ি থেকেই ফুলমণির মুখ ওকিয়ে গিয়েছিল। তার নিজের বুকও টিপটিপ করছিল। তবুও সে সাহস করে এগিয়েছিল। প্রায় জোর করেই ফুলমণিকে টেনে চলার সিঁড়িতে তুলেছিল। ফুলমণি শক্ত হাতে তাকে ধরেছিল। ব্যাকালে মুখে পাশে একটা কষ্ট গঁড়িয়েছিল। তার যে কি হল — থরথর করে কাঁপতে লাগল। তারপরেই পায়ের কাছে গরম জল। আশপাশের সবাই হিঁকে সরে গিয়েছিল।

ময়দানে বিশাল জমায়েত। টিপটিপ করে আবার কখনও জোরে জোরে বৃষ্টি পড়ছিল। মঞ্চে তুবড়ি-কন্যা গঁড়িয়ে হাত নাড়তেই সে কি জিন্দাবাদ আর হাততালি। তারপরে শুরু হল বক্তৃতা। ওহ — সে কি ভেজা। একে গলা টিপে ধরে তো তাকে লাথ মারে। কখনো ভয়-ওঠা ফেপী মা। আবার কখনো ঠিক যেন "বাসর ঘরে বাঘিনী" পালার নায়িকা। হাততালি আর মাইকের গাঁক-গাঁক শব্দে কি বলে ঠিকমত বোঝা যায় না। তবু বোঝা যায় তুবড়ির মত বলছে উঠছে। বেলার মত নেচিয়ে পড়ছে। পাশের একজন বলে — মুখটাই এখন তুবড়ি, মাথাটা, ফুলুরি, কচুরি, ঘুনুরীর — ঠিক কিনা বলুন? নকড়ি হিজের মত মাথা নেড়ে বোঝাই যায়। সভা শেষ হতেই আবার বল বেঁধে ফেরা। ভিড়ে গাদাগাদি ট্রেন। কামরার চিমটিম করে বাতি জ্বলছে। ফুলমণি ক্লান্তিতে তার পায়ে মাথা কাত করে ঘুমিয়ে। সে নিজেও টের পায় — ঘুম পাচ্ছে। এমন সময় টে-টে।

— আরে! গোঁসাই ঠাকুর। তুমি বাপটি মেরে বসে কেন?

— মিটিং-এ গান শুনতে না শোনাতে এসেছিলে?

— মিটিং তো শুনলে, ইবারে আমাদের গান শুনাও।

— উসব রামায়ণ পাঁচালি চলবে না। দিন তো পাগল ছায়।

— না না পি পি তেরা মেরা নিরন্ন।

— ঘুর বালিশ, আমি উসব জানি না।

— কি জান তাহলে? বেদরা সঙ্গীত।

— আর ঘর বাড়াতো না। এই নাও সিগ্রেট। তোমার বাঁধা গান শোনাও। বাঁধো হাতে ঘুঙুর।

একটুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই সোতারার পিড়িং-পিড়িং। সমবেত হাততালি — পিটি। পাঁচালি শুরু হয় —

মঞ্চেতে তুবড়ি কন্যা আহ্বান কত
ময়দানে মেব-জল ঘুচিয়াছে যত।
তুবড়ি কন্যা বক্তব্য কাহাকেও না ছাড়ে
বৃদ্ধ মেঘকুল তাহার প্রসব ভিক্ষা করে।
হাউইতে তুবড়ি কন্যা চক্ষু যারি কহে
বৃত্তরাজ ঘরম করে আর নাহি সহে।
কখনও হেঁদু আমি আবার মোছলমান
ছেট লালি অভিনয়ে জান কেরমান।
ছেঁড়াখাকী আমি বটি মেরায় ইটিলস্ত্রী
নারীমুখে অতি চাই কালো খোঁক দাড়ি।
মরল মর্যনা যদি সমান সমান
একা কোন গর্ভ ধরি চাই নতুন বিধান।।

প্রচণ্ড উল্লাস। হাসি আর হাততালিতে কামরার সবার ঘুম ছুটে যায়। কয়েকজন যুক্তো ওরে — তুবড়ি কন্যা। হে এ এ এ।

কিন্তু আমাদের এ মিছিল চলবে কতক্ষণ। সেদিনের মিছিল ছিল আমাদের আর আজ — সর্বত্র ঘেরাওয়ের।

হিমঘরের সামনে এসে মিছিল থেমে যায়। ওরা হয় সভা। গণেশবাবু মাইকে অদ্ভুত শান্ত ধরধরে গলায় কথা বলতে শুরু করে — ভাইসব, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পার করে আমরা পেলাম কি, ঘাছি কি, খাব কি? আপনারা হাত কানেন পাতা আলু। কিন্তু আমি বলব — না, দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। কঠিন কালো অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। এ অন্ধকার অন্ধকারী এ অন্ধকার অপশাসনের

— বক্তব্যর — দেউলপাড়া। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ওপরতলার তছরুপ হচ্ছে। আর তার ওপরপার সিদ্ধি নিচুতলার আমরা। আড়াই বিঘের আলু চাষী নকড়ি জানে না কাল সে কোথায় দাঁড়াবে — কি খাবে। কে এর জন্যে দায়ী? আমি, না আমার পার্টি? সমবায় হিমঘর সরকারেরই বলা যেতে পারে। অতএব ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও তাদের। আমরা দাবি জানাচ্ছি। প্রতিটি আলু চাষীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। না দেওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। আমরণ অনশন করব। স্কুল কলেজ হাসপাতাল রেল বাস সব বন্ধ করে দেব। যদি না পারি তবে কথা দিচ্ছি আমাদের নেত্রী আপনাদের সবার সামনে গলায় শাল জড়িয়ে মা কালীর মত জিভ বের করে আত্মহত্যা করবে। আর সরকার যদি দাবি মেনে নেয়, তবে সেটাই হবে স্বাধীনতার স্বর্ণজয়ন্তীর পর আপনাদের সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ উপহার।

অধিকাংশের মত নকড়িও গণেশবাবুর বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে পড়ে। এ কয়দিনের ক্লান্ত বিষণ্ণ শরীরে যেন নতুন করে শক্তি ফিরে পায়। ভাবে, গণেশবাবু নিশ্চয়ই একদিন মন্ত্রী হবে। বিড়ির লাল আগুনের চাইতেও আরও লাল, আরও বড় বাতি জ্বালিয়ে কালো হিটিয়ে গাড়ি হাঁকাবে। পুলিশে সেলাম ঠুকবে। সে রাতেই গণেশবাবু যখন তাকে বলে, — নকড়ে। আমার কর্মী আর তোকে ফেরত দিতে হবেনি। ঘাক করে দিলেম। খরখর করে কেঁদে ফেলে নকড়ি।

রাতারাতি গণেশবাবু নয়নমণি — কারও কারও কাছে দেবতা হয়ে যায়। তার ক্ষমতা বাড়ে। ওদিকে আলুর স্তূপ পচতেই থাকে। মাছির উৎপাত আরও সাংঘাতিক হয়। ওরা অনেকটাই সামলিয়ে ওঠেন নকড়ি। কুলমণি নিশ্চিন্তে হাসে। আশায় আশায় দিন কাটে সবার। সরষে-পেশা তেলকলের চাকা দিন রাত ঘোরে।

একদিন গণেশবাবুর বাড়িতে খানা-পিনার আসর বসে। দশ-বারোটি গাড়ি থামে দরজায়। গণেশবাবুর পুরনো চাকর ইঁদুরা নকড়িকে বলে। — তুমি আজ জরুর করে ফিরো। আমি একা পারবনি সামাল দিতে। তোমাদের দু'জনায় ওখান নিয়ে যাও। মনে মনে খুশি হয় নকড়ি। ইঁদুরা তাকে টিনিয়ে দেয় বিভিন্ন হিমঘরের মালিককে, ইলেকট্রিসিটি অফিসের ইঞ্জিনিয়ারকে। আরও দু'একজন অফিসের বাবুকে। মনে মনে আশ্বস্ত হয় সে। আজ একটা বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই হবে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে। কিন্তু সমবায় হিমঘরের কেউ নেই কেন! আড়াই কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়ে?

হো হো হাসিতে ফেটে পড়ে আসরের সবাই। মদ মাংসের ছড়াছড়ি। গ্লাস হাতে গণেশবাবুকে দেখে অবাক হলেও নকড়ি ভাবে — নেতা হতে গেলে এসব একটু আধটু খেতেই হয়। বাবু তো আর রোজ ন্যাপা মুদির মত চোলাই গিলে হল্লা করে না। রঙ তামাশা আলাপের আড়াল থেকে দাবি করতে করতে শোনে — আর ওদের বকলম করতে হবে না। ভোল্টেজ না পেলে হিমঘর চলবে কি করে? সবাই এবার আসবে আমাদের কাছে। শালারা এবার যাবি কোথায়?

— সমবায় এখন হিমঘরে। তারপরে ঝর্ণিংঘাটে।

— খাসা গ্রান দিয়েছিলেন গণেশবাবু।

— পাওনাটা এখনও সব পাইনি কিন্তু।

— কেলিয়ে যাওয়া ক্লাসকে মাল যাওয়াই দিয়েছেন।

— এই না হলে মাস লিডার। ব্লাক কেউ ধরতেই পারল না।

— আসুন, আমরা এবার সমস্বরে স্লোগান করি। চিয়ার্স।

সব কথার মানে না বুঝলেও বুঝতে পারে বক্তব্যটা কি। হাত পা মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে নকড়ির। এক ছুটে বাড়ি এসে ভয় পেয়ে বসে থাকে। মুখ দেখে কুলমণি কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় না। নিকারাগুয়ার রাতির মত বিড়বিড় করে নকড়ি। — দু'মুখো সাপ, শয়তান, দালাল। ভণ্ড, মিথ্যুক, চোট্টা। এদের চিনব কি করে? পঞ্চাশ বছর ধরে দেশে কি এইসব বিষবৃক্ষই পরপালের মতন তৈরি হয়েছে? এদের উপড়বে কে?

অস্থির পায়চারি করতে করতে রাত গভীর হয়। কাঁধে গামছা ফেলে বেরিয়ে যায় নকড়ি।

ঘামে জবজবে হয়ে ফেরে ভোর রাতে।

ঘুম থেকে টেনে তুলে কুলমণিকে কিসফিস করে বলে, — খুলি, টাট্টি বর্শা উঁচায়ে যুদ্ধ করার হিম্মত আমাদের নাই। তাই জন্য যন্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করলাম। ফুদিরামের বোমা না, নকড়ের বোমা — একটা না, অগুনতি। পঞ্চাশ বছর পর উল্টা উপহার।

কুলমণির চোখ দুটো ভয়ে বড় বড় হয়।

— ভয় নাই, সমস্ত আলুর বস্তা বাবুর বাড়ির চারপাশে ঢেলে দিইছি। লক্ষ লক্ষ মাঠি কাল ভনভনাবে। অত্যাচার করবে। আর গাঁয়ের সব মানুষ জানতে পারলে —

কথা শেষ করে না নকড়ি। একটা চাপা হিংস্রে হাসি ফুলস্ত লাভার মত, ভয়া কোটাল সমুদ্রের জলা ঢেউয়ের মত, তার সারা দেহে আছড়ে পড়ে। □

শারদীয় শুভেচ্ছা অভিনন্দনসহ

দেউলপাড়া ধামাইটিকর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম - দেউলপাড়া * পোঃ - দেবাড়া * জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৮ — এইচ জি

কানাইলাল ধাওড়া	**রঞ্জিতকুমার ঘোষ**	**রবিকান্ত সমন্ত**
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের শীর্ষ প্রতিষ্ঠানরূপে
গ্রামবাংলার উন্নতিতে নিয়োজিত

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ডি, সেক্সপিয়ার সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭

ফোন : ২৪০-১১৩৮, ২৪৭-৭৮৭২ ★ ফ্যাক্স : ২৪৭-৭১২৮

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ উন্নতিতে শুধু কৃষিতেই নয় — কৃষিজ বিভিন্ন শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে কৃষিজ পরিবহণের ক্ষেত্রে ও গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ঋণ আজ অল্প সুদে সহজলভ্য। বর্তমান আর্থিক বছরে ১১৭.২৫ কোটি টাকা ঋণের পরিকল্পনা বিভিন্ন উন্নতিখাতে দেওয়া হচ্ছে। নবতম সংযোজন আমানত গ্রহণ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি হতে — সাথে আছে অধিক সুদের সুবিধা।

প্রতিষ্ঠানের কিছু কথা

১) ১৯৯৮-৯৯ আর্থিক বছরে ঋণদানের লক্ষ্য ১১৭.২৫ কোটি, কৃষিক্ষেত্রে ৬১.৬৭ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে, ৫৬.০৮ কোটি, আবাসন প্রকল্পে ৯.৫০ কোটি।

২) কৃষি, অকৃষি ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে পশ্চিমবাংলায় গত বছরের সর্বমোট লগ্নি ৬৫ কোটি টাকা। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও পরিবহণে গত চার বছরে আমাদের লগ্নি ৫৮ কোটি টাকা।

৩) গ্রামে কিংবা শহরে গৃহ নির্মাণ ঋণ দানে আমরাই অগ্রণী — এখনও পর্যন্ত লগ্নির পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা।

৪) আমরা স্ট্যাম্প ডিউটির জন্য কোন ঋণ দান করি না, কারণ আমাদের ঋণ গ্রহণের জন্য কোন স্ট্যাম্প ডিউটি লাগে না।

৫) সুদের উপর উৎসমূলে আয়কর কাটা হয় না। আয়কর আইনের ১৯৪ ধারা অনুযায়ী ঋণ সমবায় সংস্থা ছাড়া আর কোনও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী আমানতে এই সুযোগ নেই।

ড. প্রত্যুষপ্রসূন ঘোষ	প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য	সরল সেন
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর	*ভাইস-চেয়ারম্যান*	*চেয়ারম্যান*

ক্রীড়া জগৎ

মজার খেলা? না মারণ খেলা!

অজয় বসু

মজার তো বটেই।

সব খেলার মত ফুটবলও মজার। খেলতে মজা, দেখতেও মজা। আবার দেশের কাকে কাকে খেলার দুটো দলের একটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়ারও অনেক মজা। দল সমর্থনের ব্যাপারটা তো ফুটবলের অঙ্গাঙ্গী। কে কখন কাকে এবং কেনই বা সমর্থন জানাবেন, তার যুক্তি তাঁর নিজস্ব। দল সমর্থনে পছন্দ অপছন্দ, অনুরাগ বীতরাগের প্রশ্ন থাকে। আন্তর্জাতিক খেলা হলে সমর্থনের মূলে থাকে স্বদেশী সচেতনতা আর দেশকে জানবার টান।

সবকিছু মিলিয়ে খেলা ফুটবল হল মজার, আনন্দ, উত্তেজনা, অস্থিরতার। পরিস্থিতিবোধ থাকলে দর্শক মনের সুখে খেলা দেখতে পারেন। মনের সুখ মানে চোখের তৃপ্তিও বটে। কিন্তু পরিস্থিতিবোধে টান পড়লেই বিপত্তি। তখন দল সমর্থনের নামে অসুস্থ উদ্দাম মানসিকতার আস্ফালন ঘটে, বাঁধন ছেঁড়ার মাতামাতির আড়ালে এক অবক্ষয়ের চিত্র ওঠে ফুটে।

উত্তেজনা জীবনধর্মের একটি অঙ্গ। কিন্তু উত্তেজনার আধিক্য মারাত্মক। যেমন উত্তেজনা প্রশ্রয় পেতে থাকলে তা জীবন হননের পথে মানুষকে ঠেলে দেয়। দেহু কলসীতে রসের বদলে যেমন ভেঁতো হয়ে যায় তেমনি অতিরিক্ত উত্তেজনার ফলে রসালো অনুভূতির জায়গা দখল করে নেয় হিংস্র, বিষাক্ত উপলব্ধি।

মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়লে স্নায়ুবিধি, স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারিয়ে কোনও কোনও ফুটবল অনুরাগী সাময়িকভাবে কেন পাগল হয়ে যান। কেন এই পাগলামি তা মনস্তত্ত্ববিদদের জানা থাকলেও থাকতে পারে। আমার নেই। আমি শুধু বুঝি যে মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনা হল বিষবৎ পরীক্ষার যা গলায় ঢাললে নিজেরই অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে।

তাঁর উত্তেজনার স্রোতকে ঠেকা এই বিষ পানীয় গলাধঃকরণের পরিণামে কত যে মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তার হিসেব নিকেশ করতে বসলে মনে প্রশ্ন জাগে যে ফুটবল সত্যিই কি মজার খেলা? অবশ্য দোষটা ফুটবলের নয়, দোষ তাঁদের যাঁরা ফুটবল উপভোগ করার ছুতোয় স্রেফ উত্তেজনার আগুনে নিজেদের কপাল পোড়াতে চান।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ষোড়শ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কতজন যে দল সমর্থনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত উত্তেজনার কলসনে আঁচে ঝাঁপ দিয়ে নিজেরাই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছেন তার ঠিক ঠিকানাই নেই।

আত্মহননের সব নজির আমাদের নজরে পড়েনি। তবে দু-চারটি খবরে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে।

কথা যাক, মিরাটের ২৫ বছর বয়স্ক বিধুর কথা। বিধু ছিল আর্জেন্টিনার ভক্ত। আর্জেন্টিনার কারওয়ার্ড ব্যক্তিত্বতা তাঁর কাছে জীবন মিত্রের মত। ব্যক্তিত্বতার ছবি বিধুর ঘরের দেওয়ালে সর্বক্ষণই টাঙানো থাকত। গত ৪ জুলাই টিভিতে বিধু ফ্রান্স বনাম আর্জেন্টিনার খেলা দেখছিলেন। খেলার হারে আর্জেন্টিনা। প্রিয় দল আর্জেন্টিনার হারের দৃশ্য বিধু সহ্য করতে পারেনি। চুপি চুপি ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যান। কোথায় গেলেন বিধু? চারিদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। কিন্তু দিনের দিন তাঁর সন্ধান মিলল না। খোঁজ মিলল পরের দিন। বাড়ির পাশে একটি গাছের ডালে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় বিধুর শব ঝুলছিল। আর্জেন্টিনার হার সইতে পারেননি। তাই স্বেচ্ছায় আত্মহননের পথ নিয়েছেন বেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিধুর সঙ্গে ব্যক্তিত্বতা বা আর্জেন্টিনার রক্তের বা নাড়ির সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু দলপ্রেমের পরিণামে বিধু নিজেকে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন যে আর্জেন্টিনার জন্য শহিদ হতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগেনি।

কোন সূত্রে আর্জেন্টিনা আর কোথায় ভারত উপমহাদেশ। দূরত্ব যোজনগন্ধী হলেও মাত্র দোনামার ক্রীড়াকৃতি ঘিরে দুই উপমহাদেশবাসীর অনেকেই আর্জেন্টিনা প্রেমে মজে গিয়েছিলেন। আর্জেন্টিনাপ্রেমীদের দলে সমবয়সের নানা স্তরের অনুরাগীই ছিলেন। হয়ত এখনও আছেন। এঁদেরই অন্যতম ঢাকা নরসিংহ কলেজের ছাত্রী রহিমা বেগম। ছলাতের হাতে আর্জেন্টিনা হারামাত্রই রহিমা কালবিলম্ব না করে বিষের একটি শিশি নিয়ে ফেলেন। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আশপাশের লোকজন সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় রহিমা বেগম সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে যান। তবে আর্জেন্টিনার হারের পর প্রাণ ধরে রাখতে চাননি ঢাকার কৌড়ি কলেজের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র জিলালুর রহমান এবং কেন্দুয়ার রিয়াজুলও পানির মিঞা। বিষ পানে দুজনেরই মৃত্যু ঘটে যায়। খেলা শেষ হবার পর বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের খালেদা হলে টিভি সেট ও আনুষঙ্গিক আসবাবপত্র ভাঙচুর করা হয়। হাতের কাছে পেলে গোটা হলটাও দলটিকেই বিধ্বংসকারীরা তছনছ করতেন। প্রচণ্ড উত্তেজনা ও গণ্ডগোলে জনাদশেক ছাত্রী খালেদা হলের মধ্যেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। ঢাকার সরকারী হাসপাতালের এক দল ডাক্তারও আর্জেন্টিনা-প্রেমে ছিল নিমগ্ন। তাঁরা রোজা রেখে উপবাস করে আর্জেন্টিনার সাফল্য কামনা করেছিলেন।

শুধু আর্জেন্টিনাই নয়, আরও অনেক দলের সমর্থক-অনুরাগীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন দুনিয়ার নানান প্রান্তে। এমনই একজন হলেন জীবন্তীর কারখানী রাজকুমার বালকার। বয়স নেহাৎ কম নয়, বাহান্ন। তবে বয়স বেশি বলেই বোধহয় টেনশনের চাপটা ছিল বেশি, সে চাপ তিনি সহ্য করতে পারেননি। ব্রাজিল বনাম ডেনমার্কের খেলা দেখছিলেন টিভির সামনে বসে। ব্রাজিল ডেনমার্কের ফুটবলোনোদ গোল করে বসলেন। আর যাবে কোথায়! তখুনিই হৃদরোগ কাঁপিয়ে দিল সমস্ত শরীর। মিনিট দুয়েকের মধ্যে সব শেষ। প্রথমে [illegible]

খেলাও শেষ পর্যন্ত ওই ম্যাচে তাঁর প্রিয় দল ব্রাজিল যে জিতে গেল, এই সত্যটুকু জেনে যাওয়ার ফুরসতও পেলেন না রাজকুমার মালব্যরা। উত্তেজনাদমিত টেনশন একাই নির্বাক ঘটে।

উঁচু দলগুলোর মানুষকে যে কোথায় টেনে নিয়ে যেতে পারে তার নজির দেখা গেছে আউসমর্গে। ১৮-এর ৪ জুলাই বিকেলের মেক্সিকোর ওরিয়েন্টে জার্মানি বনাম মেক্সেরেনিয়ার খেলা ছিল ছাদের নিচেতে মেক্সিকান স্টেডিয়ামে। শক্তিশালী দল হিসেবে জার্মানি পরিচিত। এর আগে বারতিনেক বিশ্বকাপ জয় করেছে। অন্যদিকে মেক্সেরেনিয়া এক উঁচুকো প্রতিযোগী। এই সবে বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বে খেলতে এসেছে। জার্মানিই ফেভারিট। কিন্তু মাঠমাঠে খেলা ঘাটিয়ে দিল উঁচুকো দল মেক্সেরেনিয়াই। তিন তিন গোলে হারাল জার্মানিকে। খবর শুনেই তো আউসমর্গের ওই জার্মান সমর্থকদের চক্ষু চড়কগাছ। কালবিলম্ব না করে সোজসাপ্টা খেলা জানানো গেল মেক্সিকোর মাটিতে বাঁপ। আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। হাত-পা ভাঙল, তবু প্রাণে গেলেন বেঁচে।

প্রায় অনুরূপ এক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন এক ব্রেজিল ভক্তও ১৯৭৮ সালে। সেবার বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলা আর্জেন্টিনায়। ইতালি গোলমালের কারণে হারে ১-২ গোলে। খবরটা শুনে এক ব্রেজিল ভক্ত জাতীয় দলের বিপর্যয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে নিজের হাতের কব্জির শিরাতে দেন ছুরি চালিয়ে। অবশ্যি, নিজের বুকপিঠে ছুরি বসাননি। তাই রক্ষে। হাত কেটে গেলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান সে যাত্রায়।

আত্মহনন বা পরের জীবন হননের কত ঘটনাই যে ঘটে গেছে। ১৯৫০-এ বিশ্বকাপের আসর বসে ব্রাজিলেই। ব্রাজিলই হট্ ফেভারিট। কিন্তু চূড়ান্ত খেলায় উরুগুয়ের ব্রাজিলকে হারানোই এক ব্রাজিলিও সমর্থক মেনে নিতে না পেরে নিজের পিস্তলের গুলিতেই নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেয়। তার প্রিয় দলের এই পরাজয়ের খবর শোনামাত্র এক ব্রাজিলিও সমর্থকের হৃৎকম্পন তখুনি থেমে পড়ে।

শুধু মৃত্যুতেই যবনিকা হওয়াই নয়, আত্মহনে অধীর হয়ে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাতেও ব্রেজিল ব্রাজিলিয়নের জুড়ি নেই। ১৯৭৮-এ আর্জেন্টিনার মাঠে ব্রাজিল দলিল আর্জিনিয়ানদের আর এক প্রতিনিধি প্যারাগুয়েকে হারায় এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। মুসংবাদ শোনাবার ব্রাজিলের রাজধানী ব্রিও ডি জেনেরোর রাজপথে ছুটল এক ঝাঁক ট্রাইজার পিটিয়ারি ছেড়ে আসা জনতা। গলে রাস্তায় কাঁপিয়ে পড়ে আর চলল বাসটি একের পর এক পথচারীকে ধাক্কা দিতে দাঁড়ি। অনিয়ন্ত্রিত ও ছুটন্ত বাসের ধাক্কায় দু'জন পথচারীর প্রাণ যায়, জনাতিরিশ আহত হন। তবে ওই জপকর্মের ধলনায়ক ড্রাইভারটি কিন্তু অক্ষতই থেকে যান। সেবারেই ব্রাজিলের জয়লাভের খবর শুনে আত্মঘাতে আত্মহারা এক ব্রাজিলিও তরুণ ফেরার ও সামনে নিজের শরীরটাকে ছুঁড়ে দেন এক ছুটন্ত ট্রেনের চাকার তলায়। কয় মাথলা সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় ওই তরুণটিও।

অবশ্যই যদের পরাজয়ে দুঃখ, কিন্তু এমনটা দুর্ঘটনা আর যে এক অপকর্ম করেছিল বছর চারেক আগে তার দুঃস্বপ্নে সন্তরের ইতিহাসে কলঙ্কের কালো দাগ এঁকে নিয়ে রেখেছে। বছর চারেক আগে ঘটে যাওয়া সেই অনুকরণে কাণ্ড স্মরণ করলে আজও সুহৃদমাত্রের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চার বছর আগে বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ত পর্বের আসর পড়েছিল আমেরিকায়। সেই আসরে আমেরিকা বনাম কলম্বিয়ার ম্যাচে কলম্বিয়ার তরুণ ফুটবলার আঁদ্রে এসকোবার বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করার চেষ্টায় অতর্কিতে নিজের গোলের মধ্যে বল ঠেলে দেন। বল তিনি ঠেলে দিয়েছিলেন না এসকোবারের পায়ে লেগে গোল হয়েছিল সঠিকভাবে বোঝা না গেলেও গোলটিকে 'আত্মঘাতী' বা 'সুইসাইডাল'-এর পর্যায়ে ফেলা হয়েছিল। আর এই আত্মঘাতী গোলের সূত্রে আলোচ্য ম্যাচে কলম্বিয়া আমেরিকার কাছে হেরেও যায়।

ফুটবল খেলায় আত্মঘাতী গোল তো কতই হয়। ছোট, বড়, সবস্তরের খেলাতেই এই অঘটন ঘটতে পারে এবং ঘটেও। তাই অনিচ্ছাকৃত এই কাজের জন্য কাউকেই তদন্তাধীন কাঠগড়ায় চড়ানো হয় না। সেজন্যই দুর্ঘটনা বলে ব্যাপারটিকে ক্ষমার চোখে দেখাই হয়। কিন্তু এসকোবারের খেলার ব্যাপারটা অন্যরকম ঘটে গেল। কাঠগড়ায় চড়ানো তো দূরস্ত, এসকোবারকে এককোপে মূলে চিরিয়ে দেওয়া হল। সেদেশ ফিরে এসকোবারকে একদিন স্থানীয় এক রেস্টোরেন্টের সামনে ফিরে তার জনকয়েক কলম্বিয়ান সমর্থক আত্মঘাতী গোল করার জন্য গালমন্দ করতে থাকলে এসকোবার যথারীতি প্রতিবাদ করেন এবং দুষ্কৃতির দল সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারের গুলি ছুঁড়ে তাঁকে এসকোবারকে খুন করে ফেলে। খেলা মজায়, আর সেই মজার খেলা ফিরে এ কি মর্মান্তিক কাণ্ড!

খাঁদ্রে এসকোবার না হয় একটা উপলক্ষে পরিণত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মাঠমাঠের কোনো ঘটনা বা দুর্ঘটনার অধিত নয় এমন ব্যক্তিরাও কি ফুটবল ঘিরে উত্তেজিত দুষ্কৃতির হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন? পাচ্ছেন না। গত বার এবারে অর্থাৎ '৯৮-তে ঘটে যাওয়া বুরোনার্স এয়ার্সের ঘটনার কথা। আর্জেন্টিনার অসরকা ঘাতিস্তরা ব্রাজিল ৪-০ গোলে খেলার আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করাতে তাদের প্রচুর আলোড়ন উঠল। দেশের মুখে মুখে উচ্চারিত হতে থাকল ঘাতিস্তরা বা তাদের আদরের 'ঘাতিস্তোরা'-এর প্রশংসা। বুরোনার্স এয়ার্সের রাজপথে কজন বন্ধু ঘাতিস্তরার গোল ও আর্জেন্টিনার জয়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন। এক বন্ধুর বক্তব্য, ঘাতিস্তোরার আরও গোল করা এবং আর্জেন্টিনার পাঁচ গোলে জেতা, আরও বড় ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। অন্য বন্ধুর অভিমত, না, না, পাঁচ গোলই যথেষ্ট। দু পক্ষে সামান্য বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। আর সেই তর্কাতর্কি শুনে রাস্তার পাশের একবাড়ি থেকে এক ব্যক্তি এসে সেই আলোচনায় যোগ দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তেড়েমেড়ে রিভলভার বন্দুকটি গুলিভরা বন্দুকের ট্রিগার টেনে সব বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেয়।

ফুটবলের কল্যাণে ঘিরে কত সমাদর কারণে যে কী মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে যায় তা অবশ্যই অবাক হতে হয়। ১৯১৮-এর প্রসঙ্গে আসরকে কেন্দ্র করে হালনে যা ঘটল তার তো তুলনা মেলা ভার। জার্মানি বনাম মেক্সেরেনিয়ার খেলার জার্মানি জিতবে বলে এক টিনিকলের মালিক তার টিনিকলটিকেই বাজি ধরেছিলেন। কিন্তু মাঠের খেলায় মেক্সেরেনিয়ার কাছে জার্মানি হেরে যেতেই জিন মালিকটি আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার মূল কারণ টিনিকলটি হেরে হওয়া না জার্মানির হার কে জানে। আর এক যুবক জার্মানি-মেক্সেরেনিয়ার ম্যাচ ঘিরে নিজের

মোটর বাইক রাখি ধরেছিলেন। বাকিতে হার হতেই মোটর বাইকের শোকে তিনিও আত্মহননের পথ বেছে নেন। গুলি খেলা, খুন-জখম, আত্মহত্যা ইত্যাদি যেন অতি সাধারণ ব্যাপার। উত্তেজনার মাঝে ভেতরটা সর্বক্ষণই ঝিকিমিকি জ্বলতে থাকে তাদের কাছে গুলি-বন্দুক, বোমা-বারুদ, প্রাণ নেওয়া-নেওয়া যেন কোনো ব্যাপারই নয়। সবই জলভাত সমান!

ফুটবল আসলে এক খেলা। যুদ্ধ নয়। তবে কারণে অকারণে উত্তেজনার টানে খেলার মাঠকে রণভূমিতে পর্যবসিত করার ফুটবলারদের যেমন অভাব ঘটেনি, তেমনি মাঠের খেলা ঘিরে মাঠের বাইরে বারুদ ছড়াতেও লোকের কামাই পড়েনি। মূল্যবোধের বিকৃতি, আদর্শের অবমাননা ঘটিয়ে যখন উত্তেজনার আগুন জ্বালানো হয় মাঠ কিংবা মাঠের বাইরে তখন সম্ভবিত মনে প্রশ্ন জাগে যে ফুটবল কি সত্যিই মজার খেলা? না, মারণ খেলা।

ফুটবল যুদ্ধ, খেলার মাঠ, রণভূমি এইসব শিরে চমকানো শব্দ উঠলেই মনে পড়ে যায় ১৯৭০ সালের হনডুরাস বনাম এল সালভাদোরের ফুটবল ম্যাচের কথা, যে খেলাকে উপলক্ষ করে পাশাপাশি দুটি দেশ এল সালভাদোর ও হনডুরাসের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। যুদ্ধ বাধিয়েছিল যুদ্ধবাজরা, যারা লড়াই বাধাতে বদ্ধপরিকর হয়ে একটি ফুটবল খেলার ফলাফলকে হাতুড়ে হিসেবে ব্যবহার করেছিল। ওই যুদ্ধবাজরা হল এল সালভাদোরের জঙ্গী রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল কিদেল সানচেজ হায়নানদেজ ও তার সঙ্গীসাথীরা।

ব্যাপারটা কি ঘটেছিল বা ঘটানো হয়েছিল সংক্ষেপে তা স্মরণ করা যাক।

হনডুরাস ও এল সালভাদোর পাশাপাশি দুটি দেশ। প্রতিবেশী হলে দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল তিক্ত। অর্থ-সামাজিক অবস্থা, উদ্বাস্তু সমস্যা ইত্যাদি ঘিরে দু'পক্ষের বাদবিসম্বাদ চলেই আসছিল। এমন পরিস্থিতিতে ১৯৭০-এর বিশ্বকাপ ফুটবলের বাছাইপর্বে দু'দেশকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

মধ্য আমেরিকার এক নম্বর সবল গ্রুপ বিজয়ী হনডুরাস। আর তিন নম্বর গ্রুপের শীর্ষস্থানাধিকারী হল এল সালভাদোর। অতঃপর আগত সবল গ্রুপ বিজয়ী নির্ধারণে দু'দলের দুটি খেলা। প্রথম খেলা হয় হনডুরাসের তেগুসিগালপার, জেতে (১-০) হনডুরাস। দ্বিতীয় খেলা এল সালভাদোরে। দ্বিতীয় খেলায় এল সালভাদোর জিতল ৩-০ গোলে।

দু'পক্ষই একটি করে ম্যাচ জেতায় চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তৃতীয় ম্যাচের ব্যবস্থা করা হল নিরপেক্ষ দেশ মেক্সিকোতে। মেক্সিকোর বিখ্যাত স্টেডিয়াম আজটেকে তৃতীয় ম্যাচের ব্যবস্থা হয়। নিরাপত্তার কঠোর ঘেরাটোপের মধ্যে দু'দলের খেলোয়াড়েরা মেজাজ ঘরে রেখেই খেলছিলেন। নির্ধারিত নব্বই মিনিটে খেলার গোল হয়নি। হল অতিরিক্ত সময়ে। অতিরিক্ত সময়ে খেলাটি ঘরে মহিসিও রডরিগস এল সালভাদোরকে জিতিয়ে দেন।

আর যেই না মাঠের খেলার জিৎ অমনি জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে জয়লাভের উদ্দেশ্যে এল সালভাদোরের জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক সানচেজ হায়নানদেজ তার সেনাবাহিনীকে হনডুরাস আক্রমণে হুকুম দিয়ে বসেন মাঠের খেলায় যখন জিৎ হয়েছে তখন জীবনযুদ্ধেও জয় অনিবার্য, এই মানসিকতায় মাতিয়ে হায়নানদেজ যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়।

জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক সানচেজ হায়নানদেজ অনেক দিন ধরে তলে তলে তৈরি হচ্ছিল। পক্ষান্তরে হনডুরাস ছিল যুদ্ধের জন্য নিতান্তই অপ্রস্তুত। হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে হনডুরাস দিশেহারা হয়ে পড়ে। জেনারেল হায়নানদেজের হুকুমে হাজার দশেক সালভাদোরী ফৌজ সীমান্ত পার হয়ে ছুটে যেল হনডুরাসের রাজধানীর দিকে। আকাশে গর্জে উঠল বিমানগুলী কামান। বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করা হল। বেঘোরে প্রাণ দিতে হল হাজার তিনেক হনডুরাসবাসীকে। আর কত হাজার আহত হল ও বাস্তুচ্যুত হল তার ঠিক ঠিকানাই বা কে রাখে! অবস্থা বেগতিক দেখে হনডুরাসের পক্ষ থেকে সাড়ে চারদিনের মাথায় শ্বেত পতাকা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ করা হয়।

সে যুদ্ধ থেমে গেছে। মধ্যআমেরিকাতলে হনডুরাস ও এল সালভাদোর আজও পাশাপাশি অবস্থান করছে। দু'পক্ষ নিজেদের মধ্যে খেলাধুলোতেও অংশ নিচ্ছে। কিন্তু নিছক একটি খেলাকে ঘিরে দু'দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে তোলার অপকীর্তির কথা কেউ ভোলেনি। তাই জঙ্গী রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল কিদেল সানচেজ হায়নানদেজের দুর্নাম সন্ত্রাস ও মানবতা বিরোধী কলাপক হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রসঙ্গে এতক্ষণ ধরে বলার মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করা হল। এরকম কিছু মজার কাহিনীও স্মরণ করা যাক। বিশ্বেই এই ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে অনেক মজার ঘটনাও ঘটেছে, অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্যের মান বাড়াতে সেগুলির ভূমিকাও স্মরণীয়।

সবাই জানে যে পেশাদারি ফুটবলের পত্তিকৃৎ ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ডই হল ফুটবলের জন্মভূমি। ইংল্যান্ড থেকে ফুটবল ছড়িয়েছে দেশ দেশান্তরে। ফুটবলের প্রসার, প্রচার এবং জনপ্রিয়তা অর্জনে ইংল্যান্ডের অবদান সম্পর্কে স্বয়ং ইংল্যান্ড এক সময়ে বেশি মাত্রার সচেতন ছিল। মাত্রাতিরিক্ত সচেতনতার পরিণামে ইংল্যান্ড এক সময় দাঁপা আন্তর্জাতিকতাবোধের শিকারও হয়ে পড়েছিল। ফুলছিল উচ্চন্মন্যতায়। এই অবস্থায় ১৯৩০-এ যখন বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হয় তখন প্রচণ্ড আহ্বানের উদ্ধানিতে ইংল্যান্ড এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়নি। শুধু ১৯৩০-এই নয়, প্রাক্ যুদ্ধপূর্বে তিনটি অনুষ্ঠানের কোনটিতেই ইংল্যান্ড অংশ নেয়নি। ইংল্যান্ডের মনোভাব ছিল অনেকটা এইরকম যে ফুটবল তো আমাদেরই খেলা, অন্যেরা আবার কি খেলবে! আমরা খেললে তবেই প্রতিযোগিতার মর্যাদা বাড়বে, নইলে নয়!

আজকের ইংল্যান্ডের এই আদহযোগিতা সত্ত্বেও বিশ্বকাপ ফুটবলের আকর্ষণ দিকে দিকে প্রসারিত হচ্ছিল, বাড়ছিল প্রতিযোগী সংখ্যাও। বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে যুদ্ধোত্তরকালে ১৯৫০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা পুনরারম্ভ হতে নাক উঁচু ভাব জলাঞ্জলি দিয়ে ইংল্যান্ড আবির্ভূত হয় মূল আসরে। কিন্তু ইংল্যান্ডের আবির্ভাব শুভ হয়নি। উলটে কতকটা অভাবনীয় ও করুণ পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডকে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিতে হয়। সেবার প্রাথমিক লিগ স্তরে তিনটি ম্যাচ খেলে ইংল্যান্ড জেতে মাত্রমাত্র একটিতে, হারে বাকি দুটি খেলায়।

হায় বলে হায়, হায় আমেরিকায় কায়ে! যে আমেরিকায় ফুটবলে পরিচিতি বলতে কিছুই ছিল না তারই কাছে মাথা নোয়াতে হল ফুটবলের কৌলিন্য গর্বে গর্বিত ইংল্যান্ডকে। মান, মর্যাদা, প্রচার আহরণের সবকিছু ধূলিসাৎ

হতে দেখে ইংল্যান্ডের এক জার্নালিস্ট সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, আমাদের হারাতে আমেরিকানদের আসলেই তো শিখিয়েছি — পরিভাষায় 'উই টট্ দেম টু প্লে ফুটবল অ্যাস!' ইংলিশ পত্রিকার এই সংবাদ মন্তব্য সেদিন অন্য মহলে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছিল। প্রবাদটি উঠলে আজও আলোচনাকারীদের ঠোঁটের কোণে ঝলে বেরিয়ে আসে ওঁদের হাসির ঝিলিক।

সেবার অর্থাৎ ১৯৫০-এ আসর বিছানো হয়েছিল ব্রাজিলে। ব্রাজিলই ছিল দুই বেবারিট। চূড়ান্ত খেলা ব্রাজিল-উরুগুয়েতে। রিও ডি জেনেরোর বিশাল মারাকানা স্টেডিয়ামে প্রায় দু'লাখ দর্শকের উপস্থিতিতে খেলা শুরু হতে ব্রাজিল এক গোলে এগিয়ে যায়। মারাকানা তখন আনন্দে উত্তাল। নাচে গানে, বাদ্যি বাজনায়, সহর্ষ জয়ধ্বনিতে মাতোয়ারা। কিন্তু তারপরই পরপর দু'গোল করে উরুগুয়ে ব্রাজিলের মুখের গ্রাস নিল ছিনিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতির অবস্থার হল আমূল পরিবর্তন। যেন ছোঁয়া আনন্দ উল্লাসের বদলে জমাট বাধা অন্ধকার। স্কাদানের শুরুতার ঢাকা পড়ে গেল বিশ্বের বৃহত্তম স্টেডিয়াম মারাকানা।

জাতীয় দলের পরাজয়ে ব্রাজিলিও সংগঠকরা এমনই শোকাহত হয়েছিলেন যে খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণের আয়োজন করতেও তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন। ডি আই পি আসন ছেড়ে নিচে নেমে গিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের (ফিফা) তদানীন্তন সভাপতি মঁসিয়ে জুলে রিমে ব্রাজিলিও কর্মকর্তাদের তাঁদের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তবেই পুরস্কার বিতরণ পর্ব সম্পন্ন হয়। শোনা যায় যে ব্রাজিল জিতবে এবং বিজয় উৎসবে মাততে হবে ভেবে স্থানীয় দর্শকেরা হাজার নকাই স্যাম্পেনের বোতল সঙ্গে করে এনেছিলেন স্টেডিয়ামে। কিন্তু খেলা শেষে সেগুলি অবিকৃত অবস্থাতেই পড়ে থাকে। একটি বোতলেরও ছিপি খোলার কেউই উৎসাহ বোধ করেননি। আমেরিকার কাছে হেরে যেতে যেমন ইংল্যান্ডে তেমনি উরুগুয়ের হাতে হারাতে ব্রাজিলেও সেবার জাতীয় শোকপর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

১৯৫০-এর আসরে গ্রুপ লিগে ইংল্যান্ডের কাছে আমেরিকার হার ছিল প্রত্যাশিত। অনেকের ধারণায় সেই পরাজয় ছিল সম্ভাব্য নিশ্চিত ঘটনা। কিন্তু মাঠের খেলায় সেই নিশ্চিত ঘটনা অনিশ্চিত। এমন অনিশ্চিত ঘটনা ঘটার ট্রাডিশনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে পরের প্রতিযোগিতা উপলক্ষেও।

পরের আসর পাতা হয় ১৯৫৪ সালে সুইজারল্যান্ডে। সেবারের দুই বেবারিট ছিল হাঙ্গেরি। পাঁচের দশকের গোড়ায় পর্বে ফুটবলে হাঙ্গেরির উত্থান বিস্ময়কর। পুসকাস, কক্সিস, হিদেকুটি, বোজিক প্রমুখ দক্ষ খেলোয়াড় সমৃদ্ধ হাঙ্গেরিও দলের শক্তি তখন অপরিসীম। সম্ভাবনাও বিপুল। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪-র বিশ্বকাপের ফাইনালের অন্তর্বর্তীকালে কোনো ম্যাচে হাঙ্গেরিকে হারতে হয়নি। প্রায় সর্বত্রই জয়জয়কার।

সুইজারল্যান্ডে এসে হাঙ্গেরি গ্রুপ লিগে খেলা শুরু করে কোরিয়াকে ৯-০ গোলে, পশ্চিম জার্মানিকে ৮-৩ গোলে হারায়। অতঃপর কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিলকে হারায় ৪-২ গোলে। সেমিফাইনালে উরুগুয়েকে ৪-২ গোলে। অতঃপর ফাইনালে মুখোমুখি পশ্চিম জার্মানির। ওই জার্মানিকে হাঙ্গেরি গ্রুপ লিগে হারিয়েছে ৮-৩ গোলে। কিন্তু ফাইনালে অঙ্কের ছক্কা দল পশ্চিম জার্মানিই জিতে গেল ৩-২ গোলে।

এই অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পরিণামে পর্দার আড়ালে বেশ কয়েকটি বিয়োগান্ত দৃশ্যাভিনয় হয়েছিল। জাতীয় দলের জয় অবশ্যম্ভাবী জেনে হাঙ্গেরিতে দলের খেলোয়াড়দের প্রতিমূর্তি গড়া হয়েছিল, ফাইনালের পর সেগুলি হাঙ্গেরির রাজপথে স্থাপন করার জন্য। কিন্তু ফাইনালে হাঙ্গেরির হার হতেই প্রতিমূর্তিগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে চালান করে দেওয়া হয়। বিশ্বকাপ জেতার পর বিজয়ী দলের ফুটবলাররা সস্ত্রীক নানা জায়গা ঘুরে ছুটি কাটাবেন বলে স্থির ছিল। ফাইনালের আগেই শ্রীঘরবাসীরা অনুষ্ঠান কেন্দ্র সুইজারল্যান্ডে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ফাইনালে হাঙ্গেরি হেরে যেতে তাঁদের অবসর বেড়াবার পরিকল্পনা বাতিল করে ফেরার জন্য মুহূর্তে মুহূর্তে স্বদেশের পথে কিস্তি পাড়ি জমাতে হয়।

খেলা শেষের বাঁশি বাজার আগে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যে খেলার কারও কম নয় তার প্রমাণ শুধু ১৯৫৪-তেই নয়, ১৯৭৪-এও পাওয়া গিয়েছিল।

সুদূরের পশ্চিম জার্মানিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসর পাতার সময় থেকেই বিশ্বাস ছিল হল্যান্ডের অনুকূলে। নকআউট পদ্ধতি 'টোটাল ফুটবল'-এ অভ্যস্ত হল্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বি তখন অকল্পনীয়। হল্যান্ডই চ্যাম্পিয়ন হবে এই ভবিষ্যতে সেদিন প্রায় সবাই সোচ্চার।

এই পরিস্থিতিতে ফাইনাল খেলা পশ্চিম জার্মানি বনাম হল্যান্ডের। ফাইনাল শুরু হওয়া মাত্রই হল্যান্ড এক গোলে গেল এগিয়ে। বিপক্ষের খেলোয়াড়েরা বল স্পর্শ করার আগেই পেনাল্টি এবং পেনাল্টি সটে হল্যান্ডের নিসকেন্সের গোল। কিন্তু আরও আছেই, শেষ নয়। শেষ যখন হল তখন জিৎ হল জার্মানিরই, ২-১ গোলে।

পশ্চিম জার্মানির পৌষমাস, আর হল্যান্ডের সর্বনাশ। হল্যান্ড জিতবেই এই ধারণায় ওলন্দাজ ডাকবিভাগ হল্যান্ডের ফুটবলারদের প্রতিমূর্তি সম্বলিত স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিল। স্মারক ডাকটিকিট ছাপাও হয়ে গিয়েছিল। শুধু বাজারে ছাড়া হয়নি। ফাইনালের পর স্মারক ডাকটিকিটগুলি বস্তাবন্দী করে লুকিয়ে ফেলা হয়।

বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে এক দলের পক্ষে সহোদরদের খেলতে দেখা নতুন কোনো নজির নয়। যেমন ব্রাজিলে খেলেছেন ডেনমার্কের লাউড্রুপ ভাইয়েরা, মাইকেল ও ব্রায়ান। এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে। যথা ১৯৫৪-তে বিশ্বকাপ বিজয়ী পশ্চিম জার্মান দলে ছিলেন ওয়াল্টার ভাইয়েরা ফ্রিজ ও ওটমার, ১৯৬৬-তে চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের পক্ষে চারটিন ভাইয়েরা ববি ও জ্যাকি। তবে এক দলে তিন ভাইকে দেখতে পাওয়ার অভিজ্ঞতা আগে হয়নি, হল এই ১৯৯৮ সালে। '৯৮-তে ব্রাজিল নরওয়ের পক্ষে হাজির ছিলেন সহোদর ভাইরে ও জনিন ফ্রো এবং তাঁদের জ্ঞাতি ভাই হাকার্ড ফ্রোও। আরও মজার কাণ্ড ঘটেছিল ১৯৫৮ সালে সুইডেনে। সেবার একটি ম্যাচে দু'পক্ষেই খেলেছিলেন জোড়ায় জোড়ায় সহোদরেরা। রাশিয়ার পক্ষে ভিক্টর ও আলেকজান্ডার ইভানভ এবং বিপক্ষ অস্ট্রিয়ার তরফে গিতচীর ও এমিল কস্তাদিনেক।

আচ্ছা, বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে কি কোনোদিন কোনো পক্ষে সমস্ত ভাইয়েদের খেলতে দেখা গেছে? হ্যাঁ, তাও দেখা গেছে। ১৯৯০-এ ইতালিতে মিসরের পক্ষে মাঠে

হাজির ছিলেন যখন ভাই হোসাম হাসান-ইব্রাহিম হাসানেরা।

দল হারলে বিপর্যয়ের দায় অনেক সময় দলের কোচের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই কোচদের চাকরি চলে যায়। যেমন গেল কার্লোস এলবার্টো পেরেরার। পেরেরা এবার ১৯৯৮-তে সৌদি আরবের কোচ ছিলেন। ফ্রান্সে সৌদি আরব সুবিধা করতে পারেনি। ডেন মিগে হারে দুটিতে এবং বাকি একটি ম্যাচ ২-২ গোলে অমীমাংসিত রাখে। দলের ভূমিকা ভাল নয়। তাই সব দোষ চাপানো হল কোচ পেরেরার ওপর। প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার আগেই পেরেরাকে কোচের পদ থেকে সরিয়েও দেওয়া হয়।

দলের অনুজ্জ্বল ভূমিকার জন্য দায়ী কেন শুধু কোচই। যত দোষ নন্দ ঘোষ-এরই বুঝি!

অথচ পেরেরা হলেন এক বিশ্ববিজ্ঞত ফুটবল কোচ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ব্রাজিল ভাগ চল্লিশ বছর পরে ১৯৯৪-তে আবার বিশ্বকাপ জয় করেছিল।

কার্লোস আলবার্টো পেরেরার কপাল অনেকটা স্বদেশীয় কোচ ভিসেন্টি ফিওলার মত। কোচ ফিওলার তত্ত্বাবধানে ব্রাজিল আগেই বিশ্বকাপ জয় করেছিল। তখন ফিওলার প্রশংসায় গোটা ব্রাজিল হয়েছিল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু যেবার ব্রাজিল বিশ্বকাপে হেরে গেল সেবার জনরোষের কোপ গিয়ে পড়ল দলের কোচ ফিওলার ঘাড়ে। ফিওলার পূর্ব কীর্তি, কৃতিত্ব সব ভুলে গিয়ে ব্রাজিলের উগ্র সমর্থকরা রিও ডি জেনেরোর রাজপথে একটি ফাঁসির মঞ্চ বানিয়ে বাধল কোচ ফিওলার উদ্দেশ্যে। দেশে ফিরলেই ফিওলাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার মতলবে।

ষোড়শ বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে ব্রাজিলের কোচ ছিলেন মারিও জাগালো। জাগালো এক সময়ে বিশ্বকাপজয়ী ব্রাজিল দলের খেলোয়াড় ছিলেন। পরে ১৯৭০-এ তাঁরই কোচিংয়ে থেকে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয় করে। ফ্রান্সে ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। পূর্বজিত সাফল্য ভুলে ব্রাজিলিও সাংবাদিকেরা তাই কোচের কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করে জাগালোকে তুলোধোনা করে ছেড়েছেন তবে জাগালোকে ফিওলার মত ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার মতলব কেউ ভাঁজেনি। যদিও টুর্নামেন্ট ফ্রান্স থেকে দেশে ফেরার পর জনরোষের মুখে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের কোনো প্রতিক্রিয়া বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়নি। উল্টে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জাতীয় দলের সদস্যদের নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে আপ্যায়ন করেছেন।

ব্রাজিলের ফুটবল অনুরাগীদের মানসিকতার কি পরিবর্তন ঘটেছে? ঘটে না, পরিস্থিতি তো তাদের দিকেই যাচ্ছে।

যেমন বড় তিথি পেলেই আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না। আদর্শ মানুষের চাই এমন অন্তঃকরণ — যা কখনো কঠিন হবে না, চাই এমন প্রকৃতি — যা কখনো বিরক্ত হবে না। চাই এমন স্পর্শ — যা কখনো বাধা দেবে না।

— রঙ্গ দুমি

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

কেশবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ২৫ এইচ জি তাং ১৮-১২-৬৬

গ্রাম ও পোঃ — কেশবপুর ; ব্লক আরামবাগ

জেলা ঃ হুগলি

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, সার ব্যবসা, ভোগ ঋণ, ফসল বন্ধকি, আমানত ব্যবসা ও স্বল্প সঞ্চয়ের উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

অশোক বসু
সভাপতি

সুবলচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

নিমাইলাল বসু
ম্যানেজার

[illegible]

মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

সরজুপ্রসাদ রোড, মালদা

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যুগলবন্দী মালদা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক

কর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা, পরিচালন সমিতির নৈপুণ্যে মালদা জেলা সমবায় ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

গত বৎসরের এই ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করেছে এবং এই বৎসর "নাবার্ড" কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে।

আর্থিক চিত্র

বৎসর	অংশগত মূলধন	কার্যকরী মূলধন	ঋণদান	নিট লাভ	পুঞ্জীকৃত লাভ
১৯৯৫-৯৬	১৩৮.৮৬	২৮৯৮.৭১	১১০১.০৩	৪২.২৩	৬২.৬৫
১৯৯৬-৯৭	১৪৪.১২	৩৩৬৮.৬৮	১৬৬৫.২৯	৮৫.৭১	১০৬.৫২
১৯৯৭-৯৮	১৬৩.১৬	৪৩৮৪.৬৮	২০৮৬.১০	৯০.১৪	১৭০.০৫

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের তুলনায় আমাদের ব্যাঙ্ক আমানতের উপর .৫% সুদ বেশি দেয়। গিফ্‌ট চেক ও গোল্ডেন ফিক্সড্ ডিপোজিট-এর ব্যবস্থা আছে।

আনন্দ ব্যানার্জি
সভাপতি

জগদীশপ্রসাদ যাদব
মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক

✆ Suri 55-445, STD 03462 ✆ Bol. 53-773, STD 03463

BIRBHUM COOPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT BANK LTD.

P.O. Suri, Dist. - Birbhum (W.B.)
***Branch* : Bolpur, Birbhum**

The Birbhum Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd. formed way back in 1934, is the oldest ARDB in the State. It is one of the most important Banks in the district of Birbhum, esp. in the long term credit sector. The major activity of this Bank is to provide long term credit to individuals in Farm, Non-farm and Housing Sectors. Recent years have witnessed considerable diversification in the activities of this Bank in areas such as non-farm lending, deposit mobilisation and advancement of loans for purchase of consumer durables like Scooters, TV, Refrigerator, Washing Machine, etc. Loans are available against pledge of NSC, KVP and Fixed Deposits. Other relevant details in respect of this Bank are as follows :—

1.	**Area of Operation**	Eleven (11) blocks of Suri Sadar and Bolpur Sub-division in Birbhum District.
2.	**No. of Units**	2 (1 Head Office at Suri, 1 Branch at Bolpur)
3.	**Membership Strength**	8060 (upto 31.3.98).
4.	**Share Capital**	Rs. 58.21 lakhs, of which State Share Rs. 12.09 lakhs (as on 31.3.98).
5.	**Working Capital**	Rs. 835.97 lakhs
6.	**Recovery Percentage**	79% (as on 30.6.98)
7.	**Investment (loan issue)**	Rs. 171 lakhs. (during 1997-98)
8.	**Deposits Mobilised**	Rs. 55.51 lakhs (upto 31.3.98)

FOR MORE DETAILS, PLEASE CONTACT

G. S. BANERJEE
Chairman

P. BASU
Chief Executive Officer

With Best Compliments From :

THE BANK EMPLOYEES' CO-OPERATIVE BANK LTD.

Regd. No. 5, Calcutta of 1947

Regd. Office : 23A, Netaji Subhash Road (3rd & 4th Floor), Calcutta-700 001

Phone : 220-8564/221-1710

LIST OF MEMBERS OF BOARD

[illegible]	[illegible]	[illegible]
Chairman	*Vice-Chairman*	*Secretary*
Oriental Bank of India	UCO Bank	The Bank Employees' Coop. Bank Ltd.

DIRECTORS

Sri Barun Chatterjee	United Bank of India
Sri Barun Kishore Sarbadhikary	Central Bank of India
Sri Jyotirmay Chakraborty	Bank of India
Sri Kshitish Chandra Poddar	Bank of India
Sri Nemai Prasad Bhattacharjee	Syndicate Bank
Sri Paramananda Adhikari	Bank of Baroda
Sri Ratan Krishna Roy	Central Bank of India
Sri Shibapada Bhattacharjee	UCO Bank
Sri Shyamal Kumar Das	Punjab National Bank
Sri Tripur Roy	Allahabad Bank
Sri Arun Kumar Kar (Representative of Workmen)	The Bank Employees' Cooperative Bank Ltd.

BANK'S PERFORMANCE

(Figures in Thousand)

Year	Owned Capital	Borrowed Capital	Loans	Bank Deposit	Gross Profit	Net Profit	Name of Secretary	Name of Chairman
1988-89	8844	51963	40822	16478	5952	634	Sri G. C. De	Sri Barun Chatterjee
1989-90	9717	57185	48363	14809	7457	705	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1990-91	10788	68766	54854	22234	8894	957	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1991-92	11439	74696	64887	17119	8408	1037	Sri S. K. Ghosh	Sri P. K. Ganguly
1992-93	123376	86151	74983	19929	13207	1733	Sri S. K. Ghosh	Sri Barun Chatterjee
1993-94	13052	98702	81694	30373	14177	1680	Sri S. K. Ghosh	Sri Barun Chatterjee
1994-95	14567	108916	92549	26640	15648	1887	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1995-96	15690	127693	104903	34747 PSU Bond 1000	17220	2516	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1996-97	18512	150513	166500	36800 PSU Bond 1000	20135	2557	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee
1997-98	21494	182968	145998	46780 PSU Bond 3180	24043	2668	Sri S. K. Ghosh	Sri Subir Mukherjee

প্রবন্ধ

সারস্বত নদীয়ায় সমবায় লক্ষ্মীর আরাধনা

অসীম রায়

নদীয়া জেলা প্রশাসনের প্রধান কার্যালয় কৃষ্ণনগর লিখেছিলাম ৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। তার আগের দিন বৃহস্পতিবার অনির্দিষ্টকাল ট্রেন চলাচলের প্রতিবাদে নিত্যযাত্রীরা সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টার ওপর রেল অবরোধ করে রাখেন। পরের দিন অবশ্যই ট্রেন চলেছিল। সারা নদীয়া জেলা চলেনি। জেলার সাহেবেরা কৃষ্ণনগরেও চলেনি। গত ১লা ডিসেম্বর (১৯৯৭) বিধায়কের জেলাশাবাদের গাফলতির বাথে গ্রামে রবীন্দ্র সেনার ৬১ জনকে নৃশংসে গণহত্যার প্রতিবাদে নকশালদের ডাকা বন্ধ-এ সারা নদীয়া জেলার সাথে কৃষ্ণনগরও থেমেছিল। ১১ জানুয়ারির দৈনিকগুলি খবর দিল, ৯ জানুয়ারি অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর বাথের গণহত্যার ৪০ দিনের মাথায় ৯ জনকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে নকশালরা আত্মগোপনে চলে গিয়েছে। সমবায়ের সুস্থ সাগরের পাড়ে বসে আর কতদিন আমরা এরকম হলাহল পান করে শুধুই প্রেতনৃত্য করে যাব কে জানে। যাই হোক, আমার ছাত্রজীবনের আলাম সংবাদ যথারীতি পৌঁছলেও ঐদিন আর নদীয়া জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক খুলে রাখার উপায় ছিল না।

ডাক কোর্টের সামনে ব্যাঙ্কের কোলাপসিবল গেটে তালা দেখে বুঝলাম — হয় আমায় ফিরতে হবে আর না হয় থাকতে হবে। কিন্তু কোথায় থাকব? ভেতরের দুচোখ ভরে তাকালাম। শুধু একটি মুখ দেখতে পেলাম। সে সন্তু, তার নাম সন্তোষনারায়ণ ঘোষ। আমরা অর্থাৎ আমি, রঞ্জিৎ ও কয়েক আর কয়েকজন তাকে মনিরুল মুখোপাধ্যায়ের (পাকড়ে) সৃষ্ট 'চৌরশী'র 'শান্টা ঘোষ' বলে ডাকতাম। সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থানের ওরও আগে প্রথমে বেলডাঙ্গার আরপাশ মেদিনীপুর ও কৃষ্ণনগরে মোট পাঁচ বছর সমবায় বিষয় নির্দেশকের একক দায়িত্বে ছিলাম। মেদিনীপুরের ছোটবাজারে মহাজনরা হোটেলে নদীয়ার ছেলেটির ছেলে রঞ্জিৎ ঘোষের সাথে এক ঘরেই থাকতাম। সন্তুর সাথে আলাপের সূত্রটা ওর কাছ থেকেই কৃষ্ণনগরে এনেছিলাম। ঐ পাঁচ বছরের পরিণিতে আকাশতরা সূর্য-তারার আলোয় কৃষ্ণচূড়ার আগুনে রোমাঞ্চ লাগতো। আমার পৃথিবী তখন আর আর ছোট ছোট ঘুরছে। জীবনের মুখগুলি একটু একটু করে চিনতে পারছি। সোনার পৃথিবীতে তখন নতুন নতুন রঙ দেখতাম। নীল আকাশের গায়ে ভালবাসা খুঁজে পেতাম। জীবন নিয়ে তখন আমার অনেক স্বপ্ন। সমবায় নিয়ে তখন ছিলাম সীমাহীন প্রত্যাশায়। মেদিনীপুরে মানবিক সম্পর্কের অনেক ঝাঁঝর ছিঁড়ে সেই ১৯৬৩ সালে কৃষ্ণনগরে এলাম। সন্তুর সাথে আলাপ তখনই। আলাপ থেকে আড্ডাভোলা মানুষটির সাথে বন্ধুর সড়ে উঠতে বেশি সময় লাগেনি। ও তখন কৃষ্ণনগরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্প দপ্তরে চাকরি করছে।

বন্ধুত্বের সূত্রে ৫ ডিসেম্বর (১৯৯৭) দুপুর ২-৩০ নাগাদ যখন কলিংবেলের মিষ্টি ঝঙ্কারটা বাজছিল তখনো ও জানে না আমি এসেছি। আমার আসা ও থাকার জন্যে সন্তু-জায়া দীপালিও কম্বুকে কন্যাদান জানালো। সন্তু-দীপালির তনয়া মৌ বাংলায় এম-এ পাশ করে বি-এড করেছে। গুপ্তধন সূত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিজস্বতার সন্ধানী সুরে তুললেও তার হাতে তৈরী নিরামিষ কিন্তু রসনা তৃপ্ত করেনি। তবে প্রথম প্রয়াস হিসাবে সাফল্য আশার করতে ছাড়ল না। ইতিমধ্যে আরতিকে নিয়ে রঞ্জিৎ এল, তাদের একমাত্র মেয়ে নিবেদীও সঙ্গে এল। মেদিনীপুরের পাট চুকিয়ে নদীয়ার এসেছে অনেককাল। এখন কৃষ্ণনগরেই বাড়ি করেছে। কিছুদিন আগে জেলা পরিষদের পদ থেকে অবসর নিয়েছে। মেয়ে নিবেদী ফুলপ্রিতে অনার্স সহ স্নাতক হয়ে বি-এড করেছে। জেলাসদর আরতি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছে। আর স্ত্রীমতী ঘোষ তার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে।

ওদের একমাত্র পুত্র কলকাতায় ওকালতি পড়ছে। অবসরপ্রাপ্ত সন্তু এখন পুরোমাত্রার গৃহী। ঘুকে পেসমেকার নিলেও এখনও খুব তৎপর। রাত্রে এক সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া হল। অনেক পুরনো স্মৃতি অতীত থেকে উঠে এল। ঘোষ-বোস যুগলের বিয়েতেই আমি কলকাতায় হাজির ছিলাম। ওভারব্রের সন্তায় নানান পক্ষের মাঝে কিছু কিছু হারানোর ব্যথা মাঝেমধ্যে আমাদের মনকে ভূতাতার দিকে নিয়ে গেলেও সব মিলিয়ে রাত্রিটা ভালই কেটেছিল। ঐদিন আমার নির্ধারিত কাজ না হওয়ায় জন্য মানসিক অবসাদ কখন চলে গেছে টেরই পেলাম না।

পরের দিন ৬ ডিসেম্বর। নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের ঘরে সোজাসুজি ঢুকে গেলাম। ডেপুটি রেজিস্ট্রার সজল ঘোষ এখন ঐ পদে। ওঁর নাম আগেও শুনেছিলাম। প্রথম আলাপেই বুঝলাম মানুষটি বেশ কাজের। কিছু পরে ব্যাঙ্কের সভাপতি আশু ঘোষ এলেন। তাঁর কথাবার্তায় এগিয়ে চলার একটা দৃঢ়তার ছাপ ছিল। ১৯৬৬ সালে কৃষ্ণনগর বৃহদায়তন কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে সমবায় আন্দোলনে তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তিনি এখন এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সরকার মনোনীত সদস্য হিসাবে সভাপতি। এক সময়ে কৃষ্ণনগর থানার স্বর্ণঘালি পাইকপাড়া বিবেকানন্দ হাইস্কুলে শিক্ষক ছিলেন। শিক্ষকের সহজাত আদর্শবাদ এখন সমবায় আন্দোলনকে আরও পরিশীলিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। জেলার সমবায় আন্দোলন ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কটির অগ্রগতি বর্তমান মূলত এই দুজনই সারাক্ষণ সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। ব্যাঙ্কের ডেভেলপমেন্ট অফিসার রঘুনাথ সেন ও ডেপুটি ম্যানেজার প্রশান্ত তরফদার মাঝে মধ্যে প্রসঙ্গিক তথ্য দিয়ে আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করছিলেন।

বর্তমানে নদীয়া জেলার আয়তন ৩৯২৭ কিমি। তার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ জেলা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ২৪ পরগনা, পশ্চিমে বর্ধমান ও হুগলি, আর পূর্বদিক জুড়ে বাংলাদেশ। নদীয়া জেলার ১৭টি ব্লকের মধ্যে ২৩৪ কিমি দৈর্ঘ্য বাংলাদেশ সীমান্তেই আছে ৭টি ব্লক। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে এই জেলার জনসংখ্যা ৩৮ লক্ষ ৫১ হাজার

৯৭ জন। সীমান্ত এলাকার ৭টি ব্লকে নদীয়ার জনসংখ্যার ৩৮ শতাংশ মানুষ বসবাস করে। স্বাধীনতার আগে নদীয়ার মহকুমা ছিল পাঁচটি। সেগুলি হল কৃষ্ণনগর সদর, রাণাঘাট, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া। ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার কালে নদীয়া ভাগ হয়। উত্তরাংশ তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সঙ্গে যুক্ত হয়। দক্ষিণাংশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হয়। এখনকার মত স্বাধীনতার আগেও জেলাসদর ছিল কৃষ্ণনগর। চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া এই মহকুমা তিনটি এখন বাংলাদেশে। অন্য কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় এখন মহকুমার সংখ্যা চারটি হলেও স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ছিল মাত্র দুটি কৃষ্ণনগর সদর ও রাণাঘাট। পরবর্তীকালে কৃষ্ণনগর সদর থেকে সৃষ্টি হল তেহট্ট মহকুমা আর রাণাঘাট থেকে নতুন মহকুমা হল কল্যাণী।

একাধিক মনীষী নদীয়ার মাটিতে জন্ম নিয়েছেন। তাঁদের সকলের উল্লেখ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। অল্প কয়েকজনের সময়ানুক্রমিক উল্লেখ এখানে করছি। প্রথমেই বলতে হয় কৃত্তিবাস ওঝার (১৩৯৯-১৪৬৩) কথা। ফুলিয়ায় তাঁর জন্ম। কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যে জনপ্রিয় গ্রন্থ প্রচলিত সেটি শ্রীরামপুরের ব্রিস্টীয় যাজকগণ প্রথম (১৮০২-০৩) মুদ্রিত করেন। যুগ যুগ ধরে তাঁর অনুদিত রামায়ণই বাংলার ঘরে ঘরে রামের কাহিনী প্রচার করছে। এই হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে চিরকালের জন্যে স্থান করে নিয়েছেন। নদীয়া শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩) পবিত্র আবির্ভাবভূমি। পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের আদি নিবাস ছিল শ্রীহট্ট। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক এই মহাপুরুষ নিমাই, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংক্ষেপে চৈতন্যদেব প্রভৃতি নামে পরিচিত হলেও তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর। নবদ্বীপে উপনয়নের পর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ, কাব্য ও অলঙ্কার পাঠ করেন। অল্পবয়সে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে মাত্র ১৬ বছর বয়সে অধ্যাপনা শুরু করেন। নবদ্বীপে অদ্বৈত আচার্য, যবন হরিদাস, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রমুখের চেষ্টায় এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। তাঁদের ভক্তি বিহ্বলতায় আকৃষ্ট হয়ে অধ্যাপনা ছেড়ে সংকীর্তনে মনোনিবেশ করেন। বিশেষভাবে পরিচিত 'সংবাদ প্রভাকর' (প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। পৈতৃক নিবাস ছিল নদীয়ার কাঞ্চনপল্লী। বাস করেছেন নদীয়ার বাইরে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে তাঁর নাম অনিবার্য। তিনি শুধু লেখক-সাংবাদিকই ছিলেন না, তিনি ভবিষ্যতের অনেক সাহিত্যিককে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর প্রধান দুই ভবিষ্যৎ হচ্ছেন দীনবন্ধু মিত্র ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন। সে যুগের কোন লোক খ্যাতি এবং প্রতাপের শিখরে থাকলেও গুপ্তকবির বিদ্রূপ থেকে রেহাই পাননি।

আর একটি উজ্জ্বল নাম রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩-১৮৯৮)। কৃষ্ণনগরে তাঁদের বাসভূমি। কলেজ জীবনে ডিরোজিওর সংস্পর্শে আসেন ও ডিরোজিও-শিষ্যমণ্ডলীর 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের অন্যতমরূপে পরিচিত হন। বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষক আর নানান কুসংস্কার ও জাতিভেদের প্রবল বিরোধী ছিলেন। 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রকাশে তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ও 'জ্ঞানান্বেষণ' সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ও সম্পাদক ছিলেন। একজন কৃতকর্মা শিক্ষক হিসাবে তাঁকে "Arnold of Bengal" বলা হত। কলকাতার অনুষ্ঠিত 'ন্যাশনাল কনফারেন্স'-এর প্রথম সভায় (২৮-১২-১৮৮৩) তিনি সভাপতিত্ব করেন। নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত কৃষক সাধারণের সংগ্রামের কাহিনী নদীয়ার আর এক সুসন্তান দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) 'নীলদর্পণ'-এ বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর জন্ম নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়ার গ্রামে। তখন যশোহর নদীয়া ভুক্ত ছিল। পিতৃদত্ত নাম ছিল গঙ্গাচরণ। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে শিক্ষা শুরু করে দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণনগরে বসে লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকটির ইংরাজি অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। পাদরি লং সাহেব তা প্রকাশ করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নাটকটির অভিনয় দেখতে এসে বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) মঞ্চে ঘুষো ছুঁড়ে মারেন। সেটাই অভিনেতা পুরস্কার হিসাবে মাথায় তুলে নেন। নাটকটিকে বঙ্কিমচন্দ্র 'অপেরা টমস্ কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করে ইংরাজিতে এম.এ পাশ করেন। ছাত্র জীবনে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' ১৮৮২-তে প্রকাশিত হয়। সরকারি বৃত্তি নিয়ে বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখতে যান। সেখানে পাশ্চাত্য সঙ্গীত শেখেন ও "Lyrics of Ind" নামে ইংরাজি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। চাকরি জীবনে কখনও সেটেলমেন্ট অফিসার, কখনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কখনও আবগারি বিভাগের প্রথম পরিদর্শক, কখনও বা স্ট্যাম্প রেকর্ডস অ্যান্ড এস্টাব্লিশমেন্ট বিভাগে সহকারি ডিরেক্টর রূপে কাজ করেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ প্রায় ১২টি, নাটক প্রায় ১৬টি। অধুনালুপ্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশ আক্ষরিক অর্থে তাঁর শেষ কীর্তি, কেননা প্রথম সংখ্যা প্রকাশের আগেই তিনি মারা যান। যাযাবরীনও নদীয়ার মানুষ। আসল নাম বতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫)। বাংলা সাময়িকের সেরা হিসাবে কাজ করার সময় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ায় একবার ছেয়া হাতে একটি বাঘ মারেন বলে 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হন। অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৭৭-১৯০০) সংস্পর্শে এসে বৈপ্লবিক কাজে উদ্বুদ্ধ হন। সর্বজনবিদিত বৈপ্লবিক দলগুলির যোগসাজসে জাপান ও জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। স্থির হয় যতীন্দ্রনাথ জার্মান জাহাজ 'মেভরিক' থেকে অস্ত্র নিয়ে বালেশ্বর উপকূলে অধিকার করে ইংরেজ সৈন্যদের কলিকাতা যাবার পথ বন্ধ করবেন। কিন্তু পুলিশ সমস্ত পরিকল্পনা জানতে পেরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বিরাট বাহিনী নিয়ে যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর চারজন অনুচরকে ঘেরাও করে ফেলে। বুড়িবালামের তীরের এই যুদ্ধটি ইতিহাসে এখনও 'কোপতিপোদার যুদ্ধ' নামে বিখ্যাত। এই বিপ্লবীর মৃত্যুর সময় কলিকাতার দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট অকপট মনকে তাঁকে সম্মান জানিয়েছিলেন।

নদীয়ার শান্তিপুরের নিকটবর্তী বাগআঁচড়ার বিশিষ্ট অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরীর (১৮৯৫-১৯৭৩) বাড়ি। আসল নাম চারুভূষণ। বালে

গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াশুনা করেন। বিদ্যের বয়সে-বিদ্যেসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবর্তমানে পড়া ছেড়েছেন। মঞ্চে কখনোও বেশি নাটকে অভিনয় করেন। প্রায় শতাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। ১৯৫৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমির সভাপতি ছিলেন। পরে তাঁর পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি তাঁকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত অধ্যাপকরূপে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭২ সালে নাট্য শতবার্ষিকীতে তিনি সেরা থিয়েটার প্রবন্ধ পদক লাভ করেন। কৃষ্ণনগরের দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর পুত্র দিলীপকুমার রায়ও (১৮৯৭-১৯৮০) ছিলেন প্রখ্যাত কবি, গায়ক, সুরকার ও লেখক। ১৯১৮ সালে অক্সফোর্ডে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ বি.এ পাস করার পর ইংল্যান্ডের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্সফোর্ডে ট্রাইপোসের প্রথম ভাগ ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রথম ভাগ পাস করে জার্মান ও ইতালীয় সঙ্গীত শিখতে বার্লিন যান। তাঁর রেকর্ড করা গানের সংখ্যা প্রায় একশ। প্রায় ১৫খানি গ্রন্থের তিনি ছিলেন গৌরবিত গ্রন্থকার। ১৯৩৮ সালে সরকারের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের পাঠ্যসূচির জন্য তিনি 'গীতসূত্রসার' ও 'সঙ্গীতিকী' গ্রন্থ দুখানি রচনা করেন। ১৯৪৩ সালে ভারত সরকার প্রেরিত সঙ্গীত মিশনে নিয়ে ইউরোপের বহু দেশে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে, জাপানে ও মিশরে সঙ্গীতের ওপর ভাষণ দেন। নদীয়ার জাতীয়তাবাদী ধারার শেষ কবি সম্ভবত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭৪)। কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম। নিজের নাম বিশ্বেশ্বরীলাল। তিনি কবি, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও পত্রিকা সম্পাদক। সেই সঙ্গে গান্ধীবাদী, রাজনৈতিক নেতা ও সমাজসেবী, সংগঠক এবং কারা-বরণকারী। একসময়ে তিনি 'দেশ' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন। পরে একাধিক দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর বহু পরিচয় তিনি কবি — চারণকবি। তিনি চারণের দল গড়েছিলেন। স্বরচিত গান গেয়ে জনজাগরণ ঘটাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। তিনি অনেক গ্রন্থেরও রচয়িতা। "The Champion of the Prole-tariate" তাঁর ইংরাজি গ্রন্থ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিধানসভার মুখপত্র জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। শেষ জীবনে তিনি নদীয়ার বহু আলুলিয়া গ্রামে বাস করেন। নদীয়ার মাটিতে এই সমস্ত মনীষীদের আগমনে এবং সাহিত্য ও সঙ্গীতের অমলে বিশিষ্ট অবদানে সাত্ত্ব আলো ও সমগ্র ভারতের ভাষ্যে নদীয়া ছিল সারস্বতীর লীলাভূমি।

গঙ্গার উত্তরবাহিনী মূল নবদ্বীপ মধ্যযুগে ছিল সমৃদ্ধ বৃদ্ধিগ্রাহ্য সম্পত্তিশালী ইতিহাসখ্যাত বন্দর জনপদ। কালে নবদ্বীপ পরিণত হয় সংস্কৃত চর্চার জ্ঞানপীঠ অভিকেন্দ্রে। নবদ্বীপ থেকেই নদীয়া নামটির উৎপত্তি। প্রথমে নদীয়া বলতে নবদ্বীপকেই বোঝাতো। ইংরেজ শাসনের আমলে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বন্দরের প্রথম জেলা এই নদীয়া। তখন মহকুমাও ছিল এই জেলার মধ্যে। পরে মহকুমা স্বতন্ত্র হয়ে গেল। জেলার এই সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যাচর্চার ইতিহাসে নদীয়া প্রাচীনত্বের দাবি রাখে। নিধনের প্রাচীন ইতিহাস 'মহাবংশ'-এর বর্ণনানুযায়ী ২৫০০ বছর আগে নিজয় সমৃদ্ধ নবদ্বীপের অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। আলাদিনি উৎখননে নদীয়ার প্রাচীনতম বসতির স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলা চলচ্চিত্রের পোড়মাটির অলঙ্করণযুক্ত অষ্টকোণবিশিষ্ট বহু মন্দির এবং শিবনিবাসের মূলপ্রাসাদ ও বিশাল রীতির দেবালয় নদীয়ার উল্লেখ্য উদ্ভাস পুরাসম্পদ। সেদিক থেকে নদীয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নসমৃদ্ধতম জেলা।

মোগল সম্রাট আকবরের-পরবর্তী দুর্বল হীনবল মোগল শাসনকালে বাংলার শাসনকর্তা জাফর খাঁ মুর্শিদকুলি খান নামে বাংলার স্বাধীন নবাব হন। তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন। তখন নদীয়াঞ্চলের বাংলার নবাবকেই বার্ষিক কর দিতেন। আমর পলাশীর যুদ্ধের পর (২৩ জুন, ১৭৫৭) ১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের ফলে নদীয়াঞ্চলের বার্ষিক কর দিতে হত কোম্পানিকে। ১৭৭২ সালে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি জেলা প্রশাসন ও কাছারি আদালতের জন্য জেলার জেলার সমাহর্তা নিযুক্ত করেন। ১৭৮৭ সালে নদীয়ার সর্বপ্রথম ইংরেজ জেলা সমাহর্তা নিযুক্ত হন ডেভরনল্। তাঁর সহকারী ছিলেন ব্রেরী। এই সময়ের শেষে নদীয়ার নীলচাষ প্রবর্তিত হয়। 'বেঙ্গল ইন্ডিগো কনসার্ন' (ইংরেজ কারবার) নাম নীলচাষের ব্যবসায়ী নীলচাষে নদীয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করে। নীলচাষিদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতন করে লাভও বেশ করতে থাকে। পরবর্তী সময়ের মাঝামাঝি নদীয়া ও অন্যত্র নীলচাষিরা জোটবদ্ধ হয়। বিদ্রোহ করে। ইতিহাসের পাতায় এই ঘটনার নাম 'নীলবিদ্রোহ'। তখন নীলের কারবারে নদীয়ার মাটি চাষির রক্তে লাল হয়েছিল।

ইতিহাসের তিনটি উল্লেখযোগ্য পটপরিবর্তনে নদীয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ত্রয়োদশ শতকে বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানে বাংলার মুসলিম অধিকার সহ রাজধানীর সূচনা হয়। লক্ষ্মণ সেনের আমলে ১২০২ সালে ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়ার নবদ্বারে এসে কাউকে আঘাত না করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেলেন। নগরের সকলেই ভেবেছিলেন যে একদল বণিক ঘোড়াকেনার জন্যে ঘোড়া নিয়ে এসেছে। লক্ষ্মণ সেন তখন খেতে বসেছেন। বখতিয়ার অতর্কিতে হত্যা করে রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন। শঙ্কিত লক্ষ্মণ সেন খুব তাড়াতাড়ি নৌকা করে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে গেলেন। এই বিবরণের প্রামাণিকতা নিয়ে ঐতিহাসিকরা সন্দেহ প্রকাশ করলেও কাহিনীটি বেশ প্রচলিত। স্রোতকথা বখতিয়ারের নবদ্বীপ অভিযানের পরেই বাংলায় যে মুসলিম শাসনের সূচনা হয় তার অবসান হয় ১৭৫৭ সালে। এই নদীয়ার পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যায়। আবার ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে বর্তমান নদীয়ার চুয়াড়া থানার হালদারপুর গ্রামের নিকটবর্তী স্থানে মুজিবনগরে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও নদীয়ার একটা ঐতিহ্য আছে। নদীয়ার মহেশগঞ্জের জমিদার বিশ্বনাথ পালচৌধুরী (১৮৫৭-১৯১৪) ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের স্নাতক, ইংল্যান্ডের বেকলিনকাল ইন্ডিনিয়ার। অধিকন্তু বাংলার প্রথম সমবায় নিবন্ধক ওল্ফিট আর গৌরবে তাঁকে বলতেন "বি ডি পালচৌধুরী অব মহেশগঞ্জ"। ১৯০৩ সালের ১২ মার্চ পর নং ৬৯৫ পত্রিকার সমবায় কর্তৃপক্ষকে তাঁর তৈরি 'কৈলাসেশ্বরী ব্যাঙ্ক' থেকে পাঁচ হাজার টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। শর্ত ছিল নদীয়ারই অন্তত একটি গ্রাম

ক্ষেত্রে নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে। বিত্তশালীদের শর্ত পূরণে সেই সময়ে সরকারের নানান টালবাহানায় তাঁর উদ্যোগ তখন সফল না হলেও সরকারি সমবায় আন্দোলন প্রবর্তনের পূর্বেও নদীয়ার মাটিতে সমবায় ভাবনার এ এক জন্য দৃষ্টান্ত। তবে ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ নাগাদ বাংলার সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে বিভিন্ন তহবিল থেকে অগ্রিম হিসাবে যে টাকা দেওয়া হয় তার মধ্যে 'কৈলাসেশ্বরী ফাণ্ড'-এরও অবদান ছিল। অবিভক্ত নদীয়া জেলার ১৯২২-২৩ এবং ১৯৩৪-৩৫ সালে শ্রেণানুসারে এ, বি ও সি শ্রেণীভুক্ত কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তার কিছু বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

	মোট সমিতি	এ ও বি শ্রেণী	সি শ্রেণী
১৯২২-২৩	৩৪১	১৩	x
১৯৩৪-৩৫	৯৪৩	৫	৬৪৫

১৯৩৪-৩৫ সাল নাগাদ নদীয়ার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ছিল পাঁচটি। ব্যাঙ্ক নিম্ন সদস্যভুক্ত সমিতির গড় সংখ্যা ছিল ১৯৪টি আর কার্যকরী মূলধনের গড় পরিমাণ ছিল ৪ লক্ষ ৪০ হাজার। এই পাঁচটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের এলাকার জনসংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার।

সত্তরের দশক থেকে আজ পর্যন্ত স্থগিত নদীয়া জেলার বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতির তথ্য সংক্রান্ত কিছু পরিচয় দেওয়া হল :

সমিতির প্রকার	১৯৭১ ৩০ জুন	১৯৭৬ ৩০ জুন	১৯৯৬ ৩১ মার্চ
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক			
প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন/ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক			
প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি	৫৬৮	৪৭৭	৩৬৩
শ্রেন ব্যাঙ্ক	১৬		১৩
অকৃষি ঋণদান সমিতি / পৌরব্যাঙ্ক		২৯	১৭৮
প্রাথমিক কৃষি বিপণন	১১	১৫	১৫
আমদানি সমিতি	২৫	১৭	৯
পাইকারি ক্রেতা সমিতি			
মহাজনী সহ প্রাথমিক ক্রেতা সমিতি			
আবাসন সমিতি			
প্রাথমিক তন্তুবায় সমিতি (শক্তিচালিত)			
তাঁত সহ	৬৭	১৬৫	৪০৮
শিল্প সমবায় সমিতি		৮৯	৮৩
শ্রম ও নির্মাণ সমিতি	২		৬৪
পরিবহণ সমিতি	১৯		২০
ইঞ্জিনিয়ার সমিতি	x		৮৯
মৎস্যজীবী সমিতি	x		৭৮
সেচ সমিতি	x		১১
হিমঘর সমিতি	x		২
ক্রেতা সমবায় ইউনিয়ন			
মৎস্যজীবী ফেডারেশন			
কিষান সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক			
প্রাথমিক দুগ্ধ উৎপাদক			
হাঁস-মুরগি পালন			২২
হকার্স সমবায়			৪
অন্যান্য সমবায় সমিতি	x	১৬১	১৭
	৯০৭	১০১৪	১৭৮৪

সমবায় ক্ষেত্রে নদীয়া জেলার বিশেষ গর্বের প্রতিষ্ঠানটি হ'ল নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট। বিধান রায়ের মানসকন্যা কল্যাণীতে ১৯৫৬ সালের ১লা জুন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৬ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা ভারতে যে আটটি সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মফস্বলী অঞ্চলে কর্মিদের জন্য চালু হয় তার মধ্যে এটি অন্যতম। প্রথমদিকে ভারতের সমস্ত পূর্বাঞ্চল ছিল এর পঠনভূমি। এখন তা সঙ্কুচিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ-আন্দামান নিকোবর ও ত্রিপুরার জন্য চিহ্নিত হলেও বিশেষ বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্যায়ে ক্ষেত্রে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের মূলত কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদা-সম্পন্ন অফিসারদের সমবায় প্রশিক্ষণের সার্বিক পরিবেশ নিয়ে থাকে। শুরুতে এর নাম ছিল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং সেন্টার। ১৯৬৮ সাল থেকে নামের বদল ঘটেছিল কো-অপারেটিভ ট্রেনিং কলেজ হিসাবে। সমবায় সম্পর্কে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আগ্রহের স্বীকৃতিতে ১৯৮০ সালের ১৪ আগস্ট থেকে এটির নাম হয় নেতাজি সুভাষ কো-অপারেটিভ ট্রেনিং কলেজ। ১৯৯১ সালের ৯ ডিসেম্বর থেকে কল্যাণীর ইনস্টিটিউটটির নাম হ'ল নেতাজি সুভাষ ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট। তবে এটি ১৯৯৬ সালের ১৫ অক্টোবর থেকে 'নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল ইনস্টিটিউট অফ কো-অপারেটিভ ম্যানেজমেন্ট'-এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। সারা ভারতের ১৮টি ইনস্টিটিউটের মধ্যে মাত্র ৫টি অনুরূপ 'রিজিওন্যাল' শিরোপায় ভূষিত। কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ভারতের জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় এটি পরিচালিত হয়।

নদীয়া জেলার বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যে ১৭৯৫টি সমবায় সমিতি আছে তাদের বৈষয়িক ও আর্থিক সাফল্যের জন্যে নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক বিশেষ সচেষ্ট। আর বিভিন্ন সমবায় সমিতির সাধারণ সমস্যা, ঋণদান, সমবায় আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার, সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিস্তার, সমবায় সমিতি সমূহকে নিয়ে মাঝেমধ্যে আলোচনা, সম্মেলন, আলোচনাচক্র প্রভৃতির আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় নদীয়া জেলা সমবায় ইউনিয়ন। জেলার কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কটির নিবন্ধীকৃত নাম "নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ"। এটি নিবন্ধিকৃত হয়েছিল ১৯৬১ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি। যে দুটি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের একীকরণ প্রক্রিয়ায় এটির নিবন্ধন হল তাদের নাম নদীয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও রাণাঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ হল নদীয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — নিবন্ধিকৃত হয়েছিল ১৯১০ সালে। আর ১৯২৩ সালে নিবন্ধন হয়েছিল রাণাঘাট

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। তাদের প্রধান কার্যালয় ছিল যশোরে কৃষ্ণনগর ও রাণাঘাট। তার থেকে দুটিই ছিল মিশ্র ধরনের কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক অর্থাৎ 'পাকা টাইপ'। মিশ্র ধরনের ব্যাঙ্ক মানেই সদস্যপদ সমবায় সমিতি ও ব্যক্তি উভয়ের জন্যেই উন্মুক্ত ছিল। ১৯৭৬ সালের ৩০ জুন নাগাদ নদীয়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের যে অবস্থা ছিল তার থেকে ১৯৯৭ সালের ৩১ মার্চ তারিখে কি অবস্থায় এসেছে নিচের তুলনামূলক পরিসংখ্যান থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে :

	৩০-৬-৭৬	৩১-৩-৯৭
সদস্য সংস্থা - ৭৪১		৯৯৫
সমিতি - ৭০২		
ব্যক্তিসদস্য-৩৮		কৃষি - ৩৬৮
সরকার - ১		তন্তুবায় - ২৯০
		কর্মচারী - ২০৩
		ইঞ্জিনিয়ারিং - ৫৬
		বিপণন - ১৪
		মৎস্য - ১১
		অন্যান্য - ৪২
		সরকার - ১
মোট শাখা		
কেন্দ্রের (ব্লক)		
সংখ্যা		
বিভিন্ন আমানতে		
পরিমাণ ১৬১.০১ লক্ষ		৬৪৯০.৯১ লক্ষ
কর্মচারী		
সংখ্যা ৪৯৭.১৭ লক্ষ		১০০০.৬৬ লক্ষ
বিভিন্ন খাতে		
ঋণদান ৩.৬৪ কোটি		৪২৩০.২৮ লক্ষ
নিট লাভ ১.৩১ লক্ষ		২৭.৩৩ লক্ষ
		(১৯৯৫-৯৬)
		৩৪.৮৭ লক্ষ
		(অবিলিকৃত লাভ)

মূলত কৃষিক্ষেত্রে ঋণ ও মজুতদারি সমবায় ঋণ দেওয়ার জন্য গঠিত হলেও এই ব্যাঙ্ক তার কর্মক্ষেত্র শুধু কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে জেলার সব রকম সমবায় সমিতিকে ঋণদানের ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। তাছাড়া আর্থিক দিক থেকে দুর্বলতর সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হল ঘরভরা গোষ্ঠী গঠন। সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে এসে সদস্যভুক্ত করে ইতিমধ্যেই এই ব্যাঙ্ক ২৫ হাজার টাকা নিয়েছে। আরও ঘরভরা গোষ্ঠী গঠনের চেষ্টা চলছে। প্রথমত স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্ন শ্রেণীর কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি বলেই এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বিতরণ করে শতকরা ২ টাকা হারে কমিশন পাওয়ায় ব্যাঙ্কের বার্ষিক ২ লক্ষ টাকার আয় যেমন নিশ্চিত হয়েছে তেমনি শিক্ষক সমাজকে সমবায় আন্দোলনে সামিল করার ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের কাছে একটি ইতিবাচক সরজা খুলে গেছে। শিক্ষকদের নিয়ে অনেক সমবায় সমিতিও গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নদীয়া জেলাতেই প্রথম ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ প্রবর্তিত সুসমন্বিত সমবায় বিকাশ প্রকল্পের (ইন্টিগ্রেটেড কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) কাজ ৩১-৩-৯৪ তারিখে শেষ হয়ে গেছে। এ বিষয়ে এই ব্যাঙ্কেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তা এ এম মুখার্জির সভাপতিত্বে গঠিত কমিটির (১৯৮৬-৮৯) সুপারিশ অনুসারে জেলার কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকে পর্যায়ক্রমে ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (বিজনেস ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান - বিডিপি) আনা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে তাদের ঘরভরা করে গড়ে তোলার কথা। কাজ এগোচ্ছে। তাছাড়াও উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের কার্যসূচির (ডেভেলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান - ডি এ পি) আওতায় কৃষি ঋণদান সমিতিগুলিকে আনা হয়েছে। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ তাদের জন্য দায়িত্ব নিয়ে সমন্বয়ভাতারে থাকার করেছেন।

ব্যাঙ্কটির পরিচালন পর্ষদে মোট ১৬ জন আছেন। তাঁদের মধ্যে নির্বাচিত ৯ জন, সরকার মনোনীত ৩ জন, জেলা পরিষদ থেকে মনোনীত ১ জন, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে মনোনীত ১ জন, কর্মচারী প্রতিনিধি ১ জন এবং মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ১ জন। সমবায় আইনের ২৭ ধারা অনুসারে ১৬ জনকে নিয়ে গঠিত পরিচালন পর্ষদ এই ব্যাঙ্কের সার্বিক দায়িত্বে আছে। পরিচালন পর্ষদের ওপরে আছে সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক ও বিশেষ সাধারণ সভা। ব্যাঙ্কের সার্বিক নীতি প্রণয়ন, বাজেট অনুমোদন, কর্মসীমা নির্ধারণ, তিন বছরের অন্তর পরিচালন পর্ষদ গঠন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে বাৎসরিক সাধারণ সভার সদস্যবর্গ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে সমিতি তথা পরিচালন পর্ষদের ওপর নিয়ন্ত্রণ করেন তা গত ১৯৯৭ সালের ৭ জুন কৃষ্ণনগরের রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ব্যাঙ্কের সার্বিক কাজকর্মে দৈনন্দিনের দায়িত্বে আছেন কর্মীদল। ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্বে থাকা পরিচালন পর্ষদকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন ১৩৫ জনের এক অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীবাহিনী। এঁরাই সমবায় আন্দোলন ও গ্রাহকদের কাছে সমবায় মতাদর্শের বার্তাবাহক। সমবায় আন্দোলন তথা এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সাফল্যের অনেকটাই নির্ভর করে এঁদের ওপর। কর্মীদলটি মূলত ব্যাঙ্কের নিজস্ব কর্মীদের দ্বারা গঠিত হলেও ২ জন সরকারি অফিসার আছেন। ব্যাঙ্কের নিজস্ব অফিসারের সংখ্যা ৪৭ জন। অন্যান্যদের মধ্যে ক্যাশিয়ার, সুপারভাইজার ও ক্যাশিয়ার মিলিয়ে আছেন ৪২ জন। জুনিয়র ক্যাশিয়ার, ক্লার্ক ও ক্লার্কের সংখ্যা ১০ জন। আর অফিস পিওন আছেন ২৪ জন।

সভ্যভুক্ত সমবায় সমিতিসমূহের সহযোগিতা ও কর্মীদলের সক্রিয়তার ফলে ব্যাঙ্কটি প্রতিবছর লাভ করেই চলেছিল। বিগত ১৯৯৫-৯৬ সালেও লাভ ছিল ২৭.৩৩ লক্ষ টাকা আর পুঞ্জিভূত অবিলিকৃত লাভ ছিল ৩৪.৮৭ লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৯৯৫-৯৬ সালের লাভ আলোচনা না হওয়ায় সদস্য-সমিতিদের অনুকূলে তা বণ্টন করা যায়নি। কেন এমন হল? এ প্রশ্নের জবাবে কেন কিছু সমস্যার কথা শোনা গেল। প্রথমত, ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতো কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কেও আন্তর্জাতিক হিতকলতার মাপকাঠি (প্রুডেনসিয়াল নর্ম) অনুযায়ী ব্যাঙ্কের হিসাব তৈরি করতে হচ্ছে। নিষ্ক্রিয় পরিসম্পদ (নন্ পারফর্মিং অ্যাসেটস্) হিসাব করে নির্দিষ্ট সংস্থান (প্রভিসনিং) রাখতে নিয়েই এই বিপত্তি। অবশ্য আদালতের অবস্থার উন্নতি হলে এ পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। তবে আদায়ের ব্যাপারে রয়েছে নানান অন্তরায়। ১৯৯৫-৯৬ সমবায় বর্ষে আদায়ের হার শতকরা ৫২ ভাগের কিছু বেশি হলেও '৯৬-৯৭ বর্ষে কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৩ ভাগ। এর অবশ্য কিছু অপরিহার্য কারণও আছে যার ওপর ব্যাঙ্কের কোন হাত নেই। নদীয়ার মোট ধানের শতকরা ৩০ ভাগ দেওয়া হয় পাটের ওপর। আর পাট বিক্রি করেই শোধ হয় সমবায়ের ঋণ। সেই পাটের দর নেমে কবে। তাছাড়া ন্যাশনাল জুট মিল কর্পোরেশনের কাছ থেকেও বিপণন সমিতিগুলি সময়মত পাটের টাকা পাচ্ছে না। সমবায় তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে

বিনিয়োগও তার অন্যতম। আর একটি বড় কারণ। উৎপাদিত সমবায়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্কের ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগের মধ্যে নবীনগর এলাকার ৪৪টি উৎপাদক-সমবায়ের কাছেই পড়ে আছে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে 'ভাতের' কাছেই পাওনা আছে ৬২ লক্ষ টাকা। ভাতের বক্তব্য হল, আমার কাছ থেকে অনুদান পাওয়া যাচ্ছে না বলেই এই বাকি। তাছাড়া আমাদের সভ্যদের মূলধনও এখন বেড়েছে। সদস্যের মেয়াদগত পরিবর্তনের প্রবণতায় আমানতকারীরা এখন সঞ্চয়ী আমানতে কম টাকা রাখছে। বেশি রাখছে স্থায়ী আমানতে। অধিকন্তু লাভজনক হারে টাকা খাটাতে না পারলে স্থায়ী আমানতের ওপর অপেক্ষাকৃত বেশি অর্থাৎ প্রায় বিগুণ সুদ গোনা ব্যাঙ্কের পক্ষে বেশ কষ্টকর। তাছাড়া প্রাকৃতিক কারণে, যৈব মূর্ধিনাকে ফসল নষ্ট হওয়ার ঝাপারও তো আছেই। সদস্যিয়ার একটা নামমাত্র ব্যবস্থা অবশ্য আছে। তবে তা থেকে সব ক্ষেত্রে সাহায্য চাহিদা খুব একটা সুরাহা হচ্ছে না। কারণ সব ফসল এখনও বিমার পরিধিতে আসেনি। আবার দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও বিমার ক্ষেত্র ও মাপকাঠি ব্লকভিত্তিক থেকে এখনও মৌজাভিত্তিক করা হয়নি। তাছাড়া অনুমোদিত ক্ষেত্রে শস্য নষ্টের প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও সময়মত টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। সদস্যিয়ার এ অন্তরায়ের পাশাপাশি আদায়ীকৃত আসলের টাকা আসলের খাতে আর সুদের টাকা সুদের খাতে জমা না করার অসাধুতাহীনতা বহুদিন ধরেই ওপরীয়মান হয়েছে। কৃষিঋণের টাকা সময়মত পরিশোধের ক্ষেত্রে সদস্যদল পরিচালক সমবায়ের কাছ থেকে যে সুদ ভর্তুকি পান তাও সময়মত আসছে না। এই খাতে ১৯৯৭ সালের মার্চ পর্যন্ত ৬৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা পাওনা ছিল। আমার বাড়তি বিনিয়োগের জন্য কুঁড়ি অতিরিক্ত (রিজ ফান্ড) পাওনা টাকা আদায় ব্যাপারটাও বেশ অনিয়মিত। অন্যদিকে কৃষি ঋণ মকুব (এ আর ডি আর - ১৯৯০) নির্দেশাবলী রূপায়ণ করতে গিয়ে ব্যাঙ্ক প্রায় ৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত সম্পূর্ণীন যা সরকারের কাছ থেকে আর পাওয়া যাবে না।

বহির্বিশ্বের সমবায়ের দিক থেকে নেতিবাচক এই হতাশার চিত্রের পাশাপাশি কিছু ইতিবাচক সংকেতও পাওয়া গেল। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল তিনটি স্তরের পঞ্চায়েতের সাথে এই ব্যাঙ্কের সার্বিক সমন্বয়ের একটি বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সৃজনশীল ঋণনিকাশ গঠনের জন্য এটি একান্তই প্রয়োজন। ব্যাঙ্কের পরিচালন পর্ষদ বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে জিলা পঞ্চায়েতের সাথে ব্যাঙ্কের সাংগঠনিক কাজকর্মের সমন্বয় ঘটানোর এক উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রতি ব্লকে যৌথ সভাও হয়েছে। সমবায় আইনের ২৭(৫) ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত প্রতিনিধি তাঁর কর্তব্য পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের সমস্ত প্রাথমিক ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থার সদস্য করার একটি আইনসঙ্গত সংস্থান রাখা হয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সাথে সর্বস্তরের সমবায় আন্দোলনের সার্বিক অবদান সমবায় ও সংযোগিতা বাতাবরণ জেলার সব সমবায় সংস্থার সাথে সাথে এই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কেরও অনাদায়ের জেরা অনেক কমবে। প্রশাসিত পরিষেবা থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত আন্তর্জাতিক সমবায় নীতি অনুসারে "সমাজের জন্য অবদান"র অনুকরণে নানান সামাজিক কল্যাণেও ব্যয় করা যাবে। এতে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থাও প্রত্যক্ষ ও প্রত্যয়ভাবে উপকৃত হবে। গ্রামপর্যায় থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমবায়তন্ত্রের ভিত্তিভূমি গড়ে তোলার নিরেই নবীনা জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক এবার বেশি করে সজাগ নিজেকে দেখে ভাল লাগল।

বর্তমান সভাপতি আও ঘোষের মনন ও তার প্রাসঙ্গিক প্রতিফলনে বেশ আবেগই দেখলাম। মুগ্ধ নির্বাহী আধিকারিক সজল ঘোষের মধ্যে পেলাম আন্তরিকতার আমেজ। এই আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে যদি কর্মীবাহিনীর কাজের গতিবেগ যুক্ত হয় তাহলে সাধ ও সাধ্যের মধ্যেকার অনেক মূলকিলের আসান আপনা থেকেই হয়ে যাবে। আমরা সেই দিনেরই পথ চেয়ে আছি। সারস্বতীর শীলাভূমি নবীনা আস্তে আস্তে সমবায়ের পৌরোহিত্যে মানবিক কল্যাণমণ্ডিত আর্থিক সাবলম্বে লক্ষ্মীর বর লাভ করুক।

□

NEVER GUESS

"When Rudyard Kipling is clever he is very clever ; and when he is foolish he is very foolish."

Clever indeed!
Oh, No! No! And look
Sometimes it was worrying lest he should exhaust himself. It other times it was fearfully felt lest he should exhaust the public.

"Who amongst us may be like him?"—
asked a member.
A member just withdrawing his nomination sharply retorted, "I don't know."

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে সমবায় আন্দোলনই
আজ প্রার্থিত —
ক্রান্তিকালে উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

আমাদের দিঘা, পুরী, দার্জিলিং ও গ্যাংটক-এ প্রতিষ্ঠিত অবকাশ নিবাসের (হলিডে হোম) সুবিধা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছি।

৭৫ বৎসর ধরে (১৯২৪-১৯৯৮) সাধারণের পরিষেবায় উজ্জ্বল নজির সৃষ্টিকারী এই ব্যাঙ্ক সাধারণ মানুষের আরও কাছে আসতে চায়। মাখলা ও হিন্দমোটর-এ দুটি শাখা কেন্দ্র (ব্রাঞ্চ) খোলার সিদ্ধান্ত সেই আকুতিরই ফলশ্রুতি।

নন্দ গোস্বামী
সভাপতি

মদনকুমার বণিক
সম্পাদক

উত্তরপাড়া, হুগলি
পিন : ৭১২ ২৫৮
ফোন : ৬৬৩-১৭৯৮

দি গান এণ্ড শেল ফ্যাক্টরি কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

কাশীপুর, কলিকাতা : ৭০০ ০০২

ফোন নং ৫৫৭-৬৭৭০

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত কর্মী সমবায় সমিতিসমূহের মধ্যে ওপে, মনে ও পরিষেবায় প্রথম। কলকাতা পত্তনীকী হলে ২০ নভেম্বর অনুষ্ঠিত ৪৪তম বিভিন্ন জেলা সমবায় সপ্তাহের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রথম স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত। অর্থনীতির বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনীতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায় দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী।

পুরী ও দার্জিলিং-এ মনোরম পরিবেশে
হলিডে হোমের পরিষেবা সকলের জন্য উন্মুক্ত

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With best Compliments From

DURGAPUR STEEL PEOPLE'S CO-OPERATIVE BANK LTD.

(A Licenced Bank)
Regd. No. 138 Dt. 30-1-97

Benachity House
Durgapur - 713204
Phone : 0343 / 56-2393, 0343 / 56-4722

অনুবাদ গল্প

চার টাকা

মানবসাধন বিশ্বাস

মূল লেখক : আর কে নারায়ণ

পাতের কাজটা যে কেমন ধারা হবে রমা কিছুতেই তা ঠাহর করতে পারে না। কবীর লেনের ছোট্ট বাড়ী থেকে বেরিয়ে মার্কেট রোডের মোড় ঘুরতেই কিন্তু উৎসব-পার্বণ কাজকর্ম মিলে যায় অনেক।

মার্কেট কাউন্টেনের কাছে বসে ছিল আজ। ভীড় করে এক অচেনা কাজ মিলে গেল। রাস্তার অন্যের দড় বাহনের এক কাজের লোক সন্তানী চোখে এদিক ওদিক ঘুরছিল। রমার কাছেই খোলসা করল লোকটা। 'আমাদের আমার পাম্পটা কুয়োর পড়ে গেছে। ওটা তুলতে হবে। একটা লোক জোগাড় করে দিবি?'

'কত নেবে?'

'কত চাস বল না।'

'আগে কুয়োটা দেখতে দাও। দু'টাকার কমে তো হবেই না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে।'

রমা তো অবাক। ভাবতেই পারেনি হাঁকা দরটা এমন এক টাকার কমুল হয়ে যাবে। কস্মিনকালে কুয়োর নামেনি, তাই সে পাম্পহর বিশ্রি ঘুঁজছিল। কিন্তু লোকটা নাছোড়বান্দা। ওর হাতের কব্জিটা কেশ চেপে ধরেই টানতে টানতে নিয়ে চলল। রমা সেই নিমরাজি। 'ছেড়ে দাও বাপু আমাকে — বলছি কুয়োটুয়োর কিস্যু জানি না।' চেঁচালে কি হবে, লোকটা ছাড়লেতো না। সে কলছে, 'ওসব কথা রাখ, চল আগে কুয়োটা। আজ চার দিন হল ডিস্টেতে নিয়ে না, জীবনটা বিষ হয়ে গেল। আজই একটা কিছু না করতে পারলে আমার চাকরি খতম।'

'আরে, বলছি তো কুয়োটুয়োর কিছুই জানি না।'

'চোপ। ওসব চালাকি রাখ।' কুয়োর চাকাটা দেখিয়ে উঠে যেতার মতো মুচকি হাসল, 'জেলে যাওয়ার ইচ্ছা করিস না। দু-এক আনা বেশি লাগলে বল।'

'কিন্তু — কিন্তু —'

রমা কাঁউ কাঁউ করছিল। লোকটা তবুনি একটা রিক্সি এনিয়ে ওরে চুপ করিয়ে দিল ওকে। সেবকেশ হল ছেড়ে নিয়ে লোকটার পিছু পিছু চলল রমা।

বাগেরের গেটে তখন মালিক, মালকিন আর তাদের দুই ছেলে দাঁড়িয়ে। চাকরকে দেখেই আর চেঁচাল — 'কি রে, কাউকে পেলে?'

রমাকে দেখিয়ে সে বলল — 'এই যে এনেছি।'

রমা তখন কাঁপছে। সে অসহায়ভাবে চেয়ে রইল। কর্তা হাঁকলেন। 'একটা আমার ভাল কুয়োয় পড়েছে। ওটা তুলবে।'

'হুজুর, আমি কী করে পারব' — ওর কথার মধ্যেই চাকরটা বলতে লাগল — 'ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন মালিক, আমি করিয়ে ও পারবে।' কর্তা আর পরিবারের সবাই এর মধ্যে কোনো গভীর চালচিত্র আঁচ পেয়ে থাকতে পারেন। তবুও ওরা বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কুয়োটা আগে দেখো।'

রমাকে ওরা পিছনের উঠোনে নিয়ে এল। বাড়ির কর্তা ও আর সবাই ওকে খাতিরের চোখে দেখছে মনে ধীরে ধীরে নিজের ওজনটা উপলব্ধি করতে শুরু করল রমা। সবাই রমাকে ঘিরে রেখেছে আর খুঁটিনাটি বলছে। বেশ গভীরভাবে শুনল সে সব। তারপর বলল, 'পাম্পটা নির্ঘাত বেশ পুরনো ছিল।' সবাই একবাক্যে সায় দিলেন। রমা আরও গুরু গম্ভীর হবার মহড়াটা করে দারুণ কিন্তু একটা করে ফেলেছে। এবার ওরা ওকে আসলটার ইতিহাস শোনাল। ওটা পৈতৃক সম্পত্তি। ঠাকুর্দার আমলে ওভাবিদহে পাওয়া, সেই থেকে হাতবদল চলছে পুরুষানুক্রমে। ওরা কটিটা করে আনল কুয়োর চাকাটার নিচে। মালকিন বলল, 'আসলটা হাতে ছুঁতে পর্যন্ত দেননি এই বুড়ির ঠেঁটিটা, আর আজ —'

'কুয়োর জল তুলতে সব সময় সবার পাম্পটাই ব্যবহার করতে হয়।' রমা ঐতিহ্যের ফুরধর বিশেষজ্ঞের মত টিপ্পনী কাটল। তবু ওরা করে উঠল সবাই। রমা বুঝে নিল এবারে সে পাকা ঘুঁটি।

ওরা কুয়োর ওপরের চাকাটা তুলে ফেলতেই রমা উঁকি দিল নিচে। দেখেই রমার মুখ শুকিয়ে গেল। এযে এক বিশাল সুড়ঙ্গ। আন্দাজ আড়াইশের অন্ধ প্রায় এক টিলতে জলের রেখা চমকে করছে। রমা বলল, 'হুম, খুব গভীর কুয়ো।'

'আড়াই ঘাটি ফুট।'

'চল্লিশ ফুটের বেশি দড়া কুয়োয় ব্যবহা যাবে না।'

'আরো আটেক বেশি নিচি, অসুবিধে কি আছে?'

'পুরো চার টাকা নিতে হবে। নইলে কুঁকি নেওয়া যায় না।' কিছুক্ষণ দর কষাকষির পর ওরা রাজি হল। সঙ্গে পড়ার দেব আনাড়ীকুত হাওয়ার ফিসিয়ে গেল তখন। এক থেকে চার টাকা জীবনে কখনো কামাননি রমা। টাকাটা ছুকে নেওয়াই মত। কম করে তিন দিন তাকে আর কাজ খুঁজতে হবে না। বউ আর শাশুড়ি চুপচাপ থাকবে। মনে হচ্ছে এবার আসল মুকোছে। কিন্তু পরক্ষণেই সেই কালো আন্ধকারের জলে উঁকি দিতে সেই ভীন ফিসিয়ে যায়। চোটে টাকার খেয়ে, অন্ধ সরে পড়তেই চাইছে মন। কুয়ো থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে সন্তোষজনক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ শেষ করে পাঁচ মেয়েদের মেজাজে একরা বলল, 'হুঁহা, সব ঠিক আছে। আমি সন্ধের দিকে আসব। এখন বাড়ি যাচ্ছি।'

'কেন?'

রমা বোকাতে পারল না কেন। আমতা আমতা করতে লাগল। সে মুখ ফুটে ফুটে করে বলল, 'এখনও খাইনি। সঙ্গে সঙ্গে ওরা রমাকে নিয়ে গেল বাগেরের একটা দোপে। একটা পাতা পেতে দিল ওর সামনে। খাবার এসে গেল। আরশাটা বাগেরের ঠিক দোখার দেটুকু বুঝতে না বুঝতেই খাওয়া হয়েছে তারপেট। ওকে ঘিরে জোগানার পরিবেশন চলছে। সবাই সন্তুষ্ট, আরো চাট্টি হয়ে যাক। শেষে এল পান সুপুরী। রমা টিমুচ্ছে, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে হয়ে গেল। রমার মনে হল সে এ যুগের

সাক্ষাৎ অতিথি নারায়ণ। কিন্তু এবার দায় বড় বালাই। এখন তার এই অভিধানে বেরোয় সব রাস্তা বন্ধ — কথা ফিরিয়ে নেবার কোন পথ নেই। যাই হোক, আর ঘন্টার মধ্যে ফিরোবার পথ ফুরোতেরায় ডাক এল। এবার তাকে আসামীর মতো লাগছে। সে অনেকক্ষণ ধরে স্থির দৃষ্টিতে কুয়োর তলের তল খুঁজতে লাগল। এবার সে দেবব্রতের মতো দায় কাটানোর প্রাণপণ চেষ্টা চালাল 'না, না —আমি একা পারব না।' ওরা সবাই মিলে হে হে করে উঠল। 'একদম ওরকম বোল না।' রমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না কেন এরা বেরোবার আগে তাকে মারতে চাইছে ওকে। এক পলকের জন্য ছুটি নামিয়ে পালানোর কথা মাথায় এসেছিল। চারপাশটা দেখছিল। না, ওরা ঘিরে রেখেছে আটটা মাথা। তার মনে হল পালানোর চেষ্টা করলে ওরা ঘেরাও করে ফেলবে সবাই মিলে, তারপর চারদোলা করে ছুঁড়ে ফেলবে কুয়োর মধ্যে। কোনো আশা নেই পালিয়ে বাঁচার। ঝোঁড়া-কাটা জামাটা খুলে, কুড়ির কাছ শক্ত করে বেঁধে নিল রমা। একটা দড়ি ঝেরে নিয়ে তার এক প্রান্ত নিয়ে কুয়োর ওপরের থাবার সঙ্গে কেন করে বাঁধল, অন্য প্রান্ত নিচে নামিয়ে দিল। কুয়োর মুখে উঠে পড়ল, তারপর দড়ি ধরে নামতে লাগল। সমস্তক্ষণ কুয়োর দেওয়াল থেকে পা দুটো ছড়িয়ে নিয়েছে। এভাবেই নামতে লাগল সে। ভয়ে নিচে তাকাবার সাহস হচ্ছে না রমার। বাতাসটা আরও গরম, আরও আঁধার ঘনিয়ে আসছে। সে উপরে তাকাল। আকাশের নীল চাকতি। ওপরের থাবার কাটানে একটা বিপুল চোয়া বেরিয়েছে। আর সেখ আছে আরও মুখগুলো — ওপর থেকে এর দিকে নজর রাখছে। একজন বলল, 'ঘুমিয়ে।' আর একজন ধমে উঠল — 'তাড়াহুড়ো কোর না।' রমা বলছে, 'বাপগুলো দেখাই, উঠে আসতে দাও, আমি নামতে পারছি না।' মিটি কথার কাজ হাসিল করতে মধুমি করেও আনা বাড়িয়েও দিল। 'আরে অর্ধেকটা নামা তো হয়েই গিয়েছে।'

'যদি আর আমি ওপরে উঠতে না পারি, বাবুরা দয়া করে আমার জোনাকে খবর দিয়ে দেবেন।'

কথাটা শোনামাত্র সবাই হেসে উঠল হো হো করে। বড় অসহায় লাগছিল রমার। সে জানছিল, পালানোর পথ নেই, মরতেই হবে। সে ধিরেধিরে নিচে নামতে লাগল। পথে মুহূর্তেই আরো অন্ধকার, আরো আতঙ্ক। কানের জ্বালাটি জেঁকে হয়ে গেছে, মুখটা ভারি ভারি লাগছে। চোখ ঘুলিয়ে উঠছে। যখন শেষ পানিয়ে পৌঁছল তখন সে অবসন্ন। তবে মাথার ওধুই বাজছে, 'চার টাকা। চার টাকা।' নিজের মনেই বলে চলেছে, 'মরে যাচ্ছি আমি, না, মরেই গিয়েছি।' পরে সহস্র বছর ঠাণ্ডা কনকনে জলের ঢেউয়ে লাগল। নিশ্চলনকরণে স্থির হয়ে গেল। তারপর হাত ভরে জল নিয়ে খেয়ে ফেলল। তারপর লাগল কাঁপ। মুখে তখন বিড়বিড় করছিল, 'চার টাকা। চার টাকা।' তার আচ্ছন্নতলে কুয়োর তলানির মতো চিরন্তী অন্ধকার করতে করতে অবশেষে এক টুকরো দড়ি খামচে ধরল। সেই দড়ি ধরার হাতটা এগিয়ে নিতে দেখল ওর সঙ্গে বাঁধা আছে তার সেই পাঞ্জাবিটা।

এবারে ওপরে ওঠা। সেটা আরও বড় এক অভিধান। বলতে গেলে ওরা সকলে মিলে সবলে টেনে তুললো তাকে। মাটির ওপর প্রায় ঘন্টাখানেক উপুর হয়ে পড়েছিল। যখন জ্ঞান ফিরল, ওরা বলল — 'বড় ভাল লোক তুমি। এবার কুয়োয় কিন্তু পড়লেই কেন তোমাকে তাকবো। আর কোথায়?' রমা বলতে চাইল না। সে শুধু বলল — 'মধুমিটা দাও, চলে যাই।' ওরা ওকে চার টাকা চার আনা দিল। সেওলোর দিকে চেয়ে রমা বলল, 'মধুর বলেছিলেন চার টাকা বারো আনা।' ওরা তাতে খাপ্পা হয়ে তেড়ে উঠল — 'পালনার বাঁই দেখ না। জানিস জানোটার দাম ওর চেয়েও কম? আমরা তোকে ছেড়ে দিলাম, সব দিলাম। যা, যা, পালা। আর খুনি হতে দেখ।'

'মধুমিটার কথা আর বোল না — ওদের বাঁই মোটে না কিন্তুতেই। সব ব্যাটাই এক, বুঝলে।' কে যেন মন্তব্য করলে।

রমা বাড়ি পৌঁছে দেখে বউ আর শাশুড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। অমন করেই ওরা সন্ধ্যেবেলা দাঁড়িয়ে থাকে। দেখামাত্র বউ ছেলেবেলাকে ছলে উঠল — 'এই এখন তোমার সময়টা হচ্ছে। বাজার করব কখন আর রাঁধবই বা কখন? ভেবেছ কি? বাঁদরামি করতে জন্ম নিয়েছি? আজ রাত্তিরটা ওকিয়ে রাখলে তোমার উচিত শিক্ষা হয়।' এবার সে চার টাকা চার আনা ফেলে দিল।

'চার টাকা। চুরিটুরি করনি তো?'

রমা কথাই আর হাঁটুর মুড়ে যাওয়া আরশোওলো দেখিয়ে সব খুলে বলল। ওরা শুধু হাসল আর বলল — 'কখিনকালে তোমাকে কুয়োর ধারেপাশে যেতে আমি দেখিনি। নির্ঘাৎ ভেলমালের মধ্যে ছিটেফিটে। তারপর সুযোগ বুঝে কারো পকেট থেকে টাকাটা হাতিয়েছ, তাই না?□

শারদীয় অভিনন্দন সহ

শিলিগুড়ি সিনিয়ার কো-অপারেটিভ কোডিট সোসাইটি লিমিটেড

(সদস্যগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি আর্থিক সংস্থা)

স্থাপিত : ১৯৮৪

নেতাজিপল্লী, কবিগুরু সরণি

পোঃ রবীন্দ্র সরণি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪ ৪০৬

ফোন : শিলিগুড়ি - ৫৩৪৫৬১

শিলিগুড়ি মহকুমার অধিবাসীদের সেবায় নিয়োজিত

তন্তুজ

পুজোর স্টক এসে গেছে

পুজোর বাজার করে নিন কিস্তিতে দাম দিন

উৎসবের সময় সকলের জন্য কেনাকাটা করতেই হয়। নিজের জন্য দারুন একটা তাঁতের শাড়ী পছন্দ হলো, কিন্তু বাজেটে কুলোচ্ছে না - এমনতো প্রায়ই হয়। সুন্দর একটা অভিজাত বালুচরী বা মনভোলানো জামদানী, কম্পিউটার ডিজাইনের টানাইল শাড়ী, তসরের উপর কাঁথা স্টিচ, হ্যান্ড পেইন্টেড মুর্শিদাবাদ সিল্ক /পরম আথবা প্রিয়জনের জন্য ১০০% কটন শার্ট বা সালোয়ার কামিজে নজর পড়তেই মনটা ছটফট করে ওঠে, এমন হামেশাই হয়।

এখন থেকে আর মন খারাপ করে ফেরা নয়। 'তন্তুজ' এনেছে কিস্তিতে কেনার অভূতপূর্ব সুযোগ। পাঁচটি বা দশটি মাসিক কিস্তিতে আপনার চেক্ কেটে দিন। এর জন্য বাড়তি কোন সুদ লাগবে না। কোন ডকুমেন্টেশন চার্জ লাগবে না। কিস্তিতে দাম দেওয়ার এই সুযোগ আপাতত কেবলমাত্র সরকারী/আধাসরকারী অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক ও প্রখ্যাত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য। কমপক্ষে ২,০০০/ - সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকার তন্তুজ সামগ্রী কিনতে পারা যাবে এই প্রকল্পে।

এবার মন খুলি কিনুন, আরো মনের মতন কিনুন।

কেবলমাত্র নিম্নলিখিত তন্তুজ শোরুমে এই সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে ঃ-

◆ তন্তুজ ভবন (সল্ট লেক-সি কি-১৮/৪-যে রিজো পণ্য নয়) ◆ পার্ক স্ট্রীট ◆ শিয়ালদহ স্টেশন ◆ বেলঘরিয়া ◆ পরিমার্জিত মার্কেট যে রিজো পণ্য (কিছুটা) ◆ দক্ষিণপণ (মধুশ্রিমা) ◆ বৈষ্ণবঘাটা ◆ শিরাকোল ◆ আসানসোল ◆ বেহালা (ম্যাজিক সুপার মার্কেট) ◆ শ্যামবাজার (যে রিজো পণ্য নয়) ◆ বি.আই.পি. মার্কেট-কুলবাগান ◆ উত্তরাপণ (ডিস্টেম্পার, বিডিক সেন্টার) ◆ বরানগর (অনেকটা যেমন) ◆ হাওড়া ময়দান ◆ জামশেদপুর ◆ দেওঘর ◆ উত্তরপাড়া ◆ শ্রীরামপুর (বি. পি. দে স্ট্রীট) ◆ কল্যাণী (সেক্টোর পার্ক)

অথবা টেলিফোন করুন ঃ ৪৭৪-৬০৬০

তন্তুজ

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প বিপণন

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যান্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

তন্তুজ ভবন, প্লট-সি কি, নং-১৮/৪, সেক্টর-১, বিধান নগর, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪

ABC-T-98

ফোন নং — ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও
সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

দি সিউড়ি ক্রেতাস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলার শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং। সিউড়ি ৫৯৭, স্থাপিত : ১৯২৮

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সমস্ত প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিশু, ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প বিলাস দ্রব্য, মধ্যেচাষ ও ছোট ঘড়ি ঋণ, স্থানীয়স্থায়ী ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার লোন পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমুদয় আমানত বিমাকরণ দ্বারা সুরক্ষিত।
৪। সেফ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক জমা প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও মুহম্মদবাজার মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বসবাসকারী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide Lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta - 700 073

a name to reckon with for proper distribution of
essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles,
Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil
produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through
29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Directors
(Phone - 27-7012/13 & 26-8942

আত্মা

বুদ্ধদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধে নামছে ধীরে ধীরে। জঙ্গলের শেষ। খোলা মাঠের মিস্টি হাওয়ার প্রাণের আবেগ। ইলশেগুড়ির খামখেয়ালিপণায় বিড়ম্বনাও। তিন পা পিছনের টান এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে এক পা এগনোর স্বভাবধর্ম প্রকৃতির। মানুষেরও। বিশেষ করে এই মানুষটির, যে এখন হেঁটে চলেছে আলপথে।

বর্ধমান-সোনামুখী বাস রাস্তা অনেক পিছনে। মাঠ-ঘাট, আলো-বাতাস, আকাশ-নদীর ওপর ঝিলমিলকালো শরীরখানি বিছিয়ে দিয়ে সন্ধে নামল। এবড়ো-খেবড়ো পথ, পিছিল, সঙ্গে আলো নেই। হোঁচট খেয়ে, ধাক্কা সামলাতে সামলাতেই এগিয়ে চলে পরিতোষ।

ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আলো চোখে পড়ল। কৈলুটিক আলো না। কোন গৃহস্থের দাওয়ার কুপি বা লণ্ঠন। স্নান তবু আঁধারে উজ্জ্বল, যেভাবে উজ্জ্বলতা ঘিরে থাকে শতজীর্ণ সংগ্রামী মানবমণ্ডলীকে।

ক্রমে আলো বাড়তে থাকে, এক দুই তিন ...। চণ্ডীমণ্ডপ চোখে পড়ে। টোকা মাথায় বিক্ষিপ্ত মানুষজনের সতর্ক আনাগোনা। নানা চিন্তা জট পাকায় পরিতোষের মনে। কী কর্তব্য।

এ গ্রামের পরিচয় পরিতোষ জানে। সোমসর। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জল থেকে নেমেই সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল মুহূর্তের জন্য। ভোল না সোমসর ...। শেষ পর্যন্ত সোমসরই। হ্যাঁ, তেমন সাত-পাঁচে নেই এই গ্রাম। চাষবাস, ভালোমন্দ, নাদান, বন্ধুত্ব-শত্রুতার মাঝে নেহাতই প্রয়োজনের রাজনীতি। খণ্ডঘোষে কাজ করার সময় এ গ্রামের এক যুবকের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছিল। দীপঙ্কর। জিজ্ঞাসাবাদ করলে বাড়ি খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সে পথে যাওয়া ঠিক হবে কী।

চণ্ডীমণ্ডপের কান্নাকাটি এলেও থমকে দাঁড়ায় পরিতোষ। বধূ নেত্রের ঘটনা। উদ্বিগ্ন মুখের মিছিল। তবে কি খণ্ডঘোষের ঘটনা নিয়েই আলোচনা চলছে। হতে পারে নাও হতে পারে। তবে অত লোকের চোখের সামনে দিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। গ্রামে পরে ঢুকে পড়ার অভাব নেই। চণ্ডীমণ্ডপের পিছন দিকের গায়ে চলা রাস্তায় পা ঢাকা দিল পরিতোষ।

দুধারে কাঁচা বাড়ি, মাঝে সরু রাস্তা। কোনদিকে কোন আলো নেই। নিশ্ছিদ্র ...। কানা-পথে টাল খেতে খেতে পা টিপে এগিয়ে চলে পরিতোষ। হঠাৎ অন্ধকার চিরে ভেসে একটি শব্দ। তাকে কথা বলে ডেকা যায় না শব্দটি। পরমুহূর্তেই টর্চের জোরালো আলো এসে পড়ে পরিতোষের মুখে। আলোর পিছনের লোকটিকে দেখা যায় না। কিন্তু এবার ভেসে আসে স্পষ্ট কণ্ঠস্বর : 'কমরেড'।

চমকে ওঠে পরিতোষ। সে তার গোপন রেখে স্থির গলায় বলে, 'কে'?

— যতই সাবধানে চলুন, এ পথ বড় পিছিল কমরেড।

— আপনার পরিচয়?

— চতুর্দিকে পুলিসের জাল। গা ঢাকা দেওয়া এত সহজ ভেবেছেন?

পরিতোষের মনে হয় লোকটি পুলিসের আড়কাঠি। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে হাঁশিয়ার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লোকটির ঘাড়ে। কলার পেড়ে ফেলে। হাত থেকে টর্চ কেড়ে নিয়ে তার মুখের ওপর আলো ফেলে।

কালো কালো মোছায়া চেহারার এক যুবক। গালভর্তি দাড়ি, চকচকে চোখ। পরিতোষ বলে, 'কি নাম তোর?'

হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি বলে, 'হামিদ। হামিদ মিঞা।'

— আমার সঙ্গে তোর কিসের পরিচয়?

— বলছি, ছাড়ুন।

হামিদকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পরিতোষ। দুজনেই ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। চাপা গলায় পরিতোষ বলে, 'বল্ কী পরিচয়।'

— আমি আপনাকে জানি মহিলা। আপনার ডাকনামটাও আমি জানি। খণ্ডঘোষে, বড়া-কমলাপুরে জোতদারীদের লড়াইয়ে আপনি নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভূবিরডেড়ির আন্দোলনে জোতদারের গুণ্ডারা আপনাকে ..., এই সেদিন খণ্ডঘোষেও বাইপাস রোড।

— থাক। এবার তোমার কথা বলো।

— আমি সামান্যি এক চাষী। অল্প জোত-জমি আছে বটে। সে হিসাবে মালিক বলতেও পারেন। কিন্তু কি জানেন বটে ...

— যা বলবে খোলসা করে বলো।

— হ্। আমি আপনাদের সন্দেহভোন করি .. সে হিসাব আপনাকে খোলটায় দিতে ...

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরিতোষ তাকায় হামিদের মুখে। হামিদ কের স্পষ্ট করে বলে, 'হ্, আমি তো চাসমিহি বটি ...'

তার বিশ্বাস করানোর ধরন দেখে পরিতোষ লজ্জা পায়। ছি ছি! এত সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করা ঠিক নয়। যদিও সেদিনের কথা সে মানে যে, জমি থাকার অর্থই মালিকানা এবং সে কারণে কৃষক সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্বে আসতে পারে না — তথাপি স্বল্প সামর্থ্যের এই কৃষি-মালিকদের সহযোগিতা বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজন। তাই সে হামিদকে লক্ষ্য করে বন্ধুত্বের সুরে বলে, 'আলাপ যখন হলই তখন বলি, পুলিস আমার পেছনে লেগে আছে। আমি পালিয়ে বেড়াই' ...

— সে তো বুঝিই কমরেড। তাই ত আপনারে ডাকা।

— আচ্ছা, দীপঙ্কর নামের কাউকে চেনো?

— দীপঙ্কর ... না তো।

— এই গাঁয়েই থাকত বলে শুনেছি।

— না, আমলের কুথাও ভুল হচ্ছে বোধয়।

— বেশ, আমায় কোথায় নিয়ে যেতে চাও, চলো।...

এগিয়ে চলল দুজনে। পরিতোষের কড়া নির্দেশ। নেহাত বাধ্য না হলে টর্চ জ্বালছে না হামিদ। সোমেশ্বরের মন্দির বাঁ পাশে রেখে শালি দামোদরের কোল ঘেঁষে খানিকটা হন্তদন্তই তারা এসে পৌঁছল তিন গম্বুজের মসজিদের কাছে। ছোট্ট এক চিলতে বাড়ির দাওয়ায় পৌঁছে আতিথ্যের ভঙ্গীতে হামিদ বলল, 'আইসেন, দলা আইসেন।'

বাড়িতে ঢুকিয়ে ঘর। একটি ঘর ছেড়ে

দেওয়া হল পরিতোষকে। বাড়িতে হামিদ ছাড়া অন্য কেউ থাকে বলে মনে হল না। হামিদই এগিয়ে দেয় জল ঘটনটি , লুঙ্গি,গামছা ইত্যাদি। হাতমুখ ধুয়ে লুঙ্গি পরে আরাম করে ঘরে বসে পরিতোষ। দরজা ভেজানোর রীতি গ্রামে খুবই কম। তবু সাবধান হওয়ার জন্য দরজা ভেজিয়ে দেয় খানিকক্ষণের মধ্যেই মুড়ি দেখে চা নিয়ে আসে হামিদ।

সারা দিনের পর এই প্রথম পেটে কিছু পড়ল। পোয়াসে মুড়িকটি খেয়ে চায়ে চুমুক দেয় পরিতোষ। দেহের বল ফিরে পায়। হামিদকে কাছে বসিয়ে হাসি মুখে বলে, 'তোমার কেউ নেই?'

— আছে। তবে একজন পাই যান না কাউকে _

তার কথার ধরনে হেসে ফেলে পরিতোষ। বলে, 'না না, দেখতে চাইছি না কাউকে। জিজ্ঞেস করছি, এই মাত্র।'

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর হামিদ বলে, 'আন শুন দিয়া'। আর শোনেন, দোরের আগলটা দিয়া দেন ঘটে ... কহা ত যায় না ...'

মাঝরাতে ভারি পায়ের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায় পরিতোষের। দাওয়ায় এবং সামনের পথে নিজনিজ করছে পুলিশ। আগল ফাঁক করে এক নজর তাকাতেই পরিতোষের চোখ যায় হামিদের মুখে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে সে এক কর্তাব্যক্তিকে বলে চলেছে — 'না স্যার, টের পাওনের চান্সই নাই। এ্যামন অ্যাকটিং করসি —'

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিতোষ। ঘরের পশ্চিমদিকে ছোট একটি জানলা। মাটির বুকে বাখারি বসিয়ে তৈরি। বাখারিতে ঘুণ। অনেক মুহূর্তের চেষ্টায় বাখারিগুলো খুলে ফেলে পরিতোষ। তক্তাপোষের সযত্নস্থানে জানলা। তক্তাপোষে উঠে হামা দিয়ে জানলা গলে বাইতে আসতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না তাকে।

এই নিকটায় কোপকাড়। তার ওপর নিকষ অন্ধকার। সাপখোপ থাকতেই পারে। অন্যান্য বিপদও ...। তবু উপায় নেই। কয়েক পা এগনোর পর ডানদিকে অস্পষ্ট আলোর নিশান। হাত পা কেটে ছড়ে যাচ্ছে। তবু প্রাণপন শক্তিতে এগিয়ে চলেছে পরিতোষ। খানিকদূর যাওয়ার পর কোপকাড় পাতলা হয়। হঠাৎ পরিতোষের মনে হয় কাছেই একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। এত রাতে কারো থাকার কথা নয়। তবে আড়কাঠি হতে পারে কিংবা পুলিশ । চাপা গলায় পরিতোষ বলে, 'কে?'

এমন সময় বিদ্যুৎ চমকালো। চকিত আলোয় পরিতোষ দেখে, শীর্ণকায়া এক প্রৌঢ়া রমণী। ওকনো দেহ কিন্তু চোখদুটি উজ্জ্বল। বেশ অন্ধকার। নিবড়তর। হঠাৎ আদেশের ভঙ্গীতে প্রৌঢ়ার কণ্ঠ থেকে ওঠে, 'ছদ্মা করেন' আইবেন'।

আপনার পরিচয়।

— পরিচয়ে কী প্রয়োজন! অহন বিপদ। চইলা আসেন।

— আমি জানতে চাই।

— আমার বদনসীব, হামিদের আম্মা আমি। সে পুলিশের আড়কাঠি, শয়তানের সাগরেদ। কিন্তু আমার স্বামী ছিলেন কৃষক সভার নুর আলি —

— নুর আলি। আমাদের নূরদা _ হামিদ তার ছেলে।

— বদনসীব ভাইসাব। তবে আপনাকে আমি চিনি। ছবিতে দেখেছি। হামিদ আজ আপনাকে নিয়ে আসতেই আমি বুঝতে পারি ওর মতলব। পাশের ঘরেই ছিলাম বটে। যোগাযোগের সুযোগ পাই নাই।

— পুলিশে খবর দিল কি করে?

— শয়তানের কি লোকের অভাব ভাইসাব। যাক্, এই চর্চা নেন আর উত্তরমুখো হাঁটা দেন। ঘাটোলারে অনেক নৌকো বাঁধা আছে। যে কোন একটা নিয়া ওপারের চরে বাঁইধ্যা যান। চরের উপরে পানাগড়। রাত থাকতেই পার হইয়া যান কমরেড।

আর দ্বিধা করে না পরিতোষ। কাদায় ভর্তি ঝুলি বা কাঁধের ওপর টিকটিকে তুলে নিয়ে সে বলে 'চলনাম কমরেড অভিনন্দন।'

পায়ে পায়ে পিছিল পথে এগিয়ে যায় পরিতোষ। জীবন মৃত্যু তুচ্ছ করেই। পেছন ফিরে একবার দেখে। ক্ষীণকায়া মানুষী দাঁড়িয়েই আছে কেন।

ঘাটোলায় এসে নৌকা ছাড়ে পরিতোষ। হাল ধরে। তার দু'চোখে অন্যরকম এক প্রত্যয়ের আলো। এক শীর্ণা নারীর অস্থিতে গড়া সে প্রত্যয়। যে নারীর নাম নেই, গ্রাম নেই, উপাধি নেই, পতনও নেই, যে নারী কারো জায়া নয়, পুত্রী নয়, ভগ্নী কিংবা জননী নয়, যে নারী বিপ্লবের জননী। বিকল্পরহিত এক আত্মা যার গর্ভে শয়তান জন্ম নিলেও সেই শয়তানের মারণাস্ত্র তিনি নিজেই তৈরি করেন। বিপ্লবের অবিকল্প ভূমিতে স্থির প্রত্যয় হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন, দাঁড়িয়ে থাকেন, দাঁড়িয়েই থাকেন —।

❑

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ

পিড়াতলী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ৬১ এইচ জি ; তারিখ - ৩-১১-৬২

গ্রাম - পিড়াতলী ● পোঃ - জোলকুল ● জেলা - হুগলি

আঃ মান্নান
সভাপতি

আনন্দচাঁদ দত্ত
সম্পাদক

বসুদেব ঘোষ
ম্যানেজার

আপনার আনন্দঘন দিনগুলি কাটান

গোদরেজ কলকাতা কর্মচারিদের সমবায় ঋণদান সমিতির
উদ্যোগে পরিচালিত

পুরীর হলিডে হোমে

এই সমুদ্রমুখী চারখানি এক কামরার স্বয়ংসম্পূর্ণ হলিডে হোম
উদ্বোধন করা হয় ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬-এ

পুরীর মনোরম বালুকাবেলায় গৌরাবারাসাহীতে হরিভবনের
বিপরীত বাড়ির তিন তলায়।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন

গোদরেজ কালকাটা এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

ব্লক : জি এন, সেক্টর-৫, বিধাননগর, চতুর্থ তল
কলিকাতা-৭০০ ০৯১

প্রবীরকুমার নাথ
সম্পাদক

কল্যাণচন্দ্র মণ্ডল
এস কানান

ফোন : ৩৫৭-০৮৯৫/৯৯

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

Adambandh Samabaya Krishi Unnayan Samity Ltd.

MUTHADANGA, POST.-MAYAPUR, DIST.- HOOGHLY
PHONE : 03211-59222

(Govt. of West Bengal its largest Share Holder)

Marching Ahead for —

- *Providing Agril. & Non Farm Loan to its Members.*
- *Stockist of IFFCO Fertilisers.*
- *Wholesale & Retail Selling of Veterinary Medicines.*
- *Manufacturing of Live Stock Feeds in Mocora Feed Plant.*
- *Supply of Pasteurised Milk from own Plant.*
- *Ensuring supply of Table Eggs & Birds to the Govt. for Hospital after procuring from the Farmers sponsored under the Society.*

ড়া জ গ
ক্রী ৎ

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপ

সবুজ ক্যানভাসে ফ্রান্স এঁকেছে ফুটবলের অনন্য ছবি

শ্যামসুন্দর ঘোষ

ফুটবল শহর কলকাতা। বিদেশিদের কাছে বিস্ময়ের। বিদেশি সাংবাদিকদের ধারণা ভারতে ফুটবল খেলা হয় না। ফ্রান্সে ভারতীয় সাংবাদিকদের উপস্থিতির ছবি দেখে তারা অবাক হয়েছেন এবং চমকে উঠেছেন সাংবাদিকদের কর্মচাঞ্চল্য দেখে।

কাজের সূত্রে সাংবাদিকদের ফ্রান্সের এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরতে হয়েছে। এতে ভারতীয় সাংবাদিকরা লাভবানও হয়েছেন। কারণ ফ্রান্সের মাটিতে বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছে।

বিশ্বকাপ মানেই ব্যস্ততা। তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ভারতীয় সাংবাদিকদের চলতে হয়েছে। কারণ সময়টা মূল্য হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সের সময়ের সঙ্গে ভারতীয় সময়ের ব্যবধান সাড়ে তিন ঘন্টার। এই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা সহজ কথা নয়। কারণ ভারতীয় সাংবাদিকদের মাথায় কেবল একটাই চিন্তা ফ্রান্স বিশ্বকাপের ঘটনাবলী থেকে যেন ভারতের ফুটবলপ্রেমীরা বঞ্চিত না হন।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে মাঝে মধ্যে এমনও হয়েছে ভারতীয় সময় সকাল আটটায় স্টেডিয়াম থেকে হোটেলে ফিরতে হয়েছে। মাঝে বিশ্রাম মাত্র তিন ঘন্টার। তারপর আবার বেরোতে হয়েছে। কারণ সেই একই। বিশ্ব ফুটবলের সংবাদ থেকে পাঠকদের বঞ্চিত করা চলবে না।

ভারতীয় সাংবাদিকদের কাছে এ এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। খেলা শেষ হয়েছে ভারতীয় সময় রাত আড়াইটায়। সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে হয়েছে সংবাদটি কম্পিউটারে নিজ নিজ কাগজের অফিসে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

তবে, এই কঠোর পরিশ্রম গায়ে লাগেনি। বরং এতে প্রত্যেকেই আমরা অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। নিজেদের শরীরের দিকে তাকানোর কোনও ফুরসতই ছিল না। হাতের কাছে যা পেয়েছি তাই খেয়েছি।

বাঙালি বলে কথা। মাঝে মধ্যে সময় পেলে ভাতও খেয়েছি। হ্যাঁ, দশ হলেও বঙ্গ সন্তান। তাই ভাত আছে এমন হোটেল খুঁজে নিতেও অসুবিধা হয়নি। অবশ্যই মজা বিজয়ের মত আমরা একটি বাংলাদেশী মুসলমানের হোটেলে আবিষ্কার করেছিলাম। কখনও কখনও সেইখানেই রসনা তৃপ্তি করেছি।

● রোনাল্ডো - সোনার বলের অধিকারী

ফ্রান্সের মাটিতে বিশ্বকাপ। অধিকাংশ হলেও সুস্থি! প্রথম দিকে ফরাসি মহিলাদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে কোনও উৎসাহ চোখে পড়েনি। সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। হোটেল বারান্দাতে চোখে পড়েছে ফরাসি মহিলাদের চোখ বই কিংবা ম্যাগাজিনের উপর। কারও মুখে ফুটবল শব্দটি উচ্চারিত হতে শোনা যায়নি।

কিন্তু পরে, অর্থাৎ ফ্রান্স যখন বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠল, ঠিক তখনই চিত্রটি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। পুরুষ ফুটবল অনুরাগীদের উৎসাহকেও ছাপিয়ে গেল।

বিশ্বকাপ জয়ের পরের মুহূর্ত আমার বর্ণনা করা যায় না। যাঁর তাঁরা জয়ের আনন্দে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। মহিলাদের নাচে গানে মুখর হয়ে উঠেছিল শিল্প, কবিতা ও সাহিত্যের দেশ।

একথা অনস্বীকার্য আমরা ভারতীয় সাংবাদিকরা সাত্রা ভারতের দ্বিতীয় প্রান্তে বেলজিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতার ম্যাচ কভার করে থাকি, তার সঙ্গে বিশ্বকাপের কভারে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

● সর্বোচ্চ গোলদাতা ও সোনার বুটের অধিকারী সুকেন

দেশের মাটিতে ফুটবলারদের সঙ্গে সাংবাদিকদের যেরকম দহরম মহরম বিশ্বকাপের মত আসরে তা সম্ভব নয়। বাস্তু বাধকতার পাশাপাশি ভাষাও একটি বড় সমস্যা। অংশগ্রহণকারী দেশের অধিকাংশ ফুটবলারই স্প্যানিশ, পর্তুগিজ কিংবা ফরাসি ভাষায় কথা বলেন। তাছাড়া যখন তখন ফুটবলারদের সামনে হাজির হয়ে কথা বলারও কোনও সুযোগ নেই। সাংবাদিকদের অনুশীলন দেখার সুটিও নির্দিষ্ট। যতটুকু জানার অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের ঐ সময়ের মধ্যেই সেখার রসদ জোগাড় করে নিতে হত, বহু যোগাযোগের মাধ্যমে।

এবার ফেরা যাক শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপের আসরে। বিশ্ব ফুটবলের সোনার মুকুটটি ফ্রান্সের শিরেই শোভা পাচ্ছে। যদ সমালোচিত কেউ আমি জয়ের মুখে এখন হাসি। তবে, এক কথায় অনুপ কেউ আছে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই ঘোষণা করেছিলেন যাদ কিংবা জয়, যাই হোক

বিশ্বকাপের পর আর জাতীয় দলের প্রশিক্ষকের দায়িত্বে থাকবেন না তিনি।

উদ্যোক্তা দেশ হিসাবে '৯৮ বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন এবং বিশ্বকে চমকে দিয়ে ফাইনালে ব্রাজিলকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ফুটবলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপে ব্রাজিলই ছিল সকলের পছন্দের দোড়া। ফুটবল বিশেষজ্ঞদের মূল আকর্ষণ ছিল ফ্রান্সের মাটিতে ব্রাজিল পঞ্চমবার বিশ্বকাপ জয়ের অনন্য নজির গড়বে।

ফুটবল বিশেষজ্ঞদের এই ধারণার পিছনে অবশ্য যুক্তি ছিল। একমাত্র ব্রাজিলই বিশ্বকাপের ১৬টি আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এবং বলে রাখছে একাধিক আসরের ফুটবলার। তাছাড়া ব্রাজিল সুপরিচিত দল।

ফাইনালে ফ্রান্স ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে এক স্মরণীয় ফুটবল উপহার দিয়ে।

বিশ্বকাপ ফুটবলের দুই ব্রাজিলকে ভুলে গিয়ে ও ফ্রেনচি দলদুনে উঠবেই ভাবেনি। প্রথম বিশ্বকাপের আসর বসে ১৯৩০ সালে।

ব্রাজিলকে ভাবেনি হলেও, ব্রাজিলকে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেতে ৬৮ বছর অপেক্ষা করতে হল। '৯৮ বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতার দাপিন আমেরিকার দেশগুলিই এগিয়ে ছিল। ফ্রান্স যেবার জয়ের বলে ইউরোপ ও দাপিন আমেরিকার পাল্লা এখন সমান সমান। ইউরোপ ও দাপিন আমেরিকা উভয়েই আটবার করে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

১৯৫৮ সুইডেন বিশ্বকাপে ফ্রান্স প্রথম বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। ঐ ম্যাচে ব্রাজিলের কাছে ৫-২ গোলে পর্যুদস্ত হয়ে ফ্রান্স প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছিল। ব্রাজিলের পক্ষে গোল তিনটি গোল করেছিলেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। এরপর ফ্রান্স দুবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিল।

১৯৮৬ সালে ফ্রান্স দলটি প্রকৃত অর্থেই একটি শক্তিশালী দল ছিল। ইতালি ও ব্রাজিলকে হারিয়েও শেষ পর্যন্ত ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিল।

বিশ্বকাপে সেদিন স্যাঁতমেনিতে ফ্রান্স সেমিফাইনালে জোরেসিয়াকে হারিয়ে ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করল, সেদিন গ্যালিস যে এক স্বপ্নময়ীর চেয়ারা নিয়েছিল।

হঠাৎ এই পরিবর্তন কেন? এর পিছনে বড় ভূমিকা ছিল জাতীয় দলের অধিনায়ক লঁপেসের। দেশের জনগণের ফুটবলের উপর অনীহা দেখে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'এ কেমন আচরণ যে দেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ফুটবলের মহাযজ্ঞ এবং যে দেশ ফাইনালে উঠেছে, অথচ জাতীয় দলের ফুটবলারদের উৎসাহিত করার মত কোনও স্লোগান নেই।'

পরের দৃশ্য কিংবা ঘটনার কথা সকলেরই জানা। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে প্রথমার্ধেই দুটি গোল করে জিদান হয়ে গেলেন ফ্রান্সের নায়ক। এরপর ফ্রান্সের পক্ষে শেষ গোলটি করেন ইম্মানুয়েল পেটিট।

● ফ্রান্সের নায়ক জিদান

ব্রাজিলের এইভাবে হার মেনে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। ফাইনালের পাই ঠিক হয়েছে ব্রাজিলের খেলা নিয়ে পোস্টমর্টেম। সন্দেহের আঙুলটি স্বভাবতই রোনাল্ডোর দিকে। অনেক প্রশ্নবাণ ছিল রোনাল্ডোর উপর।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ফাইনালে ব্রাজিলের প্রথম একাদশে রোনাল্ডোর নাম ছিল না। ম্যাচের ঘোষণা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে একজন বেঞ্চসেবক হঠাৎ হাত তোলে মাঠের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি রোনালদো, ব্রাজিল দলের লিস্ট পাল্টানো হচ্ছে। দশ মিনিট পরে ব্রাজিল দলের যে লিস্ট আমরা খেলার আগে খেলার রোনাল্ডোর নাম।

চূড়ান্ত লিস্ট হাতে পেয়ে আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠল — সর্বোচ্চ গোলদাতা হয়ে রোনাল্ডো কি সোনার বুটের অধিকারী হতে পারবেন?

না। রোনাল্ডো সোনার বুট পাননি। তবে সোনার বল পেয়েছেন।

সোনার বুট পাবেন কি করে? খেলা দেখে মনে হয়েছে, রোনাল্ডো আদৌই সুস্থ ছিলেন না। ফাইনালের আগে অনুশীলনেও অংশ নিতে আসে তেমন দেখা যায়নি। এই বিষয়ে প্রশ্ন করলেই উত্তর পাওয়া গেছে, যথাসময়ে ওঁকে আপনার কলমে উঠতে দেখবেন। এখন ওঁকে বিশ্রাম দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোনও বিতর্কে নিজেকে না জড়িয়ে কথা যায়, চার বছর আগে রোনাল্ডো হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। ওঁর হাঁটুর চোট যে সম্পূর্ণভাবে সেরেছে সেই সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে, ফাইনালের আগে ফুটবল সমাট পেলে রোনাল্ডোকে বলেছিলেন, 'শরীরের প্রতি যত্ন নিও।'

সে যাই হোক, ব্রাজিলের হারে অনেকে বিস্মিত হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যোগ্য দল হিসাবেই ফ্রান্স বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একমাত্র ব্রাজিল ছাড়া প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দলগুলি নিজেদের ফুটবল নৈপুণ্য তুলে ধরতে পারেনি। সেমিফাইনালের আগেই তারা প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছে। উরুগুয়ে অবশ্য '৯৮ বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারেনি।

এমনকী জিদানে ফাইনালে দুটি গোল করলেও, রোনাল্ডো, দাভের সুকের, ওয়েন, ওর্তেগা, বাতিস্তুতা, ফার্ডিন্যান্দ, সেল সিয়েরো, ট্রিজেয়ান, অলিভার, বিয়েরহফ ও সালাস নিজেদের সেরা ফর্মে ফুটবল খেলতে পারেননি।

ইতালি ও জার্মান দলের ব্যর্থতার সব দায়ই বর্তেছে ঐ দুই দেশের কোচ যথাক্রমে সিজার মালদিনি ও বার্তি ভোগটসের ওপর। তবে, বিশ্বকাপের আসরে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়ে নজর কেড়েছে ছোট্ট দেশ জোরেসিয়া, যে দেশের জনসংখ্যা মাত্র পাঁচ লাখ।

শতাব্দীর শেষ বিশ্বকাপে সেরা ম্যাচটি হল আর্জেন্টিনা বনাম ইংল্যান্ড। এই বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ নেই। দুই দেশের ফুটবলাররা নিজেদেরই উজাড় করে দিয়ে সেরা ফুটবল তুলে ধরেছিলেন। অনন্য হয়ে উঠেছিলেন ওয়েন ও ওর্তেগা দুই দলের দুই ফুটবল জাদুকর।

কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে গেছে ফ্রান্স। ফুটবলকে কেন্দ্র করে ফ্রান্সের প্রতিটি শহরের অলিতি ক্যানভাসে নতুন ছবি এঁকে দিয়েছিলেন ফরাসী ফুটবলপ্রেমীরা। অবশ্যই সৌন্দর্য বাড়াতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন সে দেশের মহিলারা। ☐

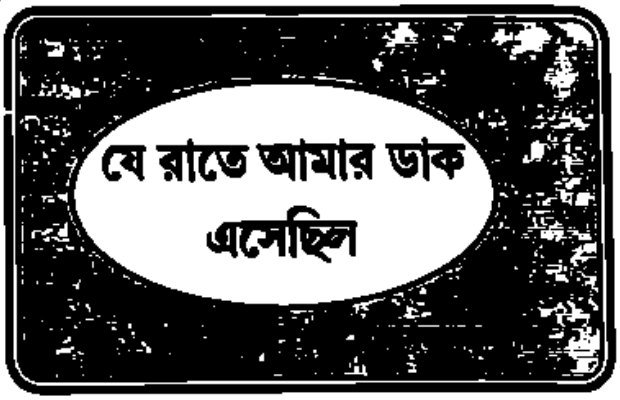

(এডগার মার্শাল স্পার্ক ভিটার গডার্ডের রচনার অনুবাদ)

১৯১৫ সাল থেকে আমি একজন পেশাদার বিমানচালক। আমার বিমান দুর্ঘটনায় আহতজনের গুরুতর হলেও আমি দুর্ঘটনার দুঃখজনক কখনো পড়িনি। তবুও আমার যখন সামরিক থেকে চৌকিত হবার জন্য বিমানে উঠতে হয়েছিল তখন আমি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম।

আমি দু'বছর প্রশান্ত মহাসাগরে রয়েল নিউজিল্যান্ড এয়ারকোর্সের অধিনায়ক থাকার পর আরও দু'বছর কর্মী ও সমরে ব্রিটিশ এয়ারফোর্স পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম। জেনারেল স্যাক আর্থার এবং অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমি যুদ্ধের সময় একসঙ্গে কাজ করেছিলাম তাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য আমি চৌকিত হয়ে বাড়ি ফিরে আসছিলাম। আমেরিকান মাউন্টব্যাটেন তাঁর নিজের বিমান সিস্টার আনকে বিমান কর্মিগণ সহ আমাকে তার দিয়েছিলেন। এই বিমান ও বিমানকর্মিগণ দুই-ই ছিল বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি।

আমার অবসরের কারণ জানিয়ে অনেকে এইজন্য যে আমার সঙ্গে যারা বিমানে যাচ্ছেন তাদের আমি এক ভয়ানক বিপদের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছি মনে করেছি, অথচ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণের অভাবে তাদের কাউকেও পারছি না থেকে যেতে। একজন এয়ারম্যান হয়ে আমি তাদের কি করে বলি যে আমি সন্দেহিত হয়েছি অলৌকিকভাবে।

আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় সাংহাইতে এক পার্টিতে ঘটনাটা ঘটেছিল। আমি আমার পুরনো বন্ধু আমেরিকান বিমান বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জন মাক কনেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম আমার পিছনে দু'জন ইংরেজ আলোচনা আলাপ শুরু করেছেন ও তৎক্ষণাৎ আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

'এই পার্টি কি এয়ারম্যার্শাল গডার্ডের সম্মানার্থে উপলক্ষে নয়?'

'অবশ্যই, কিন্তু কেন?'

'তিনি তো মারা গেছেন। গতরাতে এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে।'

আলোচনাটি অত্যন্তিভাবে এবং কেন নিশ্চিন্তভাবে কথাগুলি বললেন। আমি ধীরে ধীরে পিছনে ফিরলাম। লোকটি ছিলেন ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। তিনি দ্রুত আমার মুখের দিকে তাকালেই চমকে গেলেন এবং মনে হল যে আমি খুশি তাকে কিছু দিয়ে আঘাত করেছি।

তিনি খাদ নিয়ে বিনিতভাবে বললেন 'ক্ষমা করবেন, আমি ভীষণ দুঃখিত। মনে আমি দারুণ আনন্দিত — কি অদ্ভুত ব্যাপার। দেখুন, গতরাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছিলাম এবং তা খুবই সত্য বলে মনে হয়েছিল।'

আমি হাসলাম। 'আমি এখনও মরিনি, কর্মকর্তা। আপনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন। ঘটনাটা দেখার ঘটেছিল?'

'সন্ধ্যেবেলায়, তুমার ঝড়ের মধ্যে তাঁকবে ঢাকা এক পাহাড়ে সমুদ্রতটে যেখানে ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে পাথরের খণ্ড। জায়গাটা ছিল ঠিক আমার জানানো। আপনি পাহাড়ের উপর থেকে মধ্যে ছিলেন — আমি এসব স্বচক্ষে দেখেছি।'

'আমি কি রকম বিমানে ছিলাম?'

'একটি সহজাত পরিবহন বিমান, সম্ভবত একটা ডাকোটা (সিস্টার আন ছিল একটি ডাকোটা)'

'আর বিমান কর্মিদের সম্বন্ধে কি দেখেছিলেন?'

'এটা ছিল একটা তাজাবহ বিমান দুর্ঘটনা।'

আমি কর্মাণ্ডারের কাছ থেকে চলে আসতে গিয়ে ঠিক করলাম যে তাকে আরও একটু পরীক্ষা করব। ডুবোজাহাজ এবং ডুব-প্রকৃতি সম্পর্কে সে যে বিজ্ঞান বিরোধে তা মনে হচ্ছে যেন ঝাপ খেয়ে যাচ্ছে।

'আর কি আপনি দেখেছেন যে কি ধরনের লোকেদের সঙ্গে আমি ভ্রমণ করছিলাম?'

একটু চিন্তা করে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সাতজন বিমান কর্মিগণ এবং তিনজন অসামরিক ব্যক্তি — দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। সকলেই ইংরেজ।'

'অনেক ধন্যবাদ'। এটাই যথেষ্ট সন্তোষজনক যে বিমান কর্মিগণ ছাড়া আর কাউকেই আমি সঙ্গে নিচ্ছি না। কোন অসামরিক ব্যক্তি নেই। আচ্ছা, আমি আপনার নাম জানি না।'

'ও, আমার নাম ডিটার, ফ্রাঙ্ক ডেনিসিতে। আমি এখনকার কথাতে আছি।'

আমরা আরও একটু কথা বলার পর পরস্পরকে ছেড়ে গেলাম। তার সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হয়নি।

কয়েক মিনিট পরে লন্ডনের ডেলি টেলিগ্রাফের সেনসু বেরী ছুটতে ছুটতে আমার কাছে এলেন এবং বললেন, 'আমি বাড়িতে ফেরার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি এবং আপনার সঙ্গে চৌকিতে আসার অনুমতি চাইছি। আপনার পরিচালক বলেছেন যে আপনি রাজি হলে হতে পারে। আপনি কি কিছু মনে করবেন?'

একটা আনন্দিত আবাস অনুভব করে আমি উত্তর দিলাম, 'মোটেই না, যথেষ্ট জায়গা আছে। আমি তোর সাথে ছাড়ার হওয়া হব।' কিন্তু আমার মনে আশঙ্কা হল বেরীকে একজন যাত্রীরূপে নেবার জন্য।

পরেরদিন সন্ধ্যেবেলায় ব্রিটিশ বিমানবাহিনী জেনারেল জর্জ আর্ভাইন ওখানে আমার জন্য একটি বিদায় পার্টি দিলেন। ওখানে আমাকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন এমন সময় তার চিন্তা খানসময় এসে তাঁর হাতে একটি তেরাবার্তা পৌঁছে দিল। ওখানে সেটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'আমি আপনার উপর চাপ দেবার জন্য দুঃখিত, কিন্তু আপনি যদি আগামীকাল আপনার সঙ্গে আমাকে নিতে পারেন তো খুব ভাল হয়।'

আমি কি করে না বলি! অফারটি এসেছে বিমানচালক থেকে। কমান্ডার জেনারেলকে অভিনন্দন টেলিগ্রামে ইভিন হাইডমিলারের সঙ্গে দেখা করতে বলা হয়েছে।

আমি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলাম। এর ফলে দাঁড়াল দু'জন অসামরিক ব্যক্তি, দু'জনেই ইংরেজ। কিন্তু কোন মহিলা নেই। যাই হোক, একজন অপরিচিত লোকের মুখোমুখি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগে খানসামারা আবার একটি খাম এনে দিল। আরেকটি বেতারবার্তা। ওয়ার্ডেন বললেন, 'আপনি বরং এটি পড়ুন। আমাদের টেলিগ্রাফ প্রতিনিধি পার্থেনায়ের কাছ থেকে এটি এসেছে।'

আমি পড়লাম '... আমার কোন নির্দিষ্টকোণ সারকেটিস সিনিকার নেই সম্ভোষজনক নেট নেবার জন্য। কয়েক সপ্তাহের জন্যে কাউকে ধার দিতে পারলে খুব বাধিত হব।'

ওয়ার্ডেন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি এই ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?'

আমি দ্বিধাহীন সঙ্কোচে উত্তর দিলাম, 'আমার মনে হয় আমি তাকে দিতে পারি, তবে তিনি যদি একজন পুরুষ হন।'

'এতে কি কোন অসুবিধে হবে? আমার মনে হয় তিনি অবশ্যই একজন মহিলা হবেন।'

এখন দাঁড়াল তিনজন অসামরিক ব্যক্তি, তাদের মধ্যে একজন মহিলা।

সপ্তাহটি বিমান কনসে সেদিন জেনারেলের আসবাওয়া ছিল বিরাট। কমান্ডার জেনারেল ওয়ার্ডেন ডেইজী ফ্রেকশিয়ারকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। মেয়েটি লম্বা এবং সুশ্রী, বয়স ২০ বছর। সে আমাকে বলল যে এর আগে সে কখনো বিমানে চড়েনি। আরও বলল, 'কিন্তু আমি আশা করি যে আমি বেঁচে যাব।'

তার প্রত্যাশী মনকে আরও যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করার এবং আমি ব্লাগুরের উপর নিয়ে ঘরে আসা কনফরেন্স টেবিল বাতাসে কাঁপাতে লাগলাম।

আমাদের ক্যাপ্টেন জেনারেল নিজের জন ক্যাম্পবেলকে তেমন প্রসন্ন দেখাল না।

'সুপ্রভাত ক্যাম্পবেল, আবহাওয়া সম্পর্কে কোন পূর্বাভাস পেয়েছেন কি?'

'খুব খারাপ নয় মহাশয়। টেমিক্স থেকে প্রায় ১০০ মাইল দূরে উঁচু কিউমুলাস অনেক পরিমণে থাকার সম্ভাবনা। হয়ত একটা প্রাচীরের মত। বিমানের উড়ান প্রায় ছয় ঘণ্টার মত হওয়া উচিত।'

এইসব কথা হবার পর আমরা বিমানে উঠলাম এবং একটু পরেই সিগন্যাল আলোকসঙ্কেতের দ্বারা সবাই পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলল টেমিক্সের উদ্দেশ্যে আমরা — মৃদু ঢেউ তুলে। ডিটি বলেছিলেন এই ঘটনাটি ঘটবে সন্ধ্যাকালের একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে। অবশ্য জেনারেল একটু পরেই আমাদের টেমিক্সতে পৌঁছে যাওয়া উচিত। আমি ভীষণ ক্লান্ত ছিলাম, একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

আমি বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারিনি কারণ আমাদের ফোর-ব্যারের ইঞ্জিনের আওয়াজ খুব তেজে গেল। আমার ক্যাপ্টেনের যেন হুঁশ হতে লাগল। আমরা নিশ্চয়ই উপরে উঠেছি। বিমানের পাঁয়তাল্লিশ পাখা কুয়াশার ভেতর কয়েক ইঞ্চি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ সেখা-ফোঁ করে কয়েকটি বিমানের সামনের দিকে সোজা নিচে দিয়ে উড়ে গেল।

ডেইজী এবং সেলুন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মনে হল কমান্ডার জেনারেল ওয়ার্ডেনের ঘাবড়াই হচ্ছে। তিনি বললেন যে তার মাথার প্রচণ্ড যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দিয়েছে। একটু পরেই বাইরের আলো আরো উজ্জ্বল হল। আমরা সূর্যের প্রখর আলোর মধ্য দিয়ে ছুটে চলেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে বিমানের উজ্জ্বল ধাতব ডানায় রক্তের একটা হালকা আস্তরণ লেগে রয়েছে।

ক্যাপ্টেন পিছনে এলেন এবং মৃদুস্বরে আমাকে বললেন, 'আমাদের আরও উপরে থাকতে হবে। এইভাবে চললে আমরা আমরা খুব তাড়াতাড়ি মধ্যে পড়ব।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি তা লক্ষ্য করেছি। আমরা এখন নিশ্চয়ই বেশ উপরে রয়েছি।'

'সতেরো হাজার।'

'বিমানে কোন অক্সিজেন নেই?'

'না।'

কিছুক্ষণ পরে ক্যাপ্টেন আবার পিছনে এলেন। 'এর জিভা নিয়ে যেতে আরও একবার আমাদের অসুবিধায় পড়তে হবে মহাশয়। মেঘের মাথা আরও উঁচু এবং আমরা এখন আঠারো হাজারে আছি। আমার মনে হচ্ছে যে বিমান কিছুটা কাঁপুনির মধ্যে পড়বে।'

এরপর আমরা ঘূর্ণির মত কয়েক কুয়াশার মধ্যে দিয়ে পড়লাম। আমি শুনতে পেলাম বাকের ট্রান্সমিটারের মেকিনের পরে শব্দ করে আছড়ে পড়ছে। বিমানের প্রপেলারের পাখায় লেগে এইগুলি ছিটকে আসছিল। অন্ধকার হয়ে গেল। আমার ঘড়িতে বাজল ১১-২০ — টেমিক্সর সময় তখন ১২.২০। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে চলবে? ঝুমঝুমের শেষ যে দেখেনি। ডিটি নিশ্চয়ই বলেছিলেন যে ঝুমঝুম থাকবে।

আমরা একবার চারদিকের কুয়াশার হুঁশ একলাফে সরে গেল। সিগন্যাল আলো যেন শূন্যে একটা বাঁকা মেঘের উঁচু মেঘের মাথার উপর গড়ানোর মধ্যে দিয়ে পড়ল।

আমাদের কানের উপর চাপ অনুভব করার এবং ঘন ঘন ঢোকগেলা হতে থাকায় মনে হল যে আমরা আমার এত উপরে উঠেছি যেখানে অক্সিজেন খুব কম। কমান্ডার জেনারেল এবং ডেইজী অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং অক্সিজেনের অভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। আমার আশঙ্কা হল আমার জীবনের জন্য। এই অবস্থায় আমরা বেশিক্ষণ বেঁচে থাকতে পারবেন না।

ক্যাপ্টেন আবার পিছনে এলেন। ক্লান্তিতে এবং দুশ্চিন্তায় তার মুখ কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। কিন্তু মুখের হাসি এবং আত্মবিশ্বাস তিনি বজায় রেখেছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমরা কি অক্সিজেনের পক্ষে সব থেকে বেশি উচ্চতায় রয়েছি না। আমরা কি এখন কিছুটা নেমে আসতে পারি না উচ্চতার ভার পাবার জন্য। আমাদের জ্বালানি নিশ্চয়ই কমে এসেছে। কিন্তু ক্যাপ্টেন, আপনি যেমন ভাল বুঝবেন, সেইরকমই করবেন। আমি আশা করি যে আমরা ঠিক দেখিয়ে আসব।' সত্যি, আমি নিজের মনে ভাবলাম, আমরা আছড়ে পড়ব কাঁকড়ার ভরা পাথুরে সমুদ্রতটে।

ক্যাপ্টেন হাসলেন এবং বললেন যে তিনি টেমিক্সর চারদিকে নিয়ে

যাবেন।

আমরা নিচে নামতে লাগলাম। আমার ওপর হল জোরে নিচে নামা। বাঁয়ে পাওয়া, উপরে ওঠা এবং একবারে চলতে থাকল একনাগাড়ে, আরও দীর্ঘ চার ঘণ্টা। আমরা কাঁকুনি খেয়ে নামতে নামতে চলে এলাম উঁচু প্রস্তরণের মত ঝিনঝিনে নিবাস মেঘের ফেনা ঠেলে তলদেশে। কি অন্ধকার হয়ে গেল। আমি তখন শুনতে পেলাম সিস্টার আলোর আঘাত পাওয়া ব্লাক ব্লাক পর। ঝাঁক। আমরা প্রপেলারের উপর ঝাঁক। আমার হৃদয় করে এর বাইরে চলে এলাম — কিন্তু অন্য ঝিনুকে। নিচে যে যে নীল নিস্তেজ মত ঝিনিন কুঁচে উঠেছে তা হল সমুদ্রের ঢেউ।

এখন আমরা জোরে তুষারপাত হতে লাগল। সময় এখন কত? সাড়ে তিনটা।

সমুদ্র এবং তুষার। এইরকমই হবে ডিটার বলেছিলেন। আমাদের নিচে দেখতে পেলাম একটি কালো পাহাড়ের উপর তুষারের চিহ্ন। পাহাড়ের পাদদেশে সাদা ঢেউ ভেঙে আছড়ে পড়ছে, যেন ফেনে কুঁসছে।

এই মুহূর্তগুলি ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ অভিজ্ঞতা। মনে হল সিস্টার আর বেশিক্ষণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। আমরা সমুদ্রের তীরেখা অনুসরণ করে এগোলাম এবং কিছুক্ষণ পরে একটি উপসাগরের উপর এলাম। সেখানে পাথুরে সৈকতের কাছে তুষারে ঢাকা জেগেছিল একটি গ্রাম আছে। সৈকতটি ৩০০ গজের কম, কাঁকরে আচ্ছাদিত এবং তার উপর ইতস্তত ছড়ানো পাথরখণ্ড। এর তিন প্রত্যেক কোণে রয়েছে উঁচু বালুর পর্বত। অবতরণের পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়।

আবার আমরা খাড়া পাহাড় এবং সমুদ্রের ঢেউ অনুসরণ করে চলে এলাম মেঘ ও সাগরের মাঝখানে অনন্তীর এক সমান্তরাল শূন্যস্থানে যা বহুতরঙ্গিত তুষারের তলা তৈরি হয়ে আছে। টেকিওর সময় অনুযায়ী আমার ঘড়িতে এখন চারটে থেকে পাঁচ মিনিট। এইরকম একটি দিনে পাঁচটা বাজার একটু পরেই অন্ধকার নেমে আসবে।

এরপর আমরা খাড়া পাহাড়টিকে হারিয়ে ফেললাম, আমার তার দেখা পেলাম। এর যেন আর শেষ নেই। এক খণ্ড সমুদ্রতট পাওয়া যাচ্ছে না যেখানে জরুরি অবতরণ করা যায়।

হঠাৎ খাড়া পাহাড়টি শেষ হল। আলোর উজ্জ্বতি দেখা গেল। এখানে একটি উপসাগর আছে। তটের কাছে তুষারে ঢাকা একটি গ্রাম। সৈকতটি পাথুরে। কাঁকরে আচ্ছাদিত। এক ঘণ্টা বা তারও বেশি আগে এই গ্রাম এবং উপসাগরটি আমরা দেখেছিলাম। আমরা নিশ্চয়ই একটি দ্বীপের চারদিকে সম্পূর্ণ ঘুরে বেরিয়েছি এবং আবার ফিরে এসেছি।

আমি আমার সিটের বাঁধন খুলে সামনের কম্পার্টমেন্টের দিকে গেলাম। আমাদের নেভিগেটর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আলেকজান্ডারকে বললাম, 'আপনার ম্যাপটা একটু দেখি।'

মূল ভূখণ্ড থেকে ৪০ মাইল দূরে হাতের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটি দ্বীপ আছে। তার নাম নোভো। আমি বললাম, 'এটাই সেই দ্বীপ এবং এই গ্রামটি নিশ্চয়ই টাকটি।'

আলেকজান্ডার মাথা নাড়লেন এবং সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। তারপর তিনি বললেন, 'মূল ভূখণ্ডের অবস্থানের সবচেয়ে কাছে যে বিমানঘাঁটি তা হল টেকিও। এখান থেকে তার দূরত্ব প্রায় ২০০ মাইল। অন্ধকারের মধ্যে পাহাড় পর্বত এবং মেঘের উপর দিয়ে যেতে হবে। তেমন ভাল নয়।'

আমি উত্তর দিলাম, 'এবং জ্বালানিও নেই।'

নিচে সমুদ্রের ধারে এই কাঁকরে ঢাকা পাথুরে সৈকতটিই হল আমাদের একমাত্র সম্ভাব্য গন্তব্যস্থল —ডিক যা টিটার বলেছিলেন — তুষার ঝড়ের মধ্যে সম্ভাবনার।

আমি অ্যাল্পলেনের কাছে গেলাম। তিনি আমার দিকে হাসিমুখে তাকালেন এবং চলতের সঙ্গে বললেন, 'ভয়াল অবস্থা, মহান। আপনি যদি সম্মতি দেন তাহলে আমাদের এই ঘুর তটের উপর অবশ্যই অবতরণ করতে হবে। এর জন্য কাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই। মেঘ খুব নিচুতে আছে এবং হাওয়াও খুব প্রবল।

'হ্যাঁ।'

'আপনি কিভাবে নামতে চান, চাকাগুলি তুলে নিয়ে অথবা নামিয়ে?'

আমি বললাম, 'আমার মনে হয় আপনি যদি চাকাগুলি তুলে নেন এবং বিমানের পেটের উপর দিয়ে অবতরণ করেন তাহলে আপনি গড়িয়ে যাবেন চমৎকার এবং অনেকখানি। কিন্তু যদি ঐগুলি নিচে থাকে এবং বড় পাথরগুলির উপর ধাক্কা না খায় তাহলে আমরা অবশ্যই উল্টে যাব। তার চাকাগুলি নামানো অবস্থায় তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত থেকে গতি কমতে শুরু হবে তখন যদি ধাক্কাদায় চাকা তুলে নেওয়া যায় তাহলে কেমন হয়?'

অ্যাল্পলেন সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন এবং জোরে দু'হাত দিয়ে কন্ট্রোল করায় ধরলেন। তার শরীর থেকে ঘাম ঝরছিল।

বিমান কর্মিদের এবং আমার সহীদের শরীর গরমের জন্য আমার পক্ষে যতটা করা সম্ভব তার জন্য আমি পিছনে চলে এলাম। ক্যাপ্টেন ছাড়া অন্য সকলেরই কেবিনে চলে আসা উচিত ছিল বিমানের শেষ দিকের দিকে থাকে। আমরা সেখানে বেশি নিরাপদে থাকব এবং অক্সিজেন বোতল আনতে পারব। সবাইকে নিজেদের ভাল করে বেঁধে নিতে হবে যাতে কেউ ছিটকে না যায় এবং তখন অক্সিজেন পরি দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

এইভাবে মৃত্যুর সঙ্গে বিচিত্র এই খেলার জন্য আমি অনেক সরঞ্জামও করে তৈরি হওয়া দেখতে লাগলাম। আমি নিজে কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম যে আমি মরতেই যাচ্ছি।

যখন আমরা তৈরি হলাম তখন দু'জন বিমানকর্মি ঘুরতে ঘুরতে পিছনে এল দরজা খোলার জন্য যাতে আমরা ভিতরে আটকে না থাকি। হঠাৎ একটা গর্জনের সঙ্গে তুষারে পরিপূর্ণ বাতাস হুড়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পরবর্তী কয়েক মিনিটে কি ঘটতে যাচ্ছে তার ছবি গত ২৪ ঘণ্টা ধরে আমার মনের মধ্যে ছিল। এখন আমি শুনতে পেলাম বাতাসের গর্জনের সঙ্গে চাকাগুলি নামানোর হিম ঘুইঁচ শব্দ। একবার সিস্টার আলো মাথা নিচের দিকে রেখে খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে চলে এল জরুরী অবতরণের জন্য। ইঞ্জিনের গর্জন স্তিমিত হল। আমি ঘুরে ওপরেনের দিকে তাকালাম। তিনি ক্লান্তিতে এবং ঘামে আপ্লুত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। তার চোখ দুটি ছিল বোজা। আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পেলাম না।

নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম কাঁকরে ঢাকা ঝাঁটুনি আর

উপর ছড়িয়ে আছে বহুদূর প্রসারিত এবং শেষদিকে হয়েছে চূড়ার মত একটি পাহাড়। আমরা সোজা দিকে এগোলাম। ইঞ্জিনের শব্দ স্তব্ধ হল।

এখন আমরা সেই মুহূর্তের জন্য তৈরী।

থেকে থেকে একটা কলকল শব্দ হতে লাগল। চলাতলি প্রবলগতিতে কাঁকরে ঢাকা ভটভূমি মৃদু শব্দে স্পর্শ করল। শব্দ ক্রমেই বেশি রকম কর্কশ হতে লাগল। গতি কমানো শুরু হল।

আমি প্রার্থনা করলাম চলাতলি ভুলে নেওয়া হোক। ক্যাপ্টেন তাই করলেন। নিউট্রন জ্বান খুলে দিয়ে পড়ে যেতে লাগল।

ব্যাং ... ব্যাং। কড়াকড় শব্দ। ডিসলজি খাওয়া শুরু হল। পেটে টান লাগল। থেমে গেল। ঝাড়ুদারা নামল।

ওপরের ডাল সিট এবং সবকিছু নিয়ে হিটিতে এসে আমরা মাথার পিছন দিকে আঘাত করলাম।

গতি স্তব্ধ হল। নিউট্রন জ্বান যাবার মত নিশ্চল হল।

একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। এরপর ভটভূমির উপর সমুদ্রের ঢেউগুলির হিস্ হিস্ শব্দ করে আছড়ে পড়ার শব্দ শোনা যেতে লাগল। তার সঙ্গে ঝাউবনের বাঁশির মত শব্দ।

বাঁধন খুলতে খুলতে আমরা হাসতে লাগলাম। ক্যাপ্টেন যখন পিছনের দিকে আসছিলেন তখন আমি তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমরা করমর্দনে মিলিত হলাম এবং পরস্পরের অভিনন্দন করলাম।

সেই ঘরে আমরা চারজনে ছোট্ট সভা বসালাম। আমি যখন ক্যাপ্টেনের বিছানার ওপর পড়লাম তখন ভাবলাম যে ক্যাপ্টেনের ডিউটি সত্যই আমাকে মৃত দেখেছিলেন কিনা। আমি ঠিক করলাম যে ডিউটি ঘরে কি দেখেছিলেন তা জানা যাবার আগেই আমি তাকে চিঠি লিখব।

কয়েক মাস পরে আমি একটি উত্তর পেলাম।

আমি আপনার বিমান দুর্ঘটনার কথা জেনে খুব আতঙ্কিত। আমাদের সাক্ষাতের কথা আমার মনে আছে। কিন্তু সেই ঘণ্টার বিষয় আমার অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে। না, আমি বলতে পারি না যে আমি আপনাকে সত্যই মৃত অবস্থায় দেখেছিলাম। কিন্তু আমি অবশ্যই ভেবেছিলাম যে দুর্ঘটনায় সকলেরই মৃত্যু হয়েছে। আমি আনন্দিত যে সেরকম হয়নি।

পরেরবার আমার বিমান দুর্ঘটনার সময় আমি আগে থাকতে কোন খবর জানতে চাই না। এতে বিমানে ভ্রমণের আনন্দ একেবারেই নষ্ট হয়ে যায়।

□

"কেবল শুধু পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জ দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা বলে না। শিক্ষা বলিতে প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায় যাহা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে।" — ভগ্নী নিবেদিতা

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

বাছানড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং - ১৫ এইচ জি তাং ১৭-৭-৫৩

গ্রাম ও পোঃ - বাছানড়ি ; ব্লক আরামবাগ

জেলা : হুগলি

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, চাষের সার, বন্ধকি দ্রব্য এবং আমানত ব্যবসার স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

অমরেন্দ্রনাথ দে
সভাপতি

পঞ্চানন বেরেন
সম্পাদক

অনন্তমোহন মণ্ডল
ম্যানেজার

With Best Compliments from

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Ltd.

ESTD. 1923
11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone No. : 248-9413, 248-2821, 210-4122, Telegram : SELF HELP /69

1. A premier Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
2. Provides banking facilities to members and also to Public.
3. All deposits Covered under Deposit Insurance Act.
4. Nomination under Section 45 ZA of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
5. Minor Accounts allowed as Banking Rules.
6. Premature encashment as per Banking Rules.
7. We give Loan against NSC / KVP / UNIT '64 / Fixed Deposits / Recurring Deposit etc. on easy terms & conditions.
8. Term Deposits And Re-investment Plan.
9. Rates of Interest on various Deposits as per RBI guidelines (as applicable to Co-operative Societies Banks.)
10. We allow more interest than commercial banks as per RBI guidelines as applicable to the Co-operative Banks.
11. Join with our PLATINUM JUBILEE SPECIAL SCHEME.
12. Double your money in 66 months. Annualised yield 17.39%.
13. Triple your money in 108 months. Annualised yield 22.22%

Ajoy Sankar Mitra
Managing Director

Asim Kumar Basu
Chairman

বাঙালি কি খেতে ভালবাসে ..... মাছ

বাঙালি কোথায় যেতে পছন্দ করে ..... পাহাড়ে অথবা সাগরে

তাই

বাঙালির আপনজন [redacted] নিবেদন করছে

ভ্রমণ বিভাগ

বেনফিসের ট্যুরিস্ট লজগুলি পাবেন
নিচের জায়গাগুলিতে
শঙ্করপুর (কিনারা)
[illegible]
দার্জিলিং
ভারতভ্রাতবাস

খাদ্য তালিকা

বেনফিসের স্টল এবং মোবাইল ভ্যানগুলিতে পাবেন
ফিস ফ্রাই ★ ফিস বাটার ফ্রাই ★ ফিস রোল ★ ফিস সিঙ্গাড়া
★ প্রণ পকোড়া ★ ফিস ফিঙ্গার ★ ফিস টিকিয়া ★ চিলি ফিস
★ ফিস অমলেট ★ চিলি কাঁকড়া ★ ফিস কবিরাজি ★ ভপসে ফ্রাই
★ ফিস বিরিয়ানি ★ ভাপা বা সর্ষে ইলিশ

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন
ফোন : ৩৩৪-৪১৩১
সি-১৬১/১, বি আই সি রোড (চতুর্থ তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪

বেনফিস
ডিপার্টমেন্ট অফ ফিশারিজ
গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

পাহাড় কিংবা সমুদ্রে অথবা লাল মাটির বীরভূমে

প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসুন আমাদের

হলিডে হোমে

দার্জিলিং (৩টি ঘর) ✤ দিঘা (২টি ঘর)
পুরী (৩টি ঘর) ✤ শান্তিনিকেতন (২টি ঘর)
এছাড়া শীঘ্রই হলিডে হোম চালু হবে
কলকাতা ✤ গ্যাংটক

যোগাযোগ : ২২৮-০৮৩৭

এন টি সি (ডব্লিউ এ বি অ্যান্ড ও) এম্প্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৭, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-১৩

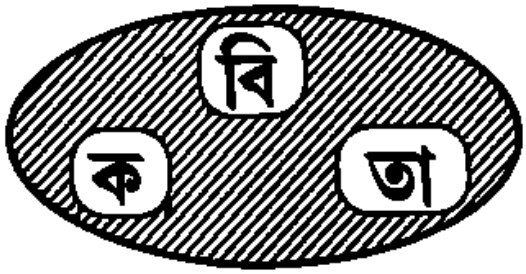

এই আঁধারে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আকাশগঙ্গা ঢেউ তুলে কয়
দুঃখের কালস্রোতি,
আয় রাতে সে-ই আঁধার থেকে
আঁধারে যেয় পড়ি।
এই আঁধারের কী অংশর্ব
কেউ কি বলে দেবে,
আকাশ ছুঁয়ে যখন হাজার
জোনাক জ্বলে-নেবে?
কৃষ্ণ চতুর্দশীর রাত্রে
একলা জানালার
দাঁড়িয়ে দেখি অন্ধকারে
প্রহর ঘরে যায়।
ওইতলি কি জোনাক, নাকি
আকাশ-ভরা তারা,
প্রশ্ন করে উত্তর কিছু নেই,
ঘুমিয়ে আছে পাড়া।

❑

পর্যটন

মহুয়া দাশগুপ্ত

আমি তো মৃত্যুকে নয়
তোমাকেই ভালোবেসে
মৃত্যুকে এড়িয়ে চলে গেছি
অবেলার নদী সমুদ্রের দিকে
যেখানে জীবন
জলে ভাসে
বাউয়ের বাতাসে
নৌকো ছুটে
ঢেউয়ের মাথার চড়ে
সিঁড়ি ভেঙে সহস্রফণ ভেঙের আকাশে
অতলে নেমে আসে

আমি অন্ধকার নয়
তোমাকেই ভালোবেসে
আলোর পাহাড়ে যাই
যেখানে অফুরন্ত দিন
কালো নীলতার কোনো প্রতিচ্ছবি
কোথাও রাখেনি

মৃত্যু নয় অন্ধকার নয়
আমি তোমাকেই ভালোবেসে
টানেল পেরিয়ে যাই
পৌঁছে যাই
সবুজ সবের কাছে এবং তখন
নিঃশব্দের মৃদু সুর বাজতে থাকে
তোমার ভিতরে

❑

এ গান তার বড়ো প্রয়োজন

কৃষ্ণ ধর

হৃদয়ের অলিন্দে এখনো কিছু গান জেগে আছে
সব ধুলো তার কান্না ছাপিয়ে তার শ্রেষ্ঠটুকু টের পাওয়া যায়
নিসর্গের সঙ্গে মিশে থাকা মেঘ, ছায়া নদী তা জানে
গানের চাপা দেওয়া পঙ্‌ক্তিগুলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরে ও বাইরে।

সব কিছু এখনো হারায়নি জেনে তাই জেগে থাকা
ঘুম তাড়িয়ে সে তাকে ডাক দিয়ে যাবে ভোরবেলা
তখন ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে
আরেকটি দিনের মুখোমুখি হওয়া।

হয়তো সবটাই নিজের মনকে তোলাবার ভাবনা
শেষটা কি হবে তা কে বলে দিতে যাবে?
ভবিষ্যতের গণক আশেপাশে কেউ নেই
আপাতত এটা জেনেই নিমজ্জন পাওয়ায় বসে থাকা।

ভেতরে ভেতরে গান চলেছে যেন মুক্তধারা অবিরল
নিজস্ব কোনো সুখদুঃখের কথা নয়
যেন গোটা জাতিসত্তার বিষাদ ও ব্যর্থতার আর্তনাদ
সমস্ত অস্তিত্ব নিঙড়ে করে ছড়িয়ে পড়ছে ভূমণ্ডলময়
গানের সঙ্গে তা মিশে একাকার হয়ে, জলে, শস্যভূমিতে

বিষুবরেখা বরাবর গানের পঙ্‌ক্তিগুলো হাত ধরাধরি করে
পৃথিবীটাকে আদরে জড়াতে চাইছে
বলা ভুলতে এ গান তার বড়ো প্রয়োজন।

❑

উদ্দেশ্যহীনতা

আনন্দ ঘোষ হাজরা

এ এলায় তপস্যার সীমা পার হয়ে
আরক্ত কঠিন মেঘে সজ্জিত শেষে
এ কোন উদয়সূর্য কখন জ্বালবে এই ভোর।
এই প্রতীক্ষায় আমরা দক্ষ যজ্ঞ কাল পাত্র
কোনো এক ঘাসফুল পাহাড়ে এসে সমাধিমন্দির
দেখে নিই নিরন্নজর্জর মানুষের ;
এবং সেখেই খুব অভিভূত হয়ে ভাবি
কোনো এক রমণীর কথা।
সে হয়তো অপেক্ষায় ছিল তার পূরবের জন্য বহুকাল
সে হয়তো বুনোফুল খোঁপায় পরেছে
তার ভালোবাসা জানাবার ভাষা
আর কিছু নেই বলে ; কিন্তু হয়তো ছিল তারা
আমরা এখন তার চিহ্ন কিছু বাকি নেই ব'লে
বৃথাই আক্ষেপ করি।

এসব অনাদি ভালোবাসা প্রেম, এই সব কথা
এইসব প্রত্নতাত্ত্বিকতা আর প্রকৃতির গূঢ় নিস্তব্ধতা
অথচ এ মহাবিশ্বেতলতা, পরিক্রমমান —
ভয়াবহ, প্রসারণশীল
সময়ের নিরেট বন্ধন হোক আরো দৃঢ় কঠিন বন্ধনে
আমরা নিক্ষিপ্ত হই।

কবে শুরু শেষহীন আরক্ত এ তপস্যার কাল?
ফুলে সেই পথরেখা, ফুলে সেই নিরক্ষরী মেঘ
আমাদের সন্ধানের কথা।

অথচ, আমরা কি নিজেরাই সত্যিই উদ্দেশ্যহীনতা?

❑

একা

নজরুল ইসলাম

অন্যদিনের সমান দিন কেটে যায়,
কিছুটা ব্যস্ততা।
তারপর রাত গভীর হয়।
গায় থেকে ওষুধের পাতার মত
ব্যস্ততা ঝরে পড়ে।
এক সময়
সব কাজও শেষ হয়।

ঘরের সিঁড়িতে পা দিতে গিয়ে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াই।
দেখি,
বিবর্ণ হলদ নিয়ে
নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি
আমি একাই।
কার যেন থাকার কথা ছিল।
সে নাই।

সত্যই কি কথা ছিল?
কথা হয়েছিল কোন দিন?
কোন মধুর লগনে
সে কথা নিয়েছিল,
অথবা তার অনুক মন?
বোধ হয়, না!

স্বপ্ন হয়ে এসেছিল।
স্বপ্ন ছুঁয়েই চলে গেছে।
ব্যস্ততার চাপে
কথা বলার হয়নি সময়।

❑

অভিমান

প্রত্যুষকুমার ঘোষ

অন্যকে ভাল ও ক্ষমা দিতে পারো,
কিন্তু তুমি কোথায় দাঁড়াবে।
আকাশ আরো দূরে সরে গেলে চাঁদ তার কারুকার্য
বাবে, এই নগ্ন গাছ মাটি ছেড়ে উঠে যাবে অনেক ওপরে।
তুমি জল হবে। কিংবা নদী। ঢেউয়ের আঙুলি মেখে
সমুদ্রের অভিমানকে।
মুখুল শুওয়ারা উঠে, নখর খেয়ারা ছুঁয়ে যেতে চায়।
অভিমানী বালকের মতো দাঁড়িয়েছে এই সৈকত, নিদারুণ একা,
তাকে কে ভালোবাসবে, কাউকে পাবার আশা করে তাকে।

ঝড় উঠলে উত্তাল তার মুখে যাবে।
ছবিরেখার মেঘেতে ছাপান আঁকা সোনালি কারুকাজ,
দেয়ালে মাতিসের ছবি, তলায়ি ডুবছে আকাশের জলে,
সূর্য উঠছে ভিজে বালির দর্পণে।
তোমার অসুখ সেরে গেছে জেনে আমি খুশি।
ব্রেইল অক্ষরের মতো তোমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেবো।
ব্যস্ত দুনিকেই ঘর, দক্ষিণে এবং বিপরীতে।
অবশ্যম্ভাবী হাঁটি সমান্তরাল, দূরত্বে ও আড়ালে —
অভিমানী বালক ছুঁতে থাকে, আজন্ম কাঙাল।

❑

ঢেউল

বীরেন সাহা

ঢেলকুড়ুলিতে রেখেছি তোমাকে
আজিল উঠোন ছড়িয়ে,
ধূপদীপে ছায়ার তরল
ত্রৈমী তুলির টানে —
মাটি খুব কারুকার্য আছে,
তবু তুমি সুখী নও?
নীলাপদ্ম অবয়বে ম্লান
হাওয়ায় অনে ভিজেদেশি ঘ্রাণ,
এমন গভীর সময়ে জানি জানি
বড় দূর সুখের ঠিকানা
খুব শত নির্জন দীপ মনে
অনেক বেদনা হাতছানি ভিড় করে ডেকে
আছই একা —
সংগ্রাম করতে করতে মাঝ,
ঢেলকুড়ুলিতে তুমি একা নও
বন্দী আমিও
মৃত্যু ও জীবন ঢেউলে
খুঁজি আদিম বিপ্লবকারী —
আনন্দের পরিভাষা।

❑

এক নড়বড়ে টেবিল

শতদ্রুনন্দন মুখোপাধ্যায়

এই নড়বড়ে টেবিল
ঘুণে একটা পা খেয়ে নেয়
ভাবটা কামড়ে যেমন
একটা পা-কাটা লোক জল খেতে উঠে আসে
আমরা কি সে-রকম নই
[illegible]-টানের মোড়াগুলি-সোফা
ওপরের দেবা আমরা সব জমে
কলের মাথা ঘুরিয়ে বিরিয়ে যাবে
এ-জমির রিসীমানা কিছুতে ছাড়ে না ...

তিনি পা কামড়ে, সোফে পড়া ছেড়ে নিয়ে
ঘরের বিভিন্ন বাঁকিয়া আলো-ইটিয়ে
এইসব নিয়ে আমরা একরকম আছি
ঘুরপাকি হয়, সেরে উঠি
মোকদ্দমাটাই ভয়ের আবহাওয়া
এত সব কালে সেলেও সব ও একই আছে
যে কলমের ব্রত নিয়ে আসে
তাকেই কলমটা আমরা
আমরা আসব নামব বিশ্বজনীনতায়
সকলকে আপন করে নিই
আছে! এর এর সি কি কাজকারবারে ব্রত সেরে
ফিরে নড়বড়ে টেবিল
সর্বনাই কাঁপছে এবং কাঁপছে ...

❑

সেই দিন

কিরণশঙ্কর সৈন্য

সেই পুরনো আশিস এখনও ঘিরিয়ে রাখে
আজন পুড়িয়ে সেই যজ্ঞ-সংস্কার আপনজন,
ছোটবড় নানা পাথরের ভারে পিষ্ট হয়
নিজের নিজের সীমার।

অনুপরি আসা আছে বিভিন্ন মুলিন,
এখন নিজের পুত্র সততা ছড়িয়ে দেয়, ভেঙে
ফেলে, কিছুতেই নয় কাজকারি
আপন পরিতে পরিচিত স্বার্থপর নিয়তির মৌজাত।

তুমি উদাসীন মুলিতে পথে-ঘাটে-আসরে
নিশীথে দৃষ্টাই তবু নিয়ে যাও,
হাসনুহা ফেতে থাকো খানা-খন্দ অলিতে-গলিতে,
অনর্থক মুহূর্তত পথিকের চোখে পরাহি সূর্য
সমুদ্র-বাতাস খেলা করে

হায়, ঘরের মানি, নতুন দিনের ...

❑

ভ্রমণকাহিনী

গৌতম রায়রা

পাঠের ওপর আমি অপরিসীম।

পঠন-পাঠনের থেকে এসে আমি অবসর নেবে
নেবে আমি সম্পূর্ণরূপে অনুভব, আমার ভিতর
কতোটা কুসুম ভিতর মৌল অভিজ্ঞান।

দিন আমি চলে যায় নিজের ভিতর
রাত আমি চলে যায় রাতের ভিতর
আমি খেলাচলেলা আলোছায়ার নিয়ে
চলে যাই চলের টেবিলে
দেখি, নিশ্চলকমনে কেমন করে খেয়ে আছে
মুক্তাক্ষরিণী
মেয়ে আমে আমার পরীক্ষা।

❑

কে কোথায় নিরুদ্দেশ

অপরাজিতা দেবী

চারিদিকে যন ঘুমানোর আয়োজন —
অবসন্ন ধরা —
অন্ধকারের গৌঢ় আবেশিনী ছোঁয়
ক্লান্তি প্রতীক্ষার অধীর —

গৌরব ছিন্ন কলাপের গৌঢ় আবেশিনী
পথ অবসন্ন —
দৃষ্টি নিষ্প্রভ
প্রতি পদক্ষেপে —

'সকলের উর্ধ্বে আলোর সন্ধানে
প্রজ্বলিত আলোর সন্ধানী
ঘরে ঘরে হাঁক দিয়ে ফেরে
দৃপ্তশিখ মশাল খানখানি
কলাপেক্ষীহীন আবেশিনী ফেলে ফেরে
ছড়িয়ে পড়ে
ঘুমানো আকাশে

অসহায়, নিরাশ্রয় মানুষের
গোপন অন্তরে
শঙ্কাতীত অনিশ্চিত আর্তনাদ
কেঁদে ওঠে
'আর না আর নয়'
এখন আমার পালা —

ঘরে-ঘরে এখনো
গৌঢ় কলাপীর আসন নিয়ে দাঁড়াই —
আকাশে বাতাসে অনুভূতিহীন নিস্তব্ধ
সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিটি হয়ে ফেরে
ফেরে — ঘরে ঘরে ধ্বনির অনুরণনের মত
আজ আমার, সে ফেরারী
এখনো হয়নি নিরুদ্দেশ
ওঠে - আসে - ফেরে আবার

ঘুমে অবিশ্বাস আমার মুখ চিরে
প্রত্যুষের সূর্যোদয়কে
বিশ্বিত সূর্যোদয়
আকাশে উদ্ভাসিত।

এই ফেরা আমার ফেরে ফেরে ঘুমে যাও অবসন্ন —
প্রজ্বলিত মশাল
দূরন্ত কণ্টকিত বিশ্বিপথ
অতিক্রম করে
প্রজ্বলিত কর —
ছড়িয়ে যাও আলোর কণা
সমুদ্র উদ্যমে
মন আকাশের বুকে। ❑

রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়

কমলাকর দাশগুপ্ত

তুমি কেমন যেন নিজস্ব নিয়মে
আকাশ মাখো

আকাশের ওপরে মুখ মেলে নিয়ে
কেমন যেন আকাশ হয়ে যাও

তোমার ওষ্ঠাধীন চোখেতে
আকাশ আনা যেন উড়ে যায়
অন্য আকাশে
মেঘ থেকে মেঘে
যেখানে রয়েছেন স্বপ্নালীন আকাশগঙ্গা
সমুদ্র হয়ে ঢেউ তোলে বুকে

তুমি নিজস্ব নিয়মে আকাশে
হে নারী, আকাশ সমুদ্র সম্মিলিত
কেমন যেন একাকার হয়ে যাও

নিজস্ব নিয়মে শুধু তুমি
আকাশে চোখ রাখলে
নীলের অরূপ তুমি
রৌদ্রে জ্যোৎস্নায়
নীলাকাশ ছুঁয়ে থাক নীলাধীন
ঘরের আকাশ।

❑

অনেক কথা বাকি

ওঙ্কার বন্দ্যোপাধ্যায়

আরও কি আছে কোন কথা বাকি
জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে
যা আজও বলা হয়নি?
না, যেভাবে আর কোন কথা বাকি নেই,
তবু জীবন আজও রহস্যময়
চিরসবুজ অরণ্যের মত
অথবা কখনও কোন স্বর্ণাভ-সুরভি মেয়ে
হাঁটতে থাকা একলা বৃক্ষের মত
কিংবা যৌবনমৃত্ত বিদ্যুৎগতির ফেরারিনেয়ে
মাঠ পাশিয়ে, বেড়াতে বেড়াতে বেড়াতে
শেষ মুহূর্তে সাইকোয়ানিক এশিলেশিতে আক্রান্ত হয়ে
সারা বিশ্বের হৃদপিণ্ড থামিয়ে
পরাজিত শেকসপিয়র ব্রাজিলকে
অতলান্তিকের নির্জন বালুকাবেলায়
বিসর্জন দিয়ে হঠাৎ বিশ্বজয়ীর ছন্দে উঠে
জিনেদিন জিদান।

ব্রাজিলের মাটিতে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
কিংবা সেই মহা তেজস্বিনী যোদ্ধা তব আর্ক।
আহা জীবনটা সেদিন কি
যৌবনমৃত্তই না ছিল।

কিন্তু এখানে এখন আজকে
তুমি কি বেমক্কা আত্মাবৃত্ত খুঁজে মরো
রোমওয়ালা সম্রাটদের মত জীবনকে রঙ্গন মেরাতে
এটাও চমক হে
না হলে মানুষ কিভাবে বেঁচে আছে আজ
কিভাবে পরস্পর কথা বলছি বলছি বলছি
অন্তত এজন্যে হবার কথা নয় —
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থবাহনের
মহোৎসব সারতে সারতে সারতে
চুপিসারে কখন পৃথিবীর মানচিত্রে
'আমার ভারত অমর ভারত'
কেমন বিদ্রোহের ধূপা তার অভিধান নিয়ে
মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে —
(ওহ, ঠিক যেন হিরোশিমার আকাশে
ভেসে থাকা ও অগস্টের মেঘ।)
তুমি বলবে — হাঁ নিশ্চয় বলবে — দেশের নিরাপত্তা,
চারিদিকে শত্রুর বেড়া
তাই কিছু কথা বলা নেহাৎ গোপনেই।
ঠিক। তুমিই ঠিক।
তবুতো বিশ্ব জানল — ভারতে জীবন আছে — জীবন,
টাটকা, তাজা — টগবগে
পিনিপিগের মত পরীক্ষাগারে যারা প্রাণ দিতে
সদা উৎসুক।

হায় জীবন। তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো
কিংবা একথাও আমরা জানতে পারি
আমরা জীবনকে নিয়ে যাচ্ছি কোথায় — কেন নিরুদ্দেশে?
আসলে আমরা ধারণাটাই ভুল।
জীবন সম্বন্ধে এখনও অনেক — অনেক কথা বাকি
অকথিত সে-কাহিনী শোনার জন্যে
তুমি পড়ে থাকবে তো — জেগে থাকবে।

বৃষ্টির জানলা

অজিত বাইরী

বৃষ্টির জানলা দিয়ে দেখি
মৃত্যুর মৃত্তাবলী :
গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে
গাছগুলি, মাঠের কাছে নেমে এসেছে
নুয়ে পেরিয়ে মেঘ।
বিদ্যুতের ঝলা হ্যালিজেনের সড়কির মত
নড়বড় করছে। দেখছি, সরল টানির
ঘুলঘুলি, ওরা বৌকো
ঘাটে, প্রতিমার নয়নের মোমবের মত
আকাশ থেকে ঝিম্‌মেরে মেঘলাদের ঝিলুতে মোম।
মন ভাসে নিরুদ্দেশে, আচ্ছা কি তুমি মেঘ দেখো?
সেখানে পৌঁছুনো আমার। আজ
এই মেঘলাদার দিনে সব দূরত্ব
ঘুচে যায় নিমেষে।
আমি দেখি, মাঠের কিনার থেকে
তুমি একটি ঝলমুল হয়ে হাসছো।

❑

ফিরে দেখা

উমি দে

ফেলে আসা সময়কে কাছে টেনে নেয়া
ফেলে এক হলুদ ফাগুনের দিন —
হাঁসফাঁস হাওয়ায় ভেসে আসা
এক মুঠো নিরিবিলি-সুখের কারণে রাত,

পৃথিবী বীণে বাজে বৃষ্টির রিন্‌রিন্।
সেই মুহূর্তের সেই দিনের একজন
একাকী আপন :

আবার ফেলে যাওয়া মুহূর্তের
মনে থাকা মেঘ,
এখনে ওখনে ঝাঁপসা, ছোঁয়াটো
কত শত সংবেদ —

হারানো ছোঁয়ার মৃত্যুবলী ঝিলিয়ে
জীবনের ঝাঁপাতে এ এক অদ্ভুত মেলবন্ধ।

❑

সান্নিধ্য

বাসুদেব চ্যাটার্জি

মুক্তধারা বারান্দা থেকে নির্নিমেষ চেয়ে
চেয়ে দেখি নীলাভ আকাশ,
যেখানে মিশেছে মৃত্তিকাতলে সমুদ্রের সনে,
কাশফুলেদের ঢেউগুলি আছড়ে পড়ছে
বিরামহীন ক্লান্তিহীনভাবে।

সমুদ্রের বিরাট পটভূমি ভেদ করিয়া
সমস্তরে বারান্দার এক কোণে —
রাখা আছে ছোট্ট
মুটি পাথরের উপরিভাগে ব'সে
এক প্রৌঢ় মহিলা —
সংযোগ রক্ষা করেন আমাদের সাথে।
জল, বায়ু, আকাশের মতো যা
জীবন-ধারণের এক অপরিহার্য অঙ্গ।

পড়ন্ত বেলা রঙ্গীন বারান্দায় দাঁড়াতে
পর্দার ছবির মতো একইভাবে রাখা
পাখা মুটি চোখে পড়লো।
কিন্তু মহিলা —
অনুপস্থিত।

নিমেষে বিস্মিত চোখ মেলে দেখা —
শূন্যতা ঘুচে নিয়ে আসে এক সুশ্রী যুবতী।

সমুদ্রের অভিমানে ভরা সবেদনে —
ঘরিয়ে আর পূরবের পানিতে মত,
খুঁজে ফেরে হারা সকাল
একটু উষ্ণতার স্পর্শ।

❑

জন্মদিন

কাজী সফিকুল আবেদিন

একটি সালভেদার মতো সময় পেরিয়ে যাচ্ছে
ঘড়ির পর ঘড়ি বারছে মুকের মতো,
মনের চেতনায় না কি উচ্চ ছড়ালো
তাও বুঝি না আজি,
ক্যালেন্ডারে কাঁটা ছেড়ে গেছে শুধু কেটে যুগ
আজ হাতে মুকের জন্মদিন পালন হবে
আমাদের ঘরে আলো জ্বলে থাকবে সারা রাত।

একটি সালভেদার মতো ছুটে যাচ্ছে নদী
দুই প্রান্তে দুটি বিন্দুর সঙ্গে দেখা হবে না কোনদিন,
শুধু বেঁচে থাকি, মুকের চিন চিন শব্দ শুনি একা,
আজ শুধু নীলিমার মেঘে থাকবে টাদ
সমুদ্র নক্ষত্রমালা।
আমি আজ তোমাকেই ডাকি,
সেই নীল শাড়ি পরে তোমার পালকী হবে
কেউ জানবে না কখন ফুটেছে ফুল
কেউ দেখবে না কেমন করে তুমি এলে।

এইখানে আমাদের এক ঢাল অভিমান
পুড়তে পুড়তে আজের মতো নীল হয়ে যাবে,
মোহনার কাশ সুর বাজাবে না সন্ধ্যাতে
শুধুমাত্র একটি সালভেদা বেঁচে আছে বহু দূর,
এমন করেই আজ উৎসবে মেতে উঠবে আজের
ছন্দের গতীর মত ভেঙ্গে ক'রে
ক্যালেন্ডারে একটি কাঁটা বিদ্ধ হবে বুকে।

□

উপেক্ষা

প্রবীরকুমার সমাদ্দার

কলতলো যেন বেরঙিতে ভরা,
মোহনার আলো যেন ঝরা ঝরা ...
আলোর আলোর উদ্ভাসিত
জল-স্থল প্রান্তর —
চলমিত খেয়া পারি দিতে যেন
সুরে সুরে আজ পর।

ছন্দের কাছে সুরেছাড়া খেলা
দিন চলে যায় —সুরের যে খেলা
উৎসব আজে, শুধু সেইজনত
জীবনের নেই সুর —
ওপারে গাঁয়ের পথের মিছে
চলে গেছে বহুদূর।

একদিন আঁকা স্বপ্নের প্রতীম
আজ ঝিমিঝিমি ভালোবাসা নীল
আকাশে হাঁটা শুধু সে জীবনে
একলার শুধু চলা —
শুধু উপেক্ষা, ঘর আজকাল
পরে আছে ছড়ানো।

□

আজো আমার পায়ে বেড়ি হাতে শেকল

অমিতাভ দাস

মনিরের মাঈমনি তবে যে নিত্য ঘুমোছিলো খেলা
ভোরের আজান জেনে যে আলস ঘুমোছিলো
নিশাটি খেলা
সে আজ অতেতু-স্রোতে তথ্য মুক্ত নিত্য এখনো
চারিদিকে ৬-৮ জন পশুপ্রতিম কালো চোখ
ঠিকানা হারানো পথ-ভোলে যাওয়া মনিরা
দেখলো না কেউ
সবীপে দাঁড়িয়ে হাসে সাদিয়ত কেউ

মা আমাকে ঘড়ো কষ্টে জন্ম দিয়ে চলায় ট্রেনের মতোন
৬-৮ ঘন্টা কেঁদে কেঁদে চলে গিয়েছিলো
আমার হাতে শেকল আমার পায়ে কঠিন বেড়ি
আমার কানে বাঁধনে চুপি চুপি ভয়ে ভয়ে
শেকল খোলার মন্ত্র দিয়েছিলো
স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে ও অনুভবের আলোর সিঁড়িগুলি
ভাল ও ভিতিহীন মহিমাগুলি
সত্যের ও নিঃস্ব মহানাম শিখিয়েছিলো

আমি এই উন্মুক্ত সভ্যতার প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে
পায়ে বেড়ি হাতে শেকল
অন্ধকারে আলোর মুখের ভোরে পরাধীনতার গ্লানি-পরবর্তী
জন্ম-মন্ত্র উচ্চারণের সিঁড়িগুলি আজো খুঁজি
৫০ বছর —

অন্য এক সূর্যের শপথে

নৌরেন্দু রং

এখন কবিতা লিখি না আমি
কেন যে লিখি না বুঝি না তো
মাঝে মাঝে মনে হয় কিছু লিখি,
কিছুই আসে না মনে —

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় কত কিছু।
ঘরের ভেতরে বেতরে
প্রজাপতি মেঘ হয়ে উড়ে যায়
মুক্তির মাঠের খেয়ে —
ভোরবেলায় মাঠ পার হয়ে —
ভোরুলির রঙীন আকাশে।

নদী, মাঠ, ঘাট মনের সমুখ দিয়ে
প্রবাহের ঝাঁপায়ে দোলা খেয়ে একদিন
একটি কিশোর দোল খেয়েছিল,
পথিকের আসর ঘুরে ঘুরে —
শরিকের ছদ্ম নিয়ে করেছিল খেলা —
সন্ধ্যা হলে বাতাসী সেতুর পরে জ্বলা
সুনসান বাতাসে
ঘ্রাণ নিয়ে কামলা নিশির
ঘরে সব মনটুকু নিয়ে
আকাশের টান দেখেছিল।

আজ যার মনে — মন আজ যেন কিছু নাই —
কি জানি — রাতদিন পড়ন্ত বাইকে ঘরে শুধু ফিরিয়ে
আজান গানে আসব সবাই —
মনে মনে আজ তাই পলাতকী হয়ে আসি —
সংবাদপত্রের পাতা ছিন্ন খুলে কথা পড়ে —
আমানুষ মানুষের কথা শুনে পাথরের মত
হয়ে গেছি।

তাই আজ কবিতা লিখি না আমি,
মন আজ, ভালোবাসা মনে যেন
আজ কিছু নাই।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয় লিখে যাই
উৎসবের গীত নাম নিয়ে —
লিখে নিয়ে যাই —
মানুষ মরে না কোনদিন —আকাশের
মুখ থেকে শত শত বজ্রধ্বনি এলেও
আগের বারের মত মানুষের বেঁচে থাকে
'অন্য এক সূর্যের শপথে'। ❑

পঞ্চায়েত ঃ গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম-পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তফসিলি সম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে।

স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম-সংসদ। সভ্য বুনিয়াদ যে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত অগ্রগতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩০২১

CALCUTTA RESERVE BANK EMPLOYEES' CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD

13, NETAJI SUBHAS ROAD, CALCUTTA-700 001

CATERING TO THE NEEDS OF THE RESERVE BANK EMPLOYEES' FOR SEVEN DECADES

NOW OFFERS

Loans	Max Amt	Rate of Intt.
★ Long Term Long	Rs. 54,000/-	6% p.a.
★ Short Term Loan	Rs. 3,000/-	6% p.a.
★ Festival Loan	Rs. 3,000/-	9% p.a.
★ Consumer Loan	Rs. 21,000/-	10% p.a.
★ Emergency Loan (instant payment)	Rs. 20,000/-	10% p.a.
★ Long Term Loan (for housing and related works)	Rs. 50,000/-	10% p.a.

Accepts

★ Fixed Deposits (Minimum Deposit Rs 10,000/-)

★ Interest on F.D. : From 1 year to 2 years — 10% p.a.
Above 2 years upto 3 years — 10.75% p.a.
Above 3 years — 11.75% p.a.
Interest payable half-yearly

★ Recurring Deposit Accounts with Rs. 100/- or more in multiple of Rs. 100/- for 1 year @ 8.5%

★ Savings Deposit Accounts with facilities for collection of Drafts, Cheques, Interest/Devidend Warrants etc.

And Rule

★ Holiday Homes for its members and their families at

DARJEELING DIGHA PURI RAJGIR SIMULTALA HALUDPUKUR GANGTOK

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্থাপিত - ১৯২৩

৬৬, জি টি রোড (পশ্চিম), কোন্নগর, হুগলি - ৭১২ ২০৫

দূরভাষ : ৬৭৪-০৬৬৯

শাখাকেন্দ্র : ৩৫৬ এবং ৩৫৬/এ/১, জুটমিল রোড, কোন্নগর - ৭১২ ২০৫

দূরভাষ : ৬৭৪-৫৪৯৬

সমবায়ের আদর্শে

আসুন আমরা

হাতে হাত মিলিয়ে

এগিয়ে যাই

(পুরীতে হলিডে হোমের সুযোগ গ্রহণ করুন)

গৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জি -
সভাপতি

অনিলকুমার ব্যানার্জি
সম্পাদক

WITH
REST
COMPLIMENTS
FROM :

The Electro Urban Co-operative Credit Society Limited

CESC HOUSE

CALCUTTA - 700 001, PHONE : 225 6040/49

Serving More Than 13,000 Employees of The CESC Limited For More Than 87 Years

Honesty, Sincerity & Integrity Is Our Motto

Enjoy Your Holidays
at
Our Holiday Home
at

PURI

(Opposite Bharat Sevasram Sangha)

For Booking Contact

SECRETARY

POSTS & TELEGRAPHS ACCOUNT CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD

Yogayog Bhawan (12th Floor)
P-36, Chitta Ranjan Avenue
Calcutta - 700 012
Phone : 26-6351 - Ex-41

প্রবন্ধ

'আজ জগতের বড় দুর্দিন' ঃ প্রসঙ্গ প্রেম

বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু

'আজ জগতের বড় দুর্দিন' বলেছেন বিজেন্দ্রলালের স্বনামধন্য পুত্র বিলীপকুমার রায়। একথাটুকু বলেই ক্ষেমে থাকেননি। তিনি আরও বলেছেন, "নাস্তিকতার ধ্বংসেচ্ছা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে ওঠে করা হচ্ছে। এ বিজ্ঞানবাদী বস্তুতান্ত্রিকতা ও নিছক বিজ্ঞানবাদী কাণ্ডজ্ঞানিকতার আপাতিক বেসামাল দুর্দিনে আমাদের কাছে ক্রমশই প্রতিভাত পাচ্ছে ইতিহাসাশ্রী ঐহিকতা ও যুক্তিবাদী কূপ জাতীয়তা-বাদ অতিম পরিণতি-স্বার্থান্ধ বহুমেধ-যজ্ঞে সর্বাহুতি।" এ বিশ্লেষণের আমরা নিজস্ব মূল্যায়ন কেউ করি। আমরা চাই 'অর্থ-জন-স্ত্রী-সম্পদ-যৌবন-সুস্বাস্থ্য'। আমরা এটাও জানি কেননা কিছুই স্থায়ী নয়। আজ যা আছে, কাল তা থাকবে না। অর্থ উপার্জনে আমরা কত কিছুই না করি, কিন্তু তার বিনিময়ে চিন্তা-জগতে জগতের দুর্দিন সম্পর্কে নেই। আমরা প্রতিনিয়ত বুদ্ধি ও জ্ঞানের অনুশীলন করি, ইচ্ছাশক্তিকে কল্যাণমুখী করতে শিখিনি।

জগতের এ দুর্দিন কেন? পণ্ডিত ব্যক্তিরা এর জবাব দেবেন। আমরা সাধারণ মানুষ। আমরা বিবেচনার এটুকু বুঝি যে, সাধারণের জনজীবন আজ রাহুগ্রস্ত। তারা বিশ্বেহারা, শঙ্কিতাত্মা। আত্মিক ও নৈতিক আদর্শ আজ অবহেলিত, উপেক্ষিত। এর কারণ কি? কেন মানুষে মানুষে আত্মঘাতী সংঘাত? কেন এ হিংস্রতা? কেন গোটা পৃথিবীতে এ নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য?

জগতের সকল মানুষই শান্তি চায়। কেউই দুঃখের প্রার্থনা করে না। জীবনে সবার সুখ আছে, আছে হাসি-খেলা-হুল্লোড়, আছে সুখ। হয়েছে মোবিলাস। সে কারণে আমরা প্রার্থনা করি, "আমার কেন সুখ না আছে, সুখ কেন পাই।" আমাদের মনে আছে, "সুখের সে আছে সুখ যে দুঃখে"। এত সুখ কেন, কেন এত সমস্যা?

এছাড়া সমাজে বা জীবজগতে আরও সমস্যা রয়েছে। এ সমস্যা হল নৃশংসতা কেন। কলী-পরিত্র, উঁচু-নিচু, ভাল-মন্দ কেন আছে। আমাদের হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণী ধাপে ধাপে সাজানো আছে। একথা সকলেই জানেন যে, শ্রেণী বিভাগ আজকের একটা অভিশাপ স্বরূপ।

এসব কারণে পৃথিবী ঘুরছে অশান্তির আগুন। বর্তমিক অশান্তি-দৈহিক, মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতীয়-সর্বত্রই উত্তেজনা বিক্ষোভ ও উন্মত্ততা। বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত সভ্যতাগুলি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ বিধান করছে। মানুষের যাওয়া-আসা কিংবা গমনাগমন অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশন এবং সংবাদের আদান-প্রদান অর্থাৎ কমিউনিকেশন-এ বিবিধ বিষয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে গোটা পৃথিবী আজ 'ছোট্ট ঘরে' বাঁধা পড়েছে। পৃথিবীটা কত ছোট হয়ে গেছে। এটাই আমাদের কাছে বৈজ্ঞানিক ভুল। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করেছে - এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও সত্য যে, বিজ্ঞান 'আপনজনকে' পর করেছে। মানুষের সাথে মানুষের কী বিরাট ফারাক। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এমনকী মা-বাবার পর্যন্ত খবর রাখে না। মানুষ আজ পরিণত হয়েছে। স্নায়ুবিহীনে।

এ ফলে মানুষের নৈতিক মূল্য বেড়েছে। আত্মিক মূল্যের মৃত্যু হয়েছে। এখন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক তাত্ত্বিকই প্রাধান্য পাচ্ছে। বর্ণাশ্রমের কঠিন বেড়াজাল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গতি মানুষে মানুষে বিরাট ফারাক গড়ে তুলেছে। অতীতের এ দুর্দিনই আজকের যুগ সমস্যা। দেশে রাশী, রাজনৈতিক নেতা ও পণ্ডিতের সীমাহীন প্রাচুর্য। তবুও আত্মিক টনিক ও হালকের পরিচয় কেন?

তাঁর মহানাম্রত ব্রহ্মচারী একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "জনম জীবনে যত প্রকার অশান্তি আছে, সবেরই মূল কারণ এই দেহ ও আত্মার বৈষম্য। যত প্রকার উদ্বেগ, অশান্তি, গণ্ডগোল সবই ক্ষুধার্ত আত্মার আর্তনাদ।" মনুষ্যত্ব অর্জনই জীবনের মহাব্রত-এ সত্য আমরা ভুলে গেছি। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। পশু পশুর নিজেই জন্মগ্রহণ করে। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। মনুষ্যত্বের ভিত্তি পাঁচটি। শাস্ত্রকারদের মতে অহিংসা, অটৌর্য, সংযম, শৌচ ও সত্য-এই পাঁচটি গুণের জন্ম নিয়ে মনুষ্যত্ব ব্যক্ত হয়। মনুষ্যত্ব পথ হারিয়েছে। জীবনে আনন্দ নেই। তবুও আমরা সকলে বেঁচে থাকতে চাই। কেন না আমরা সকলেই নিজ নিজ সত্তাকে বড় বেশি ভালবাসি। নিজেকে কেন বিন্দু বড়ার সাথে যুক্ত করতে না পারলে 'আনন্দ' নামক বস্তুকে পাওয়া যাবে না। 'আনন্দ' বাজারে বিক্রি হয় না। আমাদের এত আনন্দের কেন? ডিগ্রি সর্বস্ব শিক্ষা মানুষ তৈরী করে না। প্রকৃত শিক্ষা আমরা পাইনি। আমাদের 'Will' বা ইচ্ছাশক্তি যা একান্তই নিজস্ব তা নিই। এটাই 'এষণা'। এই 'এষণা' শক্তির উপযুক্ত অনুশীলন ও সাধনায় মানুষ তার দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার ওপরে জয়ী হতে পারে।

এই দুঃখ সমুদ্র থেকে মুক্তি পেতে হলে একটা বড় কেন ডিগ্রিস অবশ্য দুঃখ-এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা। আমরা কেবল নিতে শিখেছি, দিতে শিখিনি। উপযুক্ত শিক্ষা বা এষণার তাগিদে মানুষ অন্তরের ঐশ্বর্য লাভ করতে পারে। যা আনন্দময় সেটাই প্রেমের অবিনাশী সত্য। 'চেতনার প্রগতির লক্ষ্য' বলেছেন শ্রী অরবিন্দ। এ চেতনাটা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা। শুধু নিজের জন্য লড়াই।

বিলীপকুমার রায় একথাটা নানাভাবে বলেছেন যে, ভগবানকে ভালবাসতে না পারলে মানুষকে ভালবাসা যায় না। তিনি আরো বলেছেন 'নাস্তিকতার ধ্বংসেচ্ছা দিন দিন বেপরোয়া হয়ে ওঠে করা হচ্ছে। তিনি একথাও বলেছেন, "এ পৃথিবীকে স্বর্গমুখী করতে হলে সর্বজীবে করুণা সুন্দর প্রেমের বাণীকে বরণ করতেই হবে-নানাঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়-অনন্তের নিত্যলোকে, প্রেমের সৌম্যালোকে, শান্তির সুষমালোকে উত্তরণের এছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।"

জগতের এ দুর্দিনে বাঁচার একমাত্র পথ 'প্রেম চাই'। প্রেমের গতি মূর্ধার-উর্ধ্বমুখী। ভক্ত হয় ভগবানের দিকে, ভগবান নেমে আসেন ভক্তের দিকে।' প্রেম দিতে গেলে ভাঙা হতে হয়। ভেঙে চেকে যিনি দান করেন তিনি দাতা নন। অর্থাৎ 'দান করলেই দাতৃত্ব হয় না।' ভরে ভারে অবিচারে-অকাতরে যিনি দান করেন তিনিই দাতা বিজেরণি। আমরা ভগবান মানি না। কলাপূর্বক ভেবনা করে আমরা নিই 'ঈশর নেই'। আজ 'প্রেম' ব্যাখ্যায় একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। আলোচনার 'কানজন' বিস্তৃতভয় না করেও আমরা মূল লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা করব।

অনেকে মনে করেন মানুষ একান্তভাবেই

অর্থনৈতিক জীব। অর্থ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ৺ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের মতে মানুষের পুরুষার্থ পাঁচটি। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম। পুরুষার্থ অর্থ সাধনীয়, আমরা চেষ্টা করা দরকার। ভিন্নবাদীদের মনে অর্থ মানে শুধু টাকা পয়সা মনে হয়। 'ধর্ম' অর্থ যা সত্য। 'কাম' অর্থ ভোগ্য বস্তু। 'অর্থ' বলতে শুধু ধন বোঝালে না। মান-ঐশ্বর্য-যশ-খ্যাতি সবই অর্থ। সকল বন্ধন থেকে মুক্তির আকুতিই 'মোক্ষ'। ওপরের চারটি পুরুষার্থ সুস্পষ্ট। এছাড়া আরও একটি পুরুষার্থ আছে তার নাম 'প্রেম'। ওপরের পাঁচটির চারটিকে উপেক্ষা করা কি অদ্যৌ বিজ্ঞানসম্মত হবে? অর্থই একমাত্র জীবনের নিয়ন্ত্রক পুরুষার্থ একথা কি বাস্তবিকই সঠিক? ভিন্নবাদীদের এটা একদেশদর্শিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রেমের ধর্মই বিশ্বধর্ম। প্রেমের ধর্মই মৃত্যুকে জয় করতে পারে। কারণ প্রেম সাম্প্রদায়িক নয়, বিশ্বজনীন। ভোগ মানুষের লালসা বাড়ায়। ভোগ্য বস্তুও সীমাবদ্ধ। প্রেম অসীম। আমরা আধুনিককালের মানুষরা কথায় কথায় সাম্যবাদ বলি — অর্থাৎ সব মানুষ সমান। প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও সাম্যবাদের কথা আছে। ইসলাম-ক্রিশ্চান-বৌদ্ধ সব ধর্মে সাম্যের কথা রয়েছে। প্রাচীনকালের সাম্যবাদ ও বস্তুবাদীদের আধুনিক সাম্যবাদ এক কথা নয়। প্রাচীন সাম্যবাদের মূল নীতি বা ভিত্তি হল ঈশ্বর, মহাপুরুষ ও প্রেম। অর্থাৎ এর মূলে রয়েছে প্রেম, প্রীতি। সকলেই তাই তাই আপনজন। বস্তুবাদীদের সাম্যবাদ হল স্বাধীনতা, সমতা, মিত্রতা।

বেদে ধর্মের অর্থ কোন সাম্প্রদায়িক অর্থে নয়। বেদের ধর্মের অর্থ 'মানবধর্ম'। মনুর গ্রন্থের নাম 'মানব ধর্মশাস্ত্র'। মানবধর্মের মূল কতিপয় নৈতিক বিধান-অহিংসা, অচৌর্য ও সত্য। এই তিনটি মূলত মানবধর্মের ভিত্তি। এই ধর্মকে মেনে দেবত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কারণে একটা বিরাট কিছুর সাথে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করা দরকার। আমরা সকলেই পরমপুরুষের সন্তান। বেদ বলেছেন -

'সংগচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম।

সমনো মন্ত্র সমিতির সমানী

সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাম।'

"সংগচ্ছধ্বং সংবদিত্তমেষাম।"

(তোমরা) সম্মিলিত হয়ে চল, সমান কথা বল, তোমাদের সহেত মনকে জানতে হবে। তোমাদের সকলের মনন এক হউক সকল সমবায়ের সংগঠন সমমানসম্পন্ন হউক, তোমাদের মন এক হউক। তোমাদের চিত্তসমূহ একত্ব ভাবনায় সম্মিলিত হউক।

এটাই ভারতাত্মার বাণী। যা নিত্যকাল আমাদের সঞ্জীবিত করেছে। আজও করবে। এটাই মিলনমন্ত্র। মানব ধর্মই জাতির দুর্দিনে বাঁচার একমাত্র উপায়।

[সূত্র : দিলীপকুমার রায়, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ও যোগেন্দ্রকুমার সরকারের গ্রন্থসমূহ।] □

নারুগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং - ৫৪, তারিখ - ১৮/৫/২৯

গ্রাম + পো: — নারুগ্রাম, জেলা — বর্ধমান

নারুগ্রাম ও বাসুদেবপুর মৌজা সমিতির এলাকা

কার্যকলী :-

১। বছরেরানি কৃষি লোন দান (১৯৯৭-৯৮) বর্ষে ১০.১৭ লক্ষ।

২। ১২টি সাবমার্সিবল এর মাধ্যমে ৩০০ বিঘা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা।

৩। ধান্য বীজ ও সার ব্যবস্থা।

৪। বর্তমান ডেপ্ত - ১ সমবায় ইউনিয়ন কর্তৃক অধিগৃহীত সমিতি হিসাবে নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদস্যদের সক্রিয় করে তোলার বলে তাহির ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা গ্রহণ।

ওঙ্কারনাথ ব্যানার্জি
সভাপতি

জগন্নাথ ঘটক
সম্পাদক

সল্টলেক মাল্টিপারপাস হ্যান্ডিক্র্যাপট
ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

সুকান্তনগর, সেক্টর - ৪, সল্টলেক, কলি - ৯১ রেজিঃ নং - ৬ উত্তর ২৪ পরগণা

সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারা পরিচালিত সমবায় সমিতিতে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পের জিনিস (কাঁথা স্টিচের শাড়ি, ব্লাউজপিস, সাইড ব্যাগ) ও মেশিনের তৈরি সারা, নাইটি, বেডসিট, ফ্রক, হ্যাউজকোট তৈরি ও বিক্রয় করা হয়।

বস্ত্র সমবায়ে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের ওঁড়নাকলাও তৈরি হয় (হলুদ, লংকা, জিরা, ধনিয়া, গোলমরিচ, গরমমশলা, সাদা কেসর)।

ভাবতী দে
সম্পাদক

কৃষকের
সেবায়

মহাদেবপুর
সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাঃ + পোঃ - মহাদেবপুর, মালদা

দুলাল চৌধুরী	রঞ্জন মিত্র	রঞ্জিত বিশ্বাস
সভাপতি	*ম্যানেজার*	*সম্পাদক*

শারদীয়ার
প্রীতি ও শুভেচ্ছা
জানাই

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ী
মেহনতী জনগণের উদ্দেশ্যে

রামরাজা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

১/১/২, চৌধুরীপাড়া ১ম বাই লেন
হাওড়া -৭১১ ১০৪
ফোন - ৬৬৭-৫০২২

অবসর বিনোদনের জন্য
চলে আসুন

পুরীতে

মনোরম পরিবেশে বাথ-রুম সংলগ্ন
চার শয্যা বিশিষ্ট
দুটি ঘর পাওয়া যায়।
সমুদ্র থেকে দু'মিনিটের পথ।
(স্বর্গদ্বারের পাশে)

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

কলিকাতা ডক লেবার বোর্ড স্টাফ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
২০বি, আব্দুল হামিদ স্ট্রিট (ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট)
(২য় তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০৬৯

মহাসংঘের বিশুদ্ধ তালমিছরী
সর্দি ও কাশি নিরাময় করে

মঃ জানে আলী সেখ	সঞ্জীব সরকার
চেয়ারম্যান	*মুখ্য কার্য নির্বাহী আধিকারিক*

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তালগুড় শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ
৪, বিপিন পাল রোড, কলিকাতা-২৬
দূরাভাষ ঃ ৪৬৪-১৯২৪

পুরীর সমুদ্রতীরে এবং দিঘায় আমাদের
হলিডে হোম
পুরী
"সৈকতাবাস"
দিঘা
"হোটেল ড্যাফোডিল"

বিশদ বিবরণের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন

ফুড-ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড
১১-এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা-৮৭

পুরীর সমুদ্র সৈকতে আমাদের হলিডে হোম
"মালঞ্চ"
আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

ট্রান্সপোর্টেশন ডাইরেক্টরেট (ফুড) এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ, ব্লক-এ, (৭ম তল)
১১-এ মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলিকাতা - ৮৭
ফোন : ২৪৪-৩৪৩৫, এক্সটেনশন - ৭৪ বা ৭৮

পুরীতে সপরিবারে থাকার জন্য
দে'জ মেডিক্যাল হলিডে হোম
★ *সমুদ্রের ধারে* ★ *বিছানা বাসন সবই আছে*
★ *পরিচ্ছন্ন* ★ *খরচ বেশি নয়*

যোগাযোগের ঠিকানা
দে'জ মেডিক্যাল স্টোর্স এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
২০এ, লিন্ডসে স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৮৭

With Best Compliments From :

EVERETT STAFF CO-OPERATIVE
CREDIT SOCIETY LTD.

4, GOVERNMENT PLACE (NORTH)
CALCUTTA - 700 001
PHONE : 248-6295/97, 248-7038
TELEX : 021-7581 & 021-2236
FAX : 91-33-2489583

প্রবন্ধ

সত্যের সন্ধানে

পরিমল চৌধুরী

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang-II) ১২০০ কোটি বছর পূর্বে। প্রথম মহাবিস্ফোরণ (Big-Bang-I) এর প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের তত্ত্বকথিত পরিচিত ব্রহ্মাণ্ড। প্রথম মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিল আজ থেকে ১৫০০ কোটি বছর পূর্বে। মহাবিস্ফোরণের মুহূর্ত থেকে এই ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণশীল এবং সেই সম্প্রসারণ এখনও চলছে।

দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের প্রভাবে এই ব্রহ্মাণ্ডের মত আরেকটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখনও নিশ্চিত নন। দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের যে অনুরণনীয় আলোক ছটার সৃষ্টি হয়েছিল তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে ১৯৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। ঐ আলোকরশ্মি পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে ঐ মহাবিস্ফোরণটির উৎস পৃথিবী থেকে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। এই গতিতে আলো এক বছরে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তাকে এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বলে। এই হিসাবে ১২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরত্ব যে কতটা দূর তা আমাদের কল্পনারও বাইরে।

উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে বোঝা যাচ্ছে যে একাধিক মহাবিস্ফোরণ ঘটে গেছে। আমাদের ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির উৎস ১৫০০ কোটি বছর পূর্বের তত্ত্বকথিত প্রথম মহাবিস্ফোরণ। এর আগে অন্য কোথাও অনুরূপ মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে কিনা তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাবিস্ফোরণের পর আরও মহাবিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এক একটি মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতি হিসাবে যদি এক একটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণা পাল্টাতে হয়। একাধিক ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকলে (যার সম্ভাবনা উল্লিখিত ঘটনাবলী থেকে অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়) এই মহাজগৎকে মহাব্রহ্মাণ্ড হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।

এটা এখন অবিসংবাদিত সত্য যে, সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মূল কারণ আণবিক বিভাজন ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ। অর্থাৎ তত্ত্বকথিত ধ্বংসের মধ্যেই সৃষ্টির সম্ভাবনা লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথম মহাবিস্ফোরণের ফলশ্রুতি হিসাবে হাজার হাজার কোটি নক্ষত্র, ধূমকেতু এবং বিভিন্ন নক্ষত্রের অগণিত গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এটা এখন আমাদের জানা যে এক একটি নক্ষত্র এক একটি প্রজ্বলিত পারমাণবিক চুল্লি। নক্ষত্রগুলিতে অবিরত পারমাণবিক বিভাজনের ফলে কিছু নতুন পরমাণুর সৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু পরমাণু ধ্বংসে হচ্ছে তাপ ও আলোর সৃষ্টি করে চলেছে। সূর্য অনুরূপ একটি নক্ষত্র। এই ব্রহ্মাণ্ডে কোন কিছুই স্থায়ী নয়। সব কিছুই ক্ষণস্থায়ী। প্রতিটি নক্ষত্রেরই নির্দিষ্ট পরমায়ু আছে। নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটে দুইভাবে — প্রথমত মৃত্যুকালীন অবস্থায় নক্ষত্রটি স্ফীত হতে হতে তার নিজস্ব আকারের কয়েক হাজার গুণ বর্ধিত হয়ে যায়। এই অবস্থাকে বলে সুপার নোভা এবং পরিণতিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রটির অস্তিত্ব মহাকাশে বিলীন হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত নক্ষত্রটির ভর যদি আমাদের সূর্যের ভরের আড়াই গুণ বা তার বেশি হয় তাহলে মৃত্যুকালীন অবস্থায় নক্ষত্রটি স্ফীত হওয়ার পরিবর্তে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এই সঙ্কোচনের পরিণতিতে নক্ষত্রটির আকার প্রায় একটি বিন্দুতে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে ব্ল্যাক হোল বলে। এই ব্ল্যাক হোলের অন্তর্মুখী আকর্ষণ এতই বেশি যে আলো-পাশের যে কোন বস্তুর এমনকী আলোকরশ্মি পর্যন্ত ওকে নেয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে মহাজাগতিক নিয়মে প্রধান দুটি বিষয়ের একটি হল সম্প্রসারণ আর অন্যটি সঙ্কোচন। সম্প্রসারণের প্রভাবে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা অনুমান করা যেতে পারে-যে প্রক্রিয়ায় সঙ্কোচনের প্রভাবে একটি নক্ষত্র ব্ল্যাক হোল-এ পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়ায় যখন ব্রহ্মাণ্ডের এই সম্প্রসারণ চরম সীমায় পৌঁছে যাবে, তখন সঙ্কোচনের কাজ শুরু হবে। সেই দিন শুরু হবে এই ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংসের প্রস্তুতি। সেই মহাসঙ্কোচনের চরম পরিণতিতে ব্রহ্মাণ্ডটি মহাবিস্ফোরণের পূর্বেকার আকৃতিতে পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডটি একটি মহা ক্ষুদ্র গহ্বরে (বিগ ব্ল্যাক হোল) পরিণত হবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে উল্লিখিত বিরাট মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের নিয়ন্তা কে বা কি? প্রশ্নটি তুলেছে এই মহাজগতের একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অধীন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবী নামক গ্রহের কনিষ্ঠ প্রজাতির প্রাণী অর্থাৎ মানুষ। মানুষ মনে করে তার ভাগ্যনিয়ন্তা হলেন ঈশ্বর এবং মানুষ ঈশ্বর বা দেবতার কৃপা লাভের জন্য তাঁকে উপাসনা করে। এবার একটু খোলা মনে ভাবা প্রয়োজন যে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কত পরে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত হয়েছে যে পৃথিবীর জন্ম ৫০০ কোটি বছর পূর্বে। তার বহু পরে পৃথিবীতে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ পৃথিবীর কনিষ্ঠতম প্রজাতির প্রাণী এবং মানুষের সৃষ্টি আজ থেকে মাত্র ৪০ লক্ষ বছর পূর্বে। তাহলে মানুষ সৃষ্টির হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকে এই যে মহাজাগতিক কর্মকাণ্ড চলে আসছে তার নিয়ন্তা মানুষের কল্পিত ঈশ্বর হতে পারেন না। আসলে মানুষ হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র প্রাণী যে কল্পনা করতে পারে, ভাবতে পারে এবং তার কল্পনা বা ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষমতা রাখে। আদিম মানুষ তার চারিদিকে প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক বাধাবিপত্তি অতিক্রমের চেষ্টা করতে গিয়ে যে অসুবিধায় পড়ত তাকে দূর করার জন্য তার কল্পনাপ্রবণ মন ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করে। এই থেকেই বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রচলন শুরু হয়। যেমন অগ্নি-দেবতা, বরুণ দেবতা ইত্যাদি।

কালক্রমে মানুষ, বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। গত দু'শ বছরে মানুষ সভ্যতার বিভিন্ন দিকে চরম উন্নতি ঘটেছে। এই নিবন্ধে উল্লিখিত ঘটনাবলী তার সাক্ষী। কিন্তু এখনকার সত্য মানুষের মনেও সেই ঈশ্বর উপাসনার প্রচলন হয়ে গেছে।

মানুষের জন্মের পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের মহাকর্মকাণ্ডের নিয়ন্তা যিনি ছিলেন এখনও

তিনিই আছেন অর্থাৎ নেচার বা প্রকৃতি। প্রকৃতিই ভগবান। ভগবান বলে আলাদা কোন ব্যক্তি বা বস্তু হতে পারে না। আর এটা বলে দেওয়ারও কোন দরকার নেই যে ভগবান বা প্রকৃতি তার সৃষ্ট অন্যান্য সবকিছুকে উপেক্ষা করে শুধু মানুষের কল্যাণের জন্যই চিন্তা করবেন। আমাদের দেশের ঋষিরা (আসলে তাঁরা এক একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন) এই সত্য জানতেন। তাই তাঁরা বলে গেছেন ঈশ্বরের কোন আকার নেই, তিনি নিরাকার এবং সর্বত্রই বিরাজমান। তবে তাঁরা এটাও জানতেন যে এই সত্য আপামর জনসাধারণকে জানালে তাঁদের সুশৃঙ্খল নাগরিকে পরিণত করা সম্ভব নয়। তাই ধর্মীয় শৃঙ্খলার জালে তাদের আবদ্ধ রাখা হয়েছিল, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় কাঠামো বজায় রাখার স্বার্থে। মানুষের বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব জঙ্গলের থেকে মানুষ সত্যের সন্ধানে যুদ্ধ করে চলেছে। কখনও পিছিয়ে আসেনি। যা নাকি পৃথিবীর অন্য কোন প্রাণীই করতে পারেনি। এই সত্যের জয়যাত্রা নিয়ে মানুষ আরও এগিয়ে চলেছে আরও সত্যের সন্ধানে যেন "Winners never quite,quitters never win" এই প্রবচনকে সত্য প্রমাণ করার জন্য। ❑

"দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর -
ইহারাই তোমার দেবতা হউক।"

— স্বামী বিবেকানন্দ

বেত ও বাঁশের উন্নতমানের সকল প্রকার দ্রব্যাদি তৈরী করা হয়।

সৌজন্যে — বিবেকানন্দ সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতি লিঃ

স্বামী বিবেকানন্দ রোড, পশ্চিম রাজাপুর

কলিকাতা - ৭০০ ০৪২

(বাঘাযতীন স্টেশন/বাসস্টপের নিকটে)

দূরভাষ - ৪১২-৫৯৪৯

ছয় দশকের অধিককাল জনসেবায় নিযুক্ত

দি শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

১৭৩,১৭৪ নং শিবপুর রোড

হাওড়া - ৭১১ ১০২

ফোন - ৬৬০-২০৫৮

আমাদের কল্যাণমুখী প্রকল্পের কয়েকটি ঃ

- ★ বোটানিকাল গার্ডেন অঞ্চলে শাখা অফিস
- ★ সভ্যদের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণ।
- ★ গৃহ নির্মাণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ।
- ★ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ।
- ★ অগ্রসর ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য সহজ শর্তে ঋণ।
- ★ মূল্যবান সামগ্রীর সুরক্ষার লকারের ব্যবস্থা।
- ★ প্রায় সকল প্রকার জমার ক্ষেত্রে অধিকহারে সুদ।
- ★ সকাল সন্ধ্যার ব্যাঙ্কিং-এর সর্বাধিক সুবিধা।
- ★ বকখালি, পুরী, দিঘা, দার্জিলিং এবং বেনারস সর্বস্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত হলিডে হোম।
- ★ সর্ব সাধারণের জন্য সহজ শর্তে এনুয়েলের ব্যবস্থা।

প্রবন্ধ

জন্মশতবর্ষে নজরুল

শ্যামল মৈত্র

ডাকনাম ছিল দুখু মিঞা। সত্যিই তো, সারা জীবন তার দুঃখেই কেটেছে তাকে দুখু ছাড়া আর কি নামেই বা ডাকা যায়। মাত্র আট বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে যাঁর বাল্যকাল কেটেছে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে, রুটির সন্ধানে যাঁকে মাত্র এগারো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে, পরিণত যৌবনেও যিনি পেয়েছেন পুত্রবিয়োগ এবং প্রিয়তমা পত্নীর পক্ষাঘাতজনিত শোক, তাঁর দুখু নাম তো সার্থক।

এ বছর ২৬ মে তারিখে সেই দুখু মিঞা অর্থাৎ কাজী নজরুল ইসলামের শততম জন্মদিন পার হয়ে গেল। এখন এই সার্ধশতী বছর ধরেই এপার বাংলা ওপার বাংলায় সর্বত্র নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রিয় কবির জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হবে। নজরুল যে বছর জন্মেছিলেন অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখটা ছিল ২৪ মে বুধবার। পিতা কাজী ফকির আহমেদ, মাতা জাহেদা খাতুন, সাত ভাই দুই বোনের মধ্যে চার ভাই জন্মের একমাসের মধ্যেই মারা যায়। আগেই বলেছি, দারিদ্র্যের জন্য তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল বাল্যকালে। এই সময় লেটো দলে গান লিখে গান গেয়ে যখন তিনি দিন কাটাচ্ছেন তখন আসানসোলের দারোগা কাজী রফিজউল্লাহর স্নেহদৃষ্টিতে পড়ে যান। তিনি নজরুলকে মন্মথনিলয়ে নিয়ে যান এবং তাঁরই পরিচালনায় হাইস্কুলে ভর্তি করে দেন। তখন নজরুলের বয়স ১৪ বছর। মেধাবী ছাত্র হওয়ায় প্রথম বছরেই তাকে প্রমোশন পেয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর থাকা হল না। ফিরে এলেন আসানসোলে, ভর্তি হলেন সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে ; এখানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর শিক্ষক ছিলেন। সকলে যখন আশা করছে নজরুল এবার ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে স্কুলের সুনাম বৃদ্ধি করবেন, এরকম একটা সময়ে ১৯১৭ সালে নজরুল সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ যুদ্ধে চলে গেলেন। কবাশিল্পী সৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। কিন্তু শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে ফিরে আসেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ইংরেজ প্রভুদের হয়ে যুদ্ধে যেত পদানত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষদের নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনী দোর্শা রেজিমেন্ট, শিখ রেজিমেন্ট ইত্যাদি। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নামেই বাংলা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিল ইংরেজ সরকারের খাতায় ; তাই সেই দুর্নাম ঘোচাতে বাংলার আপোষকামী কংগ্রেস নেতৃত্ব ইংরেজ সরকারের কাছে আবদার করলেন যে বাঙালীদেরও যুদ্ধে পাঠানো হোক। সরকার সেই আবদার মেনে নিয়ে বেঙ্গলি রেজিমেন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত নিলেন। বাংলার নেতারা যুবকদের ঐ সৈন্যদলে নাম লেখাবার জন্য আহ্বান জানালেন। নজরুল তাতে সাড়া দিলেন। ইংরেজ প্রভুদের সেবা করার মনোভাব নিয়ে কি তিনি সেখানে গিয়েছিলেন? মোটেই না। নজরুলের বহু পত্র ও রচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই নজরুল যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের সৈন্যবাহিনীতে গিয়ে অস্ত্র চালনা শিখে এসে সেই অস্ত্র ইংরেজের বিরুদ্ধেই ঘুরিয়ে ধরার বাসনা ছিল তাঁর।

যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নজরুল অস্ত্র তুলে ধরেছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে ঠিকই। কিন্তু সে অস্ত্র বন্দুক বেয়নেট নয় সে হল তাঁর ক্ষুরধার লেখনী। সেই অস্ত্রের ঝনঝনানি মাঝে মাঝেই ইংরেজ সরকারের সিংহাসনের ভিত নাড়িয়ে উঠেছে। তাঁর সেই লেখনী সজাগ করেছিল একদিকে হাজারে হাজার মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। আজও, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতা ও জাত-পাতের বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। আমরা তাঁকেই রেখে যাওয়া হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করে চলেছি। জন্মশতবর্ষে এই মানুষটির কাছ থেকে আমরা বর্তমান সঙ্কটমুহূর্তে পথ চলার দিকনির্দেশ যে দুটি বিষয়ে সবচেয়ে জরুরী হিসেবে পেতে পারি তার একটি হল সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে আর অপরটি হল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে বিশেষত স্বাধীনতা আন্দোলনে আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। আলোচ্য নিবন্ধে এই দুটি প্রসঙ্গেই সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

কতকগুলি সুবিধাবাদী ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জোড়াতালিতে কেন্দ্রে, একটি সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতাসীন হওয়ায় আজকের ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামই সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক লড়াই। সেই সংগ্রামের মূর্ত প্রতীক কাজী নজরুল ইসলামের সমগ্র জীবনটাই ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ। ফুলিয়ার মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্তাকে বিয়ে করার পর প্রথম পুত্রের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণ মহম্মদ। তার অকালমৃত্যুর পরে পরবর্তী দুই পুত্রেরও হিন্দু নামকরণ করেছিলেন, সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ধূমকেতুর প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন। "ধূমকেতু কোন সাম্প্রদায়িক কাগজ নয়। মনুষ্যত্বই সবচেয়ে বড় ধর্ম। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় যা কিছি কোন্‌খানে ও: মেথিয়ে এর গলদ দূর করা এই পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য।" ধূমকেতু প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী (আয় চলে আয় রে ধূমকেতু/আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু) মাথায় নিয়ে পথ-চলা শুরু করলেও তার বিরুদ্ধে একদিকে ছিল রাজরোষ, অপরদিকে স্বজাতিবিদ্বেষ। দোড়া মুসলমানেরা নজরুল এবং ধূমকেতুর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, অবশ্য নজরুলকে দমাতে পারেননি।

মুসলমান হয়েও নজরুল শাস্ত্র-পুরাণ, ভগবদ্গীতা-বিদ্যা ইত্যাকার হিন্দুধর্মের খুঁটিনাটি ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনের উপায় খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন।। "আমাদের গভীর বিশ্বাস যে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের প্রধান অন্তরায় হইতেছে মৌলবীদের এই জমজমাটী ব্যাপারটাই _ ধর্ম কখনও এত সঙ্কীর্ণ, অনুদার হইতে পারে

না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। হিন্দুধর্মের মধ্যে এই ছুৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না। কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের মত এক বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া ফেলিয়াছে তাহা আমরা তাঁহাদের অধিকারে জোর করিয়া বলিতে পারি। মহাত্মা মহাতেজস্বী পুত্র স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে ভারতে যেদিন হইতে এই 'ছোঁয়' শব্দটার উৎপত্তি সেদিন হইতেই ভারতের পতন, মুসলমান আগমনে নয়। মনুষ্যকে এত ঘৃণ্য করিতে শেখায় যে ধর্ম, সে আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। এই অর্থেই নরকে নারায়ণ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। আবার সেই অর্থেই সমাজে মানুষকে কুকুরের চেয়েও ঘৃণ্য মনে করিবার মত হেয় এই ছুৎমার্গবিধি। কি ভীষণ অনাসৃষ্টি! যাহারা অন্য মানুষকে বা অন্য ধর্মকে ঘৃণা করে বা নীচভাবে তাহারা নিজেরাই অন্তরে নীচ, তাহাদের নিজেদেরও কোন ধর্ম নাই। [মুসলমানী/ছুঁৎমার্গ]

পাশাপাশি, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতিও তিনি ধিক্কারী দিয়েছেন। সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা তিনি সমানভাবেই করেছেন। "আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে কোনো মুসলমানের মধ্যে নাই বলিলেই বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। মৌলনা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষুকর্ণ বুজিয়ে সহিতে পারি। কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ... 'মুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল' নীতি অনুসরণ না করিলে সভ্য জগতের কাছে আমাদের ধর্ম, জাতি আরও লাঞ্ছিত ও হাস্যাস্পদ হইবে। ইহাদের কবলমুক্ত আর করেছে। বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ও ইহাদের জারিজ ঘাতড়াইলে দুই দল পণ্ডা পাওয়া যাইবে। ... এখন উপায় নাই। যে হাত আজ টুঁটিটিপ ধরিয়াছে তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছাড়া প্রশস্ততর উপায় নাই। অন্তরে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়াই এইসব কথা বলিতেছি। চোগা-চাপকান বাদি টুপি দিয়া মুসলমান সমিতির দিন চলিয়া গিয়াছে ... ভরসা এই যে, বিবি তালাকের ফতোয়া শুনিয়াও কাহারও বিবি অন্য বাপের বাড়ি চলিয়া যায় নাই এবং কুফরী ফতোয়া দেওয়া সত্ত্বেও কেহ 'শুদ্ধি' হইয়া যান নাই। ... আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিঘ্নাচল। তাহা হইলে অবতার প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের মুসলমান সমাজের যেটুকু চলা যে করে উঠিবে খোদা জানেন। ... কল্যাণে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আসন তাহা মনেও করিতে পারি না। শুধু অবতারের অন্ধকারে রাত্রিটাই শান্ত হই নাই, অগ্নিকার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি।"

কাজী নজরুল ইসলাম বুঝেছিলেন যে হিন্দু যদি শুধুই মুসলমানের সমালোচনা করে আর মুসলমান যদি হিন্দুর নিন্দা করে যার ক্রমাগত চাবুকে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির কেউ কোনদিনই সুস্থ হবে না। আবার কালকে কলমে শুধু অহিন করে এই সম্প্রীতি রচনা করা যাচ্ছে না। তাই 'হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট' নিয়ে তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি, "যখনাগাছুতে গলাগলি করে নব প্যাক্টের আশ নাই। মুসলমানের হাতে ছুরি নাই, হিন্দুর হাতে ঘাঁস নাই।" দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনসেতু রচনা করতে হলে হিন্দুকেই হিন্দুধর্মের কুসংস্কার, কুপ্রথার সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং মুসলমানকেও মুসলিম সমাজের বর্বরতা গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে হবে। শুধু বক্তৃতায় নয়। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নজরুল সারা জীবন ধরে তাই করে এসেছেন। ঐ একই নিবন্ধে তিনি বলেছিলেন। "আমি জানি যে বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজও রুদ্ধ। হিন্দু মুসলমানদের পরস্পরের অন্ধতা দূর করতে না পারলে যে এ পোড়া দেশের কিছু হবে না। এ আমিও জানি। একমাত্র সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এ অন্ধতা দূর করতে পারি। ... ইসলামের নামে যে কুসংস্কার মিথ্যা আবর্জনা স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে তাকে ইসলাম বলে না মানা কি ইসলামের বিরুদ্ধে অভিমান? ... আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। তাই তাদের সংস্কারে আঘাত করার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই।" (সওগাত, ডিসেম্বর ১৯২৭) নজরুল তাঁর রচনায় আরবী-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে "হিন্দুরা ভাবে, ফার্সী শব্দে কবিতা লেখে ও পাত নেড়ে" আবার হিন্দু দেব-দেবীর উল্লেখ তাঁর অনেক রচনায় ব্যাপকভাবে রয়েছে বলে "মৌলভী ভাবে মৌলবী আর মোল্লারা কল হাত নেড়ে/দেব-দেবী নাম মুখে আনে। সবে দাও পরিচয় আজ মেরে।" (আমার কৈফিয়ৎ)।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রচনার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বারে বারে আক্রমণ করেছে। ঐসব কুৎসিত আক্রমণেও নজরুল বিচলিত হননি। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে এলবার্ট হলে তাঁকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এনে হ্যাণ্ডশেক করাতে চেষ্টা করেছি। গলাগলিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মেলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে।" ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি বারে বারে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার আহ্বান রেখেছেন। স্বধর্মীদের অন্ধসংস্কারমুক্ততার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলেছেন, "ওরে হাসান, ওরে হোসেন ওদের মিথ্যা চিৎকার আর যা করেনের পুষ্পশোভাকে আজকে পীড়িত করে তুলো না। ... তোমার স্বাধীনতাকে, তোমার সত্যকে, তোমার ধর্মকে যে তাদিদের বংশধরেরা লাঞ্ছিত, নিপীড়িত করছে তাদের বিরুদ্ধে তোমার ভূলুণ্ঠিত শির উঁচু করে তোমার সত্যকে রক্ষা কর।" (মোহরম : বর্ষ ১, সংখ্যা ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২২)।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে নজরুল শ্রেণীচেতনার উত্তীর্ণ করেছেন 'গোঁড়ামি ধর্ম নয়' কবিতাটিতে। "কেহ কেহ হয় চির-দরিদ্র, কেহ চির ধনী রয়/কেন কেউ অভিশপ্ত, কাহারো জীবন শান্তিময়?/কোন্ শাস্ত্রী বা মৌলানা বলো বেঁধেছে তাহার ভেদ?/গাহার মতন রয়েছে ইহারা কেমনে, সত্য বেদ।" এই কবিতার শেষের দিকে এসে নজরুল যে রাজনৈতিক সত্যের কথা উচ্চারণ করেছেন তা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ। "আহারা ৫ পা, ভণ্ড তারাই ধর্মের আবরণে/স্বার্থের লোভে ঝাপাইয়া ভোলে অজ্ঞান জনগণে।/জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষ এরা আনি/আপনার পেট ভরায়, তখ্‌ত চায় এরা শয়তানী/ধর্ম আন্দোলনের ছদ্মবেশে এরা কুৎসিত/বলে, এরা হবে মন্ত্রী করিবে স্বধর্মীদের হিত।" সাম্প্রদায়িকতায়, আঞ্চলিকতায়, জাতপাতের, বিভেদের বিষবাষ্প যখন এদেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলেছে সেই ঘোর দুর্দিনে নজরুলের জীবন ও কর্মধারা আমাদের সঠিক পথের নিশানা দিতে পারে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যেমন, ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেও তেমনি, নজরুল ছিলেন এক আপোষহীন যোদ্ধা। ইংরেজকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। এই ছিল তাঁর সুস্পষ্ট মতামত। এর মধ্যে আর কোনো দ্বিতীয়

চিন্তা থাকতে পারে না। স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি প্রচণ্ড আশাবাদী ছিলেন, "রাজ্যে যাদের সূর্য অস্ত যায় না কখনো, ওদিন হয়/মেয়ে মেয়ে যারা ভাবিছে অমর-মরিবে না কভু মৃত্যু যার/তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়।/চেয়ে দেখ ঐ ধূম্রকেতু অনলেরের মেঘ-পক্ষে/সূর্য তাদের গ্রাসিল প্রায়।/ডুবেছে যে পথে গ্রোম-গ্রীস-প্যারী সেই পথে অস্ত যায়/ওদের সূর্য, দেখবি আয়।/_ এবার মাথার ওপরের সাপে, তাদা আর কোথা বাঁধবে বল?/আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছেবল।/ওরা ডেকে আর বল কি বল?" (যুগ শঙ্খ পত্রে পত্রে)

১৯২২ সালের মাঝামাঝি থেকে গেল গান্ধীজির নিরস্ত্রীকরণ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ একেবারে মিলিয়ে পড়েছে। এই নিষ্ক্রিয়, শীতল অবস্থাওয়ায় ধূমকেতুর পাতায় অগ্নিবর্ষী লেখার মাধ্যমে নজরুল প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলেন আর সেই উত্তাপ সন্ত্রাসবাদীদের মিলিয়ে পড়া মেরুদণ্ডে মনে গর্জনোন্মুখ গতিবেগের সৃষ্টি করেছিল। "একটা কুকুরকে গুলি করিবার সময় একটু আধটু ভয় হয়, যদি কুকুরটা আসিয়া কোন গতিকে গাঁক করিয়া কামড়াইয়া দেয়। কিন্তু আমাদের এই কালা আদমীকে গুলি করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকিদের সে ভয় আদৌ পাইতে হয় না। কেননা, তাহারা জানে, আমরা পশুরও অধম।" এইভাবে ক্লেষের ও বিদ্রূপের চাবুক মেরে মেরে তিনি সমস্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলেছেন। ধূমকেতু পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, "সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়, স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, _ যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করেছেন ওঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুঁটলি বেঁধে সাদরপারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার দুর্বুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।" (সম্পাদকীয় ১৩.১০.২২)। এর পরেই বলেছেন, "আর আমরা পাঁড়াইয়া পাঁড়াইয়া মার খাইব না, আঘাত খাইয়া খাইয়া, অপমানে বেদনায় আমাদের রক্ত এইবার গরম হইয়া উঠিয়াছে। কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে আমাদের নাই? আমরা কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর। আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পারিব না!"

সেই সময়ে 'বিজলী', 'সন্ধ্যা', 'শঙ্খ' প্রমুখ কয়েকটি পত্রিকা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মদৎ দেবার কাজে ব্রতী হয়েছিল। কিন্তু তাদের মতে যেটুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-জড়তা-দোদুল্যমানতা ছিল, তাকে সবলে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে 'ধূমকেতু' আবির্ভূত হয়েছিল অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের চাবুক মেরে দেশ থেকে বিতাড়িত করতে। সেকালে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা সহজ ছিল না, পত্র-পত্রিকার পাতায় তো নাই। গান্ধীজিও অনেক কষ্টে ১৯২২ সালে ডোমিনিয়ন স্টাটাসের দাবি তুলেছেন, তখন নজরুল তাকে ব্যঙ্গ করে লিখলেন, "রাজা শুধুই রাজা হবেন/পথার পারে নির্বাসন/রাজা নেবে দু-ভাই মিলে মুর্খোজন আর দুঃশাসন।/... ছিঁড়ে চাল কাঁড়াই হোক, আর/এঁকড়া-ভাই ভোলার ভয়/ভাই চিরিয়ে জল খেয়ে খাব/ভ্যানও পরি অতঃপর। ... বন্দিনী মা ছিলেন আর/আজ নিয়েছে মুক্তি রে/বাজাও বাজাও মাদল নামে/রক্ত চলো বুক চিরে।" (ডোমিনিয়ন স্টাটাস) আপোষকামী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন 'রাষ্ট্রীয় টেবিল কন্‌ফারেন্স' বসে কবিতায়, 'স্বাধ আজে, ইংরেজে ঐ চলল পিতার্স এন্ড কোং/শকুন মাতুল, কালনেমী-কংগ্রেস লাউড স্পিকার চোর।/_ ঘুমতে তুলো কাপড় ঠাঁই/ডোমিনিয়ন তোমরা যাও/... যাও নেবে পাঠ দেশের কি-সত্ত সব পুরনো যায়।" ইংরেজ শাসকদের কাছে মুসলিমলিগ ও কংগ্রেসের আপোষকামী নেতৃবৃন্দ বারে বারে আবেদন করে ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করেছেন। এঁদের প্রতি নজরুলের ঘৃণা ছিল অপরিসীম। বিদ্রোহীর ঋণী কবিতায় বলছেন, "লোহাই ভেদের এবার তোরা সত্য করে সত্য বল/পেটের ভেতর ছুরিই নাকি, মুখে বলিস, স্বরাজ চাই।/'স্বরাজ' কথার মানে তোদের জন্মেই হয়ে গেছে স্বরাজ তাই।/'ভারত হবে ভারতবাসীর' — এই কথাটাই বলতে ভয়।/সেই বুড়োদের বলিস নেতা — তাদের কথায় চলতে হয়।/বলবে ওরা বল নবীন/চাই না এমন জ্ঞান প্রবীন/ব-স্বরূপে দেশকে এরা করছে ক্লীব দিনকে দিন।/চায় না এরা হই স্বাধীন।/কর্তা হবার শখ সবারই, স্বরাজ-করাজ ছল কেবল/ফাঁকা প্রেমের ফুলমরজা, মুখ সরল আর মন গরল।"

তাই বলি, নজরুল শুধু একজন গীতিকার বা একজন বিদ্রোহী কবি নয়, তিনি ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে আপোষহীন সৈনিক; তিনি স্বপক্ষে সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের বুকে হৃৎকম্প জাগিয়েছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। শ্রমিক কৃষকের রাজ কায়েম করার জন্য রুশ বিপ্লবের আদর্শকে সামনে রেখে সমাজ পরিবর্তনের যে লড়াই হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে আমাদের প্রেরণার অফুরন্ত সম্পদ 'নজরুল ইসলাম'। তাঁর জন্মশতবর্ষে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে তিনি আমাদের পথের দিশারী হয়ে মনোজগতে অনেক অনেক দিন ধরে অমর হয়ে থাকবেন।

□

[illegible]

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলকাতা - ১
ফোন : ২৩৫৫-৭৫৩২

এর **পুরী ও দিঘায়**

মনোরম পরিবেশে হলিডে হোম

বুকিং-এর জন্য সোসাইটির কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

With Best Compliments From :

The Postal Co-operative Credit Society of Calcutta Ltd.

(Regn. No. 115 of 1915)

Estd. 1916

G.P.O. BUILDINGS
CALCUTTA-700 001

Phone : 210-5337 (Direct)
210-5601 (Ext. 26)

"সমবায় আন্দোলনকে
গ্রাম শহরের
জনজীবনে
প্রসারিত
করার লক্ষ্যে
আমরা
অঙ্গীকার বদ্ধ"

ক্যাসতাটা টেলিফোন্‌স ডিস্ট্রিক্ট
কো-অপারেটিভ লিমিটেড
৮, মেয়ার স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০০১
ফোন : ২৪৮-০০১১

বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করার জন্য
হলিডে হোম। হলিডে হোম। হলিডে হোম।

সমুদ্র সৈকত
পুরী

সমুদ্র তীরবর্তী বাজারের কাছে মনোরম পরিবেশে রান্নার গ্যাস সহ সকল সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রে সজ্জিত তিন তলায় পৃথক স্যুট।

দিঘা

সমুদ্রের কাছে পুরোনো অভিজাত পাড়ার রান্নার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সহ দোতলায় পৃথক স্যুট।

বুকিং ও আরো জানতে যোগাযোগ করুন

দি ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট এমপ্লয়িজ
কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
১৫, স্ট্রান্ড রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১
দূরভাষ : ২২০-৩৪৪১ (এক্সটেনশন-২৭৮/২৭৯)

এখানে মূল্যবান
কাঠের খাট, আলমারি,
ড্রেসিং টেবিল, সোফাকাম বেড,
কাঠের যাবতীয় আসবাবপত্র
এবং প্লাস্টিকের চেয়ার, টেবিল
যাবতীয় আসবাবপত্র
অতি যত্ন সহকারে ও
সুলভমূল্যে
সরবরাহ করা হয়।

প্রোঃ- অরুন মান্না

প্রবন্ধ

ইন্টারেস্টিং

বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

১৮৪৩ সালে ইংল্যান্ডে মাসিক মাত্র ১০ পাউণ্ড জমায় ঘর নিয়ে শুরু হয়েছিল "দি রচ্‌ডেল পাইওনিয়ার্স সোসাইটি"। ২৮ জন তাঁতির প্রচেষ্টায় গঠিত এই সমিতিটি কিন্তু সমবায় আইনে নিবন্ধীকৃত হয়নি, কারণ ১৮৪২ সালের আগে ইংল্যান্ডে সমবায় আইন বলে কিছু ছিল না। সমিতিটি "ফ্রেন্ডলি সোসাইটিস এাক্ট" — এ নিবন্ধীকৃত হয়।

এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম নয় — এর আগেই ১৭৬০ সালে সেখানে প্রথম সমবায় ময়দা কল চালু হয় তবে তা স্থায়ী হয়নি। "রচ্‌ডেল"কেই পরিচিত যে পাইওনিয়ার বলা হয় কারণ : ১। তাঁরাই এ ব্যাপারে স্থায়ী সাফল্য অর্জন করেন ; ২। তাঁরাই এটিকে এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসাবে চালু করতে সক্ষম হন এবং এর প্রভাব শুধু ইংল্যান্ডে সীমাবদ্ধ না থেকে পরে পরে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে ; ৩। সমিতির মাধ্যমে পণ্য বিক্রয়ই এঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না-এঁদের লক্ষ্য ছিল অনেক ব্যাপক ও গভীর ; এবং ৪। এঁরাই সর্বপ্রথম সমবায়ের নীতি রচনা করেন এবং সেগুলির প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

★

সুইডেনে সমবায় প্রচেষ্টায় গঠিত প্রথম প্রতিষ্ঠান হল District Commodity Buying Company। এটি চালু হয় ১৮৫০ সালে। কানাডায় প্রথম সমবায়-Dominion Grange গঠিত হয় ১৮৭৭ সালে। ডেনমার্কে সমবায় আন্দোলন চালু করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দেন H. C. Sonne নামে এক সমাজসেবী। তাঁর প্রচেষ্টায় ডেনমার্কের প্রথম সমবায় "Thisted Workers Society" চালু হয় ১৮৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি। ভারতের প্রথম সমবায় "Triplicane Urban Cooperative Society" গঠিত হয় মাদ্রাজে ১৯০৪ সালে। চীনে ১৯১৯ সালে গঠিত হয় "Sanghai National Cooperative Savings Bank"। ইস্রায়েলের সমবায় আইনে নিবন্ধীকৃত প্রথম "Hevrat Ovdim"-এর জন্ম ১৯২০ সালে।

★

রচডেল পাইওনিয়ার্সের ২৮ জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। যথার্থই তাঁকেই প্রথম মহিলা সমবায়ী বলা যায়।

জাপানে ১৯৯৫-৯৬ সালে মহিলা সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৮,১৭১টি এবং সদস্য ছিলেন ৬,৯২,৬৪৯ জন।

মহিলা সমবায় বা সমবায়ীদের কথা বলতে গেলে পোল্যাণ্ডের কথা বাদ দেওয়া চলে না। পোল্যাণ্ডের মহিলা সমবায়ীর সংখ্যা এখন কতজন সে পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই তবে ২৫ বছর আগে ('৭০ সালে) ঐ সংখ্যাটি ছিল ভারতের বর্তমান মহিলা সমবায়ীর সংখ্যার প্রায় ৮ গুণ-৫৪,৪৪,০০০ জন। পোল্যাণ্ডের শহরাঞ্চলীয় ক্রেতা সমবায়গুলির মধ্যে শতকরা ৬১ জন মহিলা সদস্য। সমিতি পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁরা পিছিয়ে নেই-সে দেশে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্যে শতকরা ২২ জনই হলেন মহিলা। আরও আছে, কর্মীদের মধ্যে মহিলা-পুরুষের অনুপাত হল ৫০ : ৫০।

★

সমবায় আদর্শ ও ভাবধারা এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তিনটি মাধ্যম হল। ১। সমবায়ী আধিকারিকবৃন্দ, ২। খ্রিস্টান মিশনারিবৃন্দ, এবং ৩। কিছু সমাজসেবক। সমবায়ী আধিকারিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় স্যার হোরেস প্লাংকেটের। জার্মানির সমবায় আন্দোলন প্রত্যক্ষ করে ফিরে এসে ১৮৯৬ সালে তিনি যে প্রতিবেদন পেশ করেন তার ভিত্তিতেই শুরু হয় ভারতবর্ষের সমবায় আন্দোলন।

সরকারি আধিকারিকদের মধ্যে সি এফ স্ট্রিকল্যাণ্ডের নামও উল্লেখযোগ্য। একদা তিনি সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধক ছিলেন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ শাসনাধীন প্যালেস্টাইনে ভারতবর্ষ থেকে সমবায়ের আদর্শ বহন করে নিয়ে যান।

কানাডায় সমবায় আন্দোলনের প্রচারে কুইবেক-এর এক সাংবাদিক অলকনন্দো হেন্স্ ভার্ডিন্স-এর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইওরোপের সমবায় আন্দোলন ভার্ডিনকে প্রভাবিত করেছিল।

বোস্টনবাসী এক বণিক-এডওয়ার্ড ফিলেন ভারত ভ্রমণকালে সমবায় আন্দোলনকে প্রত্যক্ষ করে উৎসাহিত বোধ করেন এবং পরবর্তীকালে হেন্স্ ভার্ডিন্স-এর সহায়তায় ম্যাসাচুসেটসের আইন সভাকে প্রভাবিত করে সেখানকার ক্রেডিট ইউনিয়নকে আইনসঙ্গত স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করেন (১৯০৯ সাল)।

★

শুধু ভারতবর্ষই নয় — ইতালি এবং জাপানের সমবায় আন্দোলন ও জার্মানির কাছে ঋণী। ইতালির সমবায় আন্দোলনের রূপকার হিসাবে দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য — Luigi Luzzati এবং Dr. Leone Wollemburg Luzzati ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। দেশবাসীর দারিদ্র্যে বিচলিত হয়ে এবং জার্মানির সমবায় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন এবং আরও গভীরভাবে জানার জন্য জার্মানি যান। ফিরে এসে তিনি শহরাঞ্চলের নিম্ন শ্রমিকদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। তাঁরই নেতৃত্বে ১৮৬৬ সালে মিলান শহরে প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক চালু হয়।

Wollemburg এর কিন্তু পছন্দ ছিল Raiffeisen ধরনের আন্দোলন। Dr. Wollemburg এর উদ্যোগে তাঁর নিজের গ্রাম Loreggia তে ১৮৮৩ সালে প্রথম সমবায় ব্যাঙ্ক চালু হয়।

১৯০০ সালে জাপানে "Industrial Cooperative Law" পাশ হয়। এই আইনটি জার্মানির আইনের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়।

★

ঋণ সমবায় গঠন করার ব্যাপারে হ্রাস হল পথ-প্রদর্শক। হ্রাসে 'ফুল কো-অপারেটিভ' চালু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। এর নামটিও খুব সুন্দর এবং বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ - "The

Little Bees।"

ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশ। তবে এ ব্যাপারে আর এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে লাটিন আমেরিকার দেশগুলি। ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনায় "স্কুল কো-অপারেটিভ" কে আবশ্যিক ঘোষণা করা হয়েছে। এল্ সাল্ভাডরে ১৯৫২ সালে এক আইন পাশ করে সমবায় শিক্ষাকে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ করে তোলা হয়েছে এবং 'স্কুল কো-অপারেটিভ'গুলির উন্নয়ন ও পরিদর্শনের ভার দেওয়া হয়েছে দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকের হাতে।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সমবায় শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বিরোধিতা করে মাকলাগান কমিটি। তাদের বক্তব্য ছিল "It has been urged that in order to instill cooperatives into the minds of the rising generation, the subject should be taught in primary schools. To this we are opposed....." সমবায় আইনে সমবায় শিক্ষার সংস্থান সর্বপ্রথম গ্রহণ করে Greek Act of 1915 এ।

★

জার্মানির মোট পশমের (wool) ৮০-৯০ শতাংশ বিক্রয় হয়ে থাকে সমবায়ের মাধ্যমে। অনুরূপভাবে জার্মানির মোট চিজের (cheese) ৬০-৭০%, ফ্রান্সের মোট গমের ৮০-৯০%, এবং সুইডেনে মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রায় ৯০% শতাংশ বিক্রি হয়ে থাকে সমবায়ের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে বিমা ব্যবস্থাটি রাষ্ট্রায়ত্ত কিন্তু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত কিন্তু উন্নত দেশে সমবায় আন্দোলনের মেরুদণ্ড হল বিমা সমবায়। আমেরিকার কৃষি সংস্থাগুলির প্রায় ৫০ শতাংশ সমবায় বিমা ব্যবস্থার সুরক্ষাধীন।

ভারতবর্ষে সমবায় বিদ্যুৎ সংস্থার ইতিহাস মাত্র এক দশকের মত, সংস্থা মাত্র ৫২টি এবং ১৪-১৫ সাল পর্যন্ত মাত্র ৬,০০৯ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমবায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাটি দেশ পুরানো এবং ৪০ লক্ষেরও বেশি কৃষি খামারকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

ভারতবর্ষে মোট সমবায় সমিতির সংখ্যা প্রায় ৪.৫ লক্ষ, সদস্য সংখ্যা ২০৪ মিলিয়ন। দেশের মোট চিনি উৎপাদনের ৬০ শতাংশ আসে সমবায় চিনিকলগুলি থেকে। হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রের উৎপাদনে সমবায়ের অবদান মোট উৎপাদনের ৫৫ শতাংশে। ৮৫ হাজার প্রাথমিক আবাসন সমিতির মাধ্যমে ইতিমধ্যে ১৫ লক্ষ ইউনিট বসবাস নির্মিত হয়েছে এবং আরও ৫ লক্ষ ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলছে। সর্বোপরি মোট কৃষিঋণ দানের মধ্যে সমবায়ের অংশ ৬০.০৫%।

★

সক্রিয় সদস্যতা সমবায়ের মূলমন্ত্র। তাদের এই সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিউজিল্যান্ডে নিষ্ক্রিয় সদস্যদের টাকা বাধ্যতামূলকভাবে কেড়ে নিয়ে নেওয়া হয়। ডেনমার্কে সমবায় সমিতিগুলিকে ২০ বছর অন্তর ভেঙে দেওয়া হয় এবং উৎসাহী সদস্যদের নিয়ে নতুন করে গঠন করা হয়।

তবে এ ব্যাপারে এল সালভাডোরের পদক্ষেপটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনও সদস্য পরপর দুটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ খারিজের সংস্থান আছে ঐ দেশের আইনে।

★

সমবায়ের প্রতি সদস্যদের অনীহা শুধু যে আমাদের দেশের সমস্যা তা নয়। 'রচডেল পাইওনিয়ার্সের দেশ খোদ ইংল্যান্ডেও এটি একটি বিশেষ সমস্যা। এক সময়ে সে দেশের সমবায় ভাণ্ডারগুলির সাধারণ সভায় উপস্থিতির হার নেমে যায় শতকরা ০.২০ ভাগে। বিশেষজ্ঞের বিশ্লেষণ অনুযায়ী "with regard to attendance in meetings there appears to be no organisation with such low rate of member participation" — অর্থাৎ মিটিংয়ে উপস্থিতির বিচারে এরকম আর কোন প্রতিষ্ঠান নেই যাতে এত কম সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করে। ঐ একই সূত্র থেকে জানা যায় যে সমবায় সমিতিগুলির প্রায় ৯১ শতাংশ সদস্য তাঁদের সমিতির একজন ডাইরেক্টরেরও নাম জানেন না এবং প্রায় সমসংখ্যক সদস্য "রচডেল পাইওনিয়ার্স" কারা ছিল বলা হয় তাও জানেন না। (Ostergaad and Halacy Power in Cooperatives)

★

সুইডিশ হোলসেল সোসাইটি K.F. নামেই নামেই বেশি পরিচিত। K.F. এবং তার প্রাথমিক সমিতিগুলির সম্মিলিত কর্মী সংখ্যা এত বেশি যে বিক্রেতাকারী হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয় — দেশের সরকারের পরেই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা হল K.F. এবং তার কর্মীদের সম্পর্ক খুবই ভাল এবং কর্মিদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে তারাই দেশের পথিকৃৎ। ১৯০৬ সালে K.F. তার কর্মিদের জন্য ৮ ঘন্টা কাজের প্রচলন চালু করে। সুইডেনে দিনে ৮ ঘন্টা কাজের জন্য আইন পাশ হয় ১৩ বছর বাদে — ১৯১৯ সালে। ১৯০৭ সালে K.F. সপ্তাহে ২ দিন ছুটির যে নিয়ম চালু করে সেটিই পরে আইন হিসাবে পাশ হয় ১৯৩৮ সালে।

★

পেষণ ও বয়নায় পটভূমিকায় এবং পেষণ ও বয়নায় প্রতিযোগ হিসাবেই যে আন্দোলনের জন্ম তার মধ্যেও আমার দাবি আদায়ের ভাংগোন গড়ে উঠবে — এটা অনভিপ্রেতই নয়, কিছুটা স্ব-বিরোধীও। কিন্তু তাও ঘটেছে এবং তাও অল্প নয়, বহুদিন আগেই। সমবায় কর্মচারিদের প্রথম সংগঠন গড়ে ওঠে লন্ডন ও কন্টনে ১৮৮৭ সালে। পরে এর থেকেই গঠিত হয় Amalgamated Union of Cooperative Employees - ১৮৯৫ সালে।

★

ফিজি দ্বীপ এবং আফ্রিকার কিছু দেশে 'অবেক্ষাধীন সমিতি' (probationary societies) বলে একটা ব্যাপার আছে। অবেক্ষার সময়কাল সাধারণত ২ বছর। এই নিরীক্ষাবিধির সময়ে ভালভাবে কাজ করতে পারলে এবং উন্নয়নের বাসনা রাখতে পারলে তবেই নিবন্ধীকরণে ইচ্ছুক সমিতিকে অনুমোদন ও স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

★

'রচডেল পাইওনিয়ার্স' নীতি নির্ধারণ করেছিলেন যে কারবার ওটানোর সময় সমিতির নিট সম্পদ সদস্যদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে না — ঐ সম্পদ অন্য কোন সমিতিকে বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে দান করা হবে। পরবর্তীকালে এই নীতিটি অবশ্য সমর্থন লাভ করেনি। যদিচ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমিতির উপবিধিতে এ বিষয়ে কর্তব্য-করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ থাকে। কিন্তু ইতস্ততভাবে কোন ভাল এবং চলু সমিতির কারবার গুটিয়ে ফেলার কথা শুনেছেন কি? হ্যাঁ, তার উদাহরণও আছে। সমিতির সম্পদ সদস্যদের মধ্যে বিতরণের মাধ্যমে মূলধনী লাভ (Capital Gains) হিসাবে মোটা টাকা লাভের জন্য অভিনব প্রয়াসের "Olympia Veneer

Cooperative" এর সদস্যগণ সমিতিটির কার্যভার গ্রহণ করেন।

★

যুগোস্লাভিয়াতে সমবায় কৃষি বিপণন সমিতি গড়তে হলে একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার ও কৃষিবিদসহ অন্যান্য পরিচালন ও কারিগরী কর্মী থাকা আবশ্যকমূলক।

★

"আমরা একটি বিপণন সমবায় সমিতি পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। মুনাফা অর্জনের সূত্রে সমিতিটি পরপর কেশ কিছু বছর যাবৎ 'এ' শ্রেণীভুক্ত। যদিও ঐ সমিতির কেশ কিছু সদস্য উৎপাদক তথা বিক্রেতা সমিতি কিন্তু তাদের থেকে মাল কেনে না, কেনে সরাসরি ফড়িয়াদের থেকে।" - কমিটি অন কো-অপারেশন (১৯৬৬)।

★

ডেনমার্কের সমবায়গুলি খুবই শক্তিশালী। কোন কোন পণ্যের বৈদেশিক রপ্তানিজাত ক্ষেত্রে শতকরা ৯০ ভাগ অংশই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই সমবায় সমিতিগুলি এতটাই ক্ষমতাসম্পন্ন যে ইচ্ছা করলে তারা কনুইয়ের এক গুঁতোয় ব্যক্তিমালিকানা ক্ষেত্রকে হটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু তারা তা চায় না। তারা চায় ব্যক্তিমালিকানা ক্ষেত্রও থাক। সমবায়ের সাথে সহাবস্থানের জন্য তাদেরও উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

★

সমবায় আন্দোলনের দ্বিতীয় নীতিটি হ'ল সভ্যপদের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বলতে আমরা বুঝি 'এক সদস্য, এক ভোট।' কিন্তু কোন কোন দেশের আইন ও প্রচলিত ব্যবস্থা অন্যরকম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সমবায় কৃষি বিপণন সংক্রান্ত Capper Valstead Act of 1922 অনুযায়ী 'এক সদস্য, এক ভোট' – এই ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়; শুধু মূলধনের ওপর ৮ শতাংশের বেশি লভ্যাংশ না দিলেই হল। ১টি প্রাদেশিক আইনে 'এক সদস্য, এক ভোট' ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, অপর কয়েকটি ক্ষেত্রে 'মূলধনের আনুপাতিক ভোটাধিকার' বাধ্যতামূলক। আবার ১৪টি প্রদেশে "প্রক্সি ভোট" অনুমোদিত।

সোভাকিয়ার তামাক বিপণন সমিতি - Tobacco Cooperative Company of Brenersdorb এর কাছে সকল তামাক-চাষীকেই তাদের উৎপাদিত তামাক বিক্রি করতে হয় কিন্তু ঐ তামাক-চাষীদের না আছে সমিতির ব্যবস্থাপনায় কোনও অধিকার, না আছে সদস্য হওয়ার অধিকার।

★

ডেনমার্কের হোলসেল কো-অপারেটিভের সদস্য তালিকায় আছে কেশ কিছু প্রাইভেট কোম্পানি। এরা 'N' শ্রেণীভুক্ত সদস্য। এরা হোলসেল থেকে জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু এদের কোন ভোটাধিকার নেই। যাতে বিক্রি বাড়ে অথচ সমবায়ের পরিচালন ব্যবস্থায় বাইরের কোনও হস্তক্ষেপ না থাকে সেজন্যই এই ব্যবস্থা।

★

ভারতের গ্রামাঞ্চলের সমবায় নেতৃত্ব সম্বন্ধে এক সমীক্ষায় জানা যায়:

১। সভাপতিদের অধিকাংশেরই বহু জমিজমা,

২। সকল সভাপতিই প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের (dominant caste) লোক,

৩। সভাপতি নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে হয় – সভাপতি নির্বাচন একটি অনুষ্ঠান বা প্রথায় পর্যবসিত হয়েছে,

৪। পরিচালকমণ্ডলীর অধিকাংশে সদস্যের রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে।

(V. Mahta National Institute of Coop. Management Cooperative Perspective)

"১৯২৭ সালে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী সমবায় কেন্দ্রীয় কোষের একজন সভ্য ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কর্মজীবনে তখন এই ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করতে যাই, তখন খুব কৌতূহলী হয়ে প্রথমেই সেখার রেজিস্টার দেখেছিলাম। দেখে মনে-প্রাণে শিহরণ জেগেছিল। সভ্য তালিকার অনেকের নাম ছিল – রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ও আরো অনেকের। স্বাক্ষরের জায়গায় সবাই সই করেছিলেন। কেবল রবীন্দ্রনাথের কোন সই ছিল না। অডিট করতে গিয়ে কোনও এক সমবায় অডিটর স্বাক্ষরের এই খালি জায়গায় লাল পেন্সিল দিয়ে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ সই নেই কেন? আইনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে সই করা সত্যিই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন এই সরকারি কর্মচারির লাল পেন্সিলটিকে অত্যন্ত হৃদয়হীন, মমতাহীন বলে মনে হয়েছিল। যে সমবায়ের প্রতিটি নীতিতে রবীন্দ্রনাথের নিঃশ্বাস আজও রয়েছে, সমবায় নববিধানের প্রতিটি পাতায় যাঁর স্বাক্ষর, তাঁরই স্বাক্ষরের জন্য সরকারি লাল পেন্সিল..."

(রবীন্দ্রনাথ ও সমবায় আন্দোলন – মিহির চৌধুরী : আকর-ডিসেম্বর, ৭৬)

□

নবোদয় তাল-খেজুর গুড় শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম : বাগদালিয়া ★ পোঃ কলাতলাহাট ★ থানা - ডায়মণ্ডহারবার
জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

উন্নতমানের তালগুড়, খেজুর, পাটালি প্রস্তুতকারক। সুলভিসম্পন্ন তালপাতার পাখা, টুপি, ফুল ও তাল আইসের মুখোশ উৎপাদিত ও ন্যায্যমূল্যে পাওয়া যায়।

প্রসন্ন দাস
সম্পাদক

দিলীপকুমার সামন্ত
সভাপতি

With Best Compliments From :

JALPAIGURI CO-OPERATIVE AGRICULTURE & RURAL DEVELOPEMENT BANK LTD.

THANA ROAD, JALPAIGURI

A Leading Long Term Lending concern in Jalpaiguri Sadar Sub-Division

K. K. HORE	G. P. SINGHA	S. BASU CHOUDHURY
Chairman	*Vice-chairman*	*Chief Executive Officer*

For Grace Beauty and Elegance
Buy
Bengal Silk
From
Resham Shilpi

PASCHIM BANGA RESHAM SHILPI SAMABAYA MAHASANGHA LTD

Under C & S.S.I. Department, Govt. of West Bengal & Certified by Khadi & Village Industries Commission

Please step in :—

- 12/1, Hare Street, Calcutta- 700 001
- 11/A, Esplaned East, Calcutta-700 029
- 159/1A, Rash Behari Avenue, Calcutta-700 029
- 93, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-700 007
- 156, Bidhan Sarani, Calcutta-700 006
- G-24, DS-III Manicktola, Civic Centre, Calcutta-700 054
- Colony More, Barasat, 24 Parganas (North)
- P-122, Raja S. C. Mullic Road, Garia, 24 Parganas (South)
- Baruipur Super Market, Baruipur, 24 Parganas (South)
- Nachan Road, Benachiti, Durgapur-13
- 30, Raha Lane, Asansol
- A-2/14, Netaji Market, P.O. & Dist - Malda
- Q-19, Durgachak Super Market, Haldia, Dist.-Midnapore

Contact Executive :

SHRI U.S. CHOWDHURY (Managing Director)
Phone : (O) 248-2833, (R) 321-9735, Fax : 0732185700

Wishing Every Success
of
Cooperative Movement

THE NEW PROGRESSIVE LABOUR COOPERATIVE CONTRACT AND CONSTRUCTION SOCIETY LTD.

OODLABARI, P.O. - MANABARI
DIST. - JALPAIGURI

With Best Compliments From :

Cellular	9831026279
Off	220-5655
Resi	468-7203
Godown	337-8102

EXPO CONSTRUCTION

Dealers of Government Disposal Materials' (Ferrous & Non-ferrous) & used contaminated Oil

Official Correspondence
13, Beni Master Lane
Behala
Calcutta-700 061

City Office
5, Clive Row (Dr. Rajendra Prasad Sarani)
3rd Floor, Room No. 75,
(Sarva Mangala House), Calcutta - 700 001

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

Lokenath Bastralay

DURGAPUR ● BALLY ● HOWRAH

With
Best
Compliments
From :

M/S. DYNAMIC MOULDERS

BALLY □ HOWRAH

প্রবন্ধ

হাতিপাওয়ার সবুজায়ন

দীপালি ঘোষ

বছর চল্লিশেক আগেও মধ্যপ্রদেশের কাবুয়া শহরের কাছে হাতিপাওয়া অঞ্চলের ছোট পাহাড় ও টিলাগুলি ছিল ন্যাড়া। মাটিগুলির মত ওরা, কণাকণাহীন। এই অঞ্চলটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে পড়লেও অত্যধিক পশুচারণ ও আগুন সবুজ জায়গাটিকে পাহাড়ের সমস্যায় যা বনাঞ্চল গড়ে তোলার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। কাবুয়া শহর থেকে মাইল কয়েকের মধ্যে অবস্থিত টিলাগুলি পরিবেশ রক্ষণে বিশেষ উপযোগী। প্রায় দশটি জলাধারের জন্য এটি ক্যাচমেন্ট বা জলগ্রহণ নালা বা শহর। কাবুয়ার জলধারাটির জলও এখান থেকে আসে।

আজ কিন্তু হাতিপাওয়া একটি আদর্শ অবস্থাটিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে, সাধারণভাবে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে বনসৃজন হয়েছে এবং ঘাসের উৎপাদন লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। হাতিপাওয়া ও তার সন্নিহিত অঞ্চলগুলির পরিবেশ পুনরুদ্ধার অনেকাংশে সফল হয়েছে বনাঞ্চল ও নদী অববাহিকার যৌথ পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে।

যদিও উক্ত জেলাটির এক-চতুর্থাংশে বনাঞ্চল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। তবু প্রায় আশি শতাংশে বনাঞ্চলের দ্রুত অবনতি ঘটেছে। প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃক্ষহীন। ১৯০৮ সালের রক্ষা গেজেট জানাচ্ছে, কাবুয়া একটি পাহাড়ী অঞ্চল, গভীর বনে ঢাকা। পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের মতে মাটির উপরিস্তরের প্রতিনিয়ত ক্ষয় এবং অনিয়ন্ত্রিতভাবে গাছপালা কেটে ফেলা কাবুয়াকে নিম্নিত অঞ্চলের নুড়ি পাথরে ভর্তি কতকগুলো ন্যাড় টিলাতে পর্যবসিত করেছে। প্রতিনিয়ত খরা এবং ক্ষয়ের সমস্যার জন্য এই জেলাটি বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

বর্তমানে যৌথ বনাঞ্চল পরিচালন ব্যবস্থা স্থানীয় গ্রামীণ অধিবাসীদের গ্রাম কমিটির মারফত বনাঞ্চল বৃদ্ধি, রক্ষা ও সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার অংশ নিতে বাধ্য করতে পেরেছে। গ্রামের ৩৪৪টি কমিটি প্রায় ষাট শতাংশে বনাঞ্চল সেচ্ছাসেবা করছে। এই কমিটিগুলির মোট সদস্য সংখ্যা হচ্ছে ৭২,৬৫৩ তার মধ্যে ২৯,৭০৩ জন মহিলা।

পরিকল্পনা মাফিক পরানি-পত্ত বিভাগ ঘাস উৎপাদনের উন্নতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছে। এই প্রথম এ বছর (১৯৯৭) কাবুয়া জেলায় হাতিপাওয়া অঞ্চল ঘাস উৎপাদনে স্বাবলম্বী হয়েছে এবং উদ্বৃত্ত ঘাস পাশাপাশি জেলাগুলিতে রপ্তানি করছে। কমিটিগুলি নিয়মিতভাবে বনাঞ্চল পরিদর্শন করে, ফলে যে-কোইনি গাছ্ কাটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় ৭৫০০০ হেক্টর দ্রুত ক্ষয়শীল বনাঞ্চল কোন অর্থ ব্যয় না করে শুধুমাত্র 'সামাজিক বেড়া' দিয়ে অর্থাৎ সমাজ দৃষ্টিতে তত্ত্বাবধেক করে বনাঞ্চল পুনরুদ্ধারে অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে।

এরপর ফাটিরোবা গাছ বা টিলাসুন্দর গাছের বীজ রোপণ করা দিতে শুরু করেছে। ফাটিরোবা বীজ নিয়ন্ত্রণে একজনের তেল বের হয় এবং সেটা দিয়ে সাবান তৈরী হয়। ওই বীজের রাসায়নিক পদার্থ পেট্রো-লস্য বা অনিষ্ট পদার্থ অবশ্য বাইরে যেত। ফাটিরোবা উদ্ভিদ ভূমিক্ষয় রোধ করে জমির উর্বরতা বাড়িয়ে নিয়েছে। বাঁশ, নিম, আমলা ইত্যাদি গাছের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মাটির ওপর অঞ্চলের জলধারণ ক্ষমতার ক্রম অবনতি বন্ধ করা হল প্রচুর পরিখা কেটে, পাথরের বাঁধ দিয়ে, বড় বড় পাথর ফেলে জল আটকে এবং ঘাস ও পরানি পত্তর খাদ্য উৎপাদন করে। পরিবর্তনশীল অঞ্চলগুলোর চরিত্র নিয়ন্ত্রণ করা হল জলধারা নালা, বাঁধ, পরিখা তৈরী করে ও বহুল পরিমাণে রোপণ করে। যে সব জায়গা দিয়ে জল না দাঁড়িয়ে চলে যায়, সে সব জায়গায় বালিয়া, ওপ্ত চাষ ও ভূমিক্ষয় বনাঞ্চল তৈরী ও নালা দিয়ে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সমুজায়নের চেষ্টা চলছে।

১৯৮৭ সালে মিত্তির সেটার ফর সায়েন্স এণ্ড এনভায়রনমেন্টের সুনীতা নারায়ণ ও অনিল আগরওয়াল কাবুয়া পরিদর্শনে এসে খুব হতাশ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'সব কিছু একেবারে শেষ হয়ে গেছে।' তখন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয় গান্ধী অনিল আগরওয়ালকে সংসদ পরিষদের সামনে সব কিছু খুলে বলতে বললেন ১৯৮৮ সালে উনি যাকি বলেছিলেন, কাবুয়াতে যে সর্বনাশ ঘটে গেছে, সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটবে সমস্ত দেশে যদি সমস্যোচিত ব্যবস্থা নেওয়া না হয়। কিন্তু ১৯৯৭ সালে কাবুয়া পরিদর্শনের পর ওই অঞ্চলের অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখে সুনীতা নারায়ণ ও অনিল আগরওয়াল একেবারে মুগ্ধ।

সুনীতা নারায়ণ বলেন, ১৯৮০ সালে যেসিয়ালগ জল অববাহিকা অঞ্চলের উন্নতি এবং অধিকৃত জায়গাগুলির উন্নয়নের পরিকল্পনা সেরকমভাবে কার্যকরী হয়নি। বৃক্ষরোপণ পরিকল্পনা কৃতকার্য হয়নি। সাহায্য যা পাওয়া গিয়েছিল ত্রুটিপূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার জন্য সেগুলো কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু কাবুয়ার যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছিল সেগুলি খুবই কার্যকরী হয়েছে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, টাকা সরাসরি ব্যবস্থাকারীদের পকেটে গেছে। ওদের ক্ষমতা ও প্রভাব আছে বনদের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় রাখতে সুনীতা আরও বলেন, ঘাস ও ওপ্তানির চাষ আর্থিক সহায়তা করেছে। এই ঘাস-ওপ্তের নিবিড় চাষের ফলে পরানি পত্তর খাদ্য ও জমির উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে। কাবুয়ার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার অভূতপূর্ব দিক হচ্ছে সরকার এমনভাবে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করছে যেগুলো সাধারণত কেন্দ্রকরী প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকে।

সুনীতা নারায়ণ মনে করেন, কাবুয়ার পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ধরে রাখা উচিত। যেহেতু স্থানীয় লোকেরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্জন করেছে। তাই সেটা পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে এবং সেটা হবেও। যথার্থ রাজনৈতিক বার্তা এবং অভ্যুত্থানের নিরেই পরিকাঠামোর পরিবর্তন আসবে।

স্থানীয় জনসংখ্যার অধিকাংশ ভীল এবং ভীলালা সম্প্রদায়ের। এই পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে রয়েছে একই জনের সামাজিক

জীবনযাত্রা। কারণ আজ একইরকম সামাজিক সুযোগ সম্ভবপরের সুবিধা পেয়েছে, সাফল্য এসেছে তাই হাতে হাতে। জেলা কর অধিকারিক এ বি ওঝা দাবি করেছেন ১২,৮০০ হেক্টর কবজা করে রাখা সম্ভব হয়েছে জমির নীচের জলকে ধরে রেখে। তাঁর মতে, এই প্রকৃতিক পুনরুজ্জীবনের ফলে প্রায় দশ লক্ষ গাছ হাতিপাওয়া ও প্রতিবেশী গ্রামগুলিতে বেড়ে উঠেছে। শ্রী ওঝা কেন্দ্র থেকে 'ঘূর্ণমিত্র' উপাধি পেয়েছেন।

কিছুদিন আগেও ঝাবুয়া অপরাধপ্রবণ এলাকারূপে চিহ্নিত ছিল। আজ ঝাবুয়ার সুধিন। আদিবাসীরা সবাই মিলিতভাবে অপরাধ করার হাতিয়ার একটুকরোর কুঠার যার নাম 'কুলহাড়ি' নষ্ট করে ফেলেছে। আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত তুলে ধরা এবং স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা অনেক বেশি সংখ্যায় "ঠোঙা নি কুলহাড়ি" নামে একটি বাজে যায়। যার মালিকানা ও পরিচালন ব্যবস্থা সবই মহিলাদের হাতে। পনেরো থেকে কুড়ি জন মহিলা প্রতিদিন গ্রামে মিলিত হয়ে একটি করে টাকা সঞ্চয় করেন। এইভাবে সংগৃহীত অর্থ ঋণ দানে উৎপাদন ও অনুৎপাদনশীল বিভিন্ন কাজে ঋণ দাদন দেওয়া হয়। এই জেলার এখন ৩৫৮টি অনুরূপ ব্যাঙ্ক আছে। এই ব্যাঙ্কগুলি অভাগী আদিবাসীদের আর্থিক শোষণ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ব্যাঙ্ক গ্রামীণ শিল্প, সবজি উৎপাদন, মাছচাষ, মালা তৈরি ইত্যাদি উৎপাদনশীল কাজে সাহায্য করে।

হাতিপাওয়ার সাফল্যের আলোতে আরো অনেক অনুন্নত খরাপ্রবণ এলাকা সফলতার আলোকিত হতে পারে।

● কৃষ্ণকান্ত ঘোষাল : প্রতিবেদন, ১৯৯৭

জনতা কো-অপারেটিভ এগ্রিঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজি। নং - বিঙ- ৪৫ ● তাং - ৩০-১-৫৯

গ্রাম - জোলসরা ● পোঃ - অমৃতবেড়িয়া ● থানা - কেশবপুর

এখানে সকলপ্রকারের আমানত প্রকল্প চালু রয়িয়াছে। স্বল্পমেয়াদি লোন ছাড়া ও মধ্যমেয়াদি লোন দাদন করা হয়। বাহু চাষের জন্য (ট্রাকটরিতে) লোন দাদন করা হয়। এছাড়া কম্পিউটার্স ব্যাঙ্কিং রয়িয়াছে। জনসেবামূলক প্রকল্প হিসাবে আগামী নভেম্বর '৯৮ এম্বুলেন্স ক্রয় করা হবে।

নিমাইচাঁদ পাত্র	জিতেন্দ্রনাথ সাহুক	পঙ্কজকুমার মাইতি
ম্যানেজার	সম্পাদক	সভাপতি

হলিডে হোম সংক্রান্ত

ক) দার্জিলিং ঃ ফেন্ট হাউস - ফ্লাট - হোটেল ম্যাজেস্টিক, ১৬, এম সি রোড, দার্জিলিং

৪টি ঘর দৈনিক হার ১৫০ টাকা, ১৬০ টাকা, ১৭০ টাকা ও ১৮০ টাকা।

ঘরের বিবরণ ঃ

তিন ফ্লাট - রান্না করে খাবার কোন ব্যবস্থা নাই, তবে ঐ ফেন্ট হাউসে সুলভ মূল্যে সকলের জন্য খাবার থেকে রান্নিয়ে আসবার ব্যবস্থা আছে।
খ) পুরী ঃ জগন্নাথী ফেন্ট হাউস - (পুরী হোটেলের কাছে-সী বিচের উপর)। ৩টি ঘর। দোতলায়। ঘরের বিবরণ - প্রতিটি ঘরে ৪ জন করে থাকতে পারবেন। সকলের বাথরুম ও টয়লেট আছে। দৈনিক হার - প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ১৫০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।
গ) দিঘা ঃ সৌরী ফুল - নিমালিক রোড, ওল্ড দিঘা। ২টি ঘর। দৈনিক হার - প্রতিটি ঘর প্রতিদিন ৭০ টাকা হারে। রান্না করে খাবার ব্যবস্থা আছে।

হলিডে হোম বুকিং সমবায় অফিস হতে করতে হবে

ঠিকানা ঃ সি-৪১-৪২, উইলিয়ম কেরী সরণি, (ইন্ডিয়া এয়ারেজ প্রেস)
লালবাজার সমবায় কেন্দ্র (দ্বিতীয় তল), কলিকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২৫-৩৯১৮

With Cooperative Greetings

M/s. Sumit Aluminium

&

Engineering Industries

Bally ★ Howrah

With Best Compliments From :

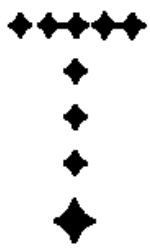

ASHIM MEDICAL CENTRE

NISCHINDA 1 NO. GOVT. COLONY

GHOSHPARA. BALLY. HOWRAH

With Best Compliments From :

Chatterjee Associates

BALLY ● HOWRAH

Prop. : Sudip Chatterjee

M/s. Sushil Industries

BALLY

HOWRAH-711 201

চাঁদের আড়াল

দীপ ভট্টাচার্য

গত দুমাসের মতন একই ঘটনা দেখল শঙ্খ। পে-প্যাকেটটা হাতে পাওয়ার পরেই মাধব মুখুজ্জে টাইপ রাইটারটাকে ঘরে বন্ধ করল। টাইপ করা কাগজগুলো একসারসার গোছ করে নিয়ে কার্বন পেপার আর বাকি সাদা কাগজগুলো ড্রয়ারে রেখে দিল। তারপর কাগজ আর নিজের হাতলওলা পুরনো চামড়ার ব্যাগটা নিয়ে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে গেল বড়বাবুর টেবিলের দিকে। সেখানে কাগজগুলো জমা দিয়ে কী কেন বলে চুপচাপ এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

এতসব করার ভেতর ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট মাধব মুখুজ্জে একটিবারও কারও দিকে চাইল না। একটা বেশি কথা বলল না। একবার একমুহূর্তের জন্যেও থামল না। যেন রিমোট কন্ট্রোল চালানো একটা রোবট। যার কাছে মাপা কাজ, মাপা নড়াচড়া ছাড়া আর কিছু নেই।

মাস তিনেক হল শঙ্খ এখানে চাকরিতে এসেছে। বড় কোম্পানি, ভাল মাইনে। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায় কোম্পানির অভিযান ভাল। যোগান। তাই অফারটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করবার মতন কারণ দেখায়নি। সোজাসুজি এবং সহজেই রাজি হয়ে গেছে।

কস্ট কাইন্ডনেসের রেজাল্ট বেরোবার পর তার প্রোমোশন সিনেমাই কনগ্রাচুলেশন জানাতে এসে এটা-ওটা কথা বলার পর চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল : তারপর মিস্টার? এবার কী ভাল হবে?

সদ্য ভাল রেজাল্ট করতে পারার উচ্ছ্বাস বুকে শঙ্খ ঠিক তেমন করে কী করবে না করবে কিছু ভাবেনি। তাছাড়া আর্থিক অবস্থাও এমন নয় যে তড়িঘড়ি কিছু একটা না জোটাতে পারলে সংসারটা ডুবতে পারবে।

তাই হালকাভাবেই জবাব দিয়েছিল : কী আর করব। যার-যার আর নিজ নিজ কাজে ডিভোশন পাঠাব : ইন রেসপন্স টু ইওর কাইন্ড অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার এইসেভেন, এইসেভেন। নরত বাবা-কাকা-দাদা-মামার লোকের কুটোর লাঠি গলিয়ে যাঁচকা টান মারব : আন্ডারস্ট্যান্ডিং ব্রুর এ রিলায়েবল সেলস্ ম্যান্, এই পর্যন্তই।

ওর কথা বলার ধরনে মজা পেয়ে সিনেমাই হা-হা করে হেসে ফেলেছিল। তারপর হাসি থামিয়ে একটু নড়ুকে টরে বলেছিল : ওভভভ ..., চাকরি করবার ইচ্ছে থাকলে একটা চান পেলেও পেয়ে যেতে পার। অবশ্য সেখানে ডিভোশন দিয়ে নয়। একটা কাগজে তোমার ইচ্ছেটি জানিয়ে মোটামুটি বাঁধা গৎ-এর টিউন মারলেই হবে।

সেই চাকরি। প্রোমোশন সিনেমাইয়ের গলার গলার সোত প্রকাশ বাজোরিয়ার এক্সপোর্ট-ইমপোর্টের বিরাট ব্যবসারিক সংস্থা পি বি ইন্টারন্যাশনালের-এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।

অফিসের বড়বাবুর একবিঘে কাচের কিউবিকলটার ভেতর ওর বসার জায়গা। উঁচু পদ। দায়িত্বের কাজ। কোম্পানির আয়-উন্নতির ভার খানিকটা ওর ওপরও রয়েছে। তাই সাধারণ কর্মচারিদের থেকে সরিয়ে রাখতে ওর চারদিকে এই কাচের গণ্ডি।

এসব ব্যাপারে যেকোন মানুষের বুকের ভেতরটা চাপা অহঙ্কারে টুইটুম্বুর করে। নিজেকে বেশ দামি আর অন্য পাঁচটা কর্মচারিদের থেকে আলাদা রকম মনেও হয়। কিন্তু শঙ্খ জানত মানুষ। মানুষের পরিচয় ওর কাছে মানুষই। তাই কাচের ঘরে থেকেও অবসর পেলেই চোখ রাখে বাইরের লম্বা হলটার কাজ করা অতি সাধারণ আরও কুড়ি-পঁচিশ জন বয়স মানুষের ওপর।

প্রায়েন্টে কার্ব। বয়স অনেক বেশি। বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে পড়ে থাকা মানুষগুলোকে দুজনের কাজ করতে হয় একজনকে। তুলনায় মাইনে অনেক কম। এমন অবস্থার দিনে আর দিয়ে হা-হা সংসারের হাঁ-যোগাতে যেজাতে সবটা চলে গিয়েও কাঁক থেকে যায় অনেকখানি নিরুপায় জীবনে নিজেদের সমস্ত সুখ-আহ্লাদ জলাঞ্জলি দেয় পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে।

এত অভাব। এত দারিদ্রের পীড়ণ, তবু এদের মুখের ভেতর অদ্ভুতভাবে মতন চলবার জন্যে চলছিল, সকাল থেকে সন্ধে অফি যাঁর গৎ-এর কাজের ফাঁকে ফাঁকে সেই রসদরা মাঝে মাঝে চলকে উঠলে শঙ্খ খুশিই হত।

টিফিনের সময়ে অফিসে এরা সুখ-দুঃখের গল্প করে। এ-ওর পেছনে লাগে। অকারণে খুনসুটি করে। তখন হেডমাস্টারদের সহকর্মীরা কেউ পেছনে লাগতে হাসি-মশকরা করলে, কিংবা ক্লাসিদের কোনও মুহূর্তের নকল করে দেখালেও মাধব মুখুজ্জে কোনও সাড়া করে না। শঙ্খা পাবার ভান দেখিয়ে খবরের কাগজটা মেলে ধরে নিজেকে আড়াল করে। কী যেন ভাবে খোঁজে অতিপ্রতি করে।

কাচের গণ্ডির ভেতর থেকে শঙ্খ এইসব দেখে। মজা পায়। মাধব মুখুজ্জের নিত্যদিনের রহস্যময় আচরণে কৌতূহল হয়। কখনও আবার অদ্ভুত মানুষটার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পারে না। স্বভাবগত লজ্জা আর পদ মর্যাদার চশমিয়ে দেওয়া রেখা ওকে দূরেই সরিয়ে রাখে। ফলে জানার ইচ্ছে যত বাড়ে, ততই না পারার আক্ষেপেরে মনে মনে ছটফট করতে থাকে।

গত দু-মাসের মতন আজও মাইনে পাবার পর বাঁধা ছকে মাধব মুখুজ্জে চুপচাপ টাইপের কাগজগুলো জমা দিয়ে ব্যাগ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছিবকেসটা নিয়ে শঙ্খও কিউবিকল থেকে বেরিয়ে এল। পরে কেউ কিছু বুঝতে পারে, তাই কোনও তাড়া দেখাল না। সহজ স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে মাধব মুখুজ্জের পিছু নেবে। সরাসরি হল যেচেই আলাপ করে জেনে নেবে এমন করার পেছনে আসল রহস্যটা কী?

শঙ্খ'র বেরুতে বেরুতে মাধব মুখুজ্জে ততক্ষণে রাস্তায়। খুব সর্তকে নিজেকে আড়াল রাখল শঙ্খ। প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলতে হবে সাবধানে। কেননা কোম্পানির গাড়িতেই ওর যাতায়াত। এভাবে একলা যেতে দেখলে হয়ত সে কিছু সন্দেহ করে সাবধান হয়ে যেতে পারে।

তখন আর রহস্যটা জানা যাবে না।

একটা নিরাপদ দূরত্বে এসেছে এসেছে শঙ্খ দেখল মাধব মুখুজ্জে একটা ব্যাঙ্কের দিকে এগোচ্ছে। দেখে একটু অবাক হল। মানুষটা যা মাইনে পায় তাতে সচ্ছলভাবে সংসার চলাটাই কথা নয়। তাহলে মাইনেটা পেয়েই ব্যাঙ্কে আসে কেন? তাহলে কি কোনও গোপন বিলি ব্যবস্থার জন্য আরও রাস্তা আছে?

রহস্যের গন্ধ পাওয়া শঙ্খ দরজার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল। মাধব মুখুজ্জে কাজ সেরে বেরিয়ে আসার মুখে দেখা হওয়া সময় এমনভাব করবে যেন নিজের দরকারে ব্যাঙ্কে এসেছে বলেই দেখাটা হয়ে গেল। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

মিনিট পনেরোর ভেতরেই মাধব মুখুজ্জে বেরিয়ে এল। বাইরে দাঁড়ানো শঙ্খর একবারে মুখোমুখি পড়ে যেতেই হয়তাম। শঙ্খ কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বলতে গেলে ওপরওলা। তার মতন সামান্য মাইনের মানুষ মাইনের টাকা পেয়েই ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে সেখানে সততা সম্বন্ধে হয়ত সন্দেহ আসতে পারে ভেবে যে যে করতে করতে পান খাওয়া দাঁত মেলিয়ে কাঁদুনাদু হেসে সামাল দেবার চেষ্টায় বলল : এই . এসেছিলুম —।

মাধব মুখুজ্জের সচেতনতা দেখে আরও সাবধানী হল শঙ্খ। একবারে সহজভাবে হেসে বলল : দরকার ছিল বুঝি?

— না —, মানে কিছু টাকা

মাধব মুখুজ্জে ঠোক গিলল। ঠিক কী বলে যে এই অবস্থাটা সামলে নেবে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না। শঙ্খ সেটা বুঝে নিয়ে আগের মতই সহজভাবে জিজ্ঞেস করল : তুললেন কোন হয়?

এবার স্থিরভাবে মাধব মুখুজ্জে শঙ্খর দিকে চাইল। মোটা ফ্রেমের চশমাটা খুলে কোঁচার খুঁটে চোখ দুটো মুছল। তারপর আবার চশমাটা পরে, গলার দুপাশের একটা অদ্ভুত শব্দ করে মুচকি হাসল : স্যার, আপনার মতন সাহেবের পক্ষে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। তবু বলি, কিছু টাকা জমাই দিলাম।

সহজ স্বীকারে শঙ্খ মনে মনে খুশিই হল। আর তাই হোক, মানুষটা আজিমাৎ নয়। খুঁকি তাকলেও হলনা করেনি। তবু মনের ভাবনা গোপন করে একটু মজা করবার চেষ্টা করল : তাহলে একবারে মাইনের দিনেই? সামনে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে বুঝি?

— আজ্ঞে না।

— তবে নিশ্চয়ই ছেলের পড়াশোনার ব্যাপারে?

— আজ্ঞে তা-ও না।

— ও _

এবার শঙ্খ নিজেই মুশকিলে পড়ল। সহজ দুটো প্রশ্ন করে স্বাভাবিক উত্তর আশা করেছিল। কিন্তু এখন এই অবস্থার তার পক্ষে সহজ আলাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সমস্যা। সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটা কাটাবার জন্য অন্য কোনও প্রসঙ্গে যেতে গিয়ে দেখল, মাধব মুখুজ্জে ওর দিকে স্থিরভাবে চেয়ে আছে।

চাকরি-জীবনের শেষবেলায় মাধব মুখুজ্জে সংসারের ঘানি টেনেটে টেনেটে দেখেছে বহু, ঠকেছে তারও অনেক বেশি। অভাব আর বঞ্চনার সাঁড়াশি চাপে নিষ্ঠুর সত্যিকে চিনতে তার বাকি নেই। জানতে বাকি নেই মানুষ নামের অদ্ভুত জীবনের মুখোসের আড়ালে গোপন করে রাখা লোভ-ঈর্ষা আর চাতুর্যের নানারূপ।

এমন একটা অবস্থায় যে শঙ্খর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। হয়ত তাও খানিকটা থাকত। কিন্তু কৌতূহলের চেয়ে তার মনের গভীরে সন্দেহের ঢেউ দুলেছে বেশিই। তার মানুষ চেনা মন এই মুহূর্তে শঙ্খর ভাষা পড়বার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে সে এটা জানে শঙ্খ তার পাঁচ জন ওপরওলার মতন নয়। কাচের বেয়ারাটোপে বসেও কোনওদিন বাইরের ঘরে প্রার্থনা করে যাওয়া অভাবী মানুষগুলোকে উপেক্ষার চোখে দেখেনি।

স্থিরভাবে চেয়ে থাকা মাধব মুখুজ্জের সামনে শঙ্খ রীতি মতন অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। যা পড়ে যাবার তাতে তার চোখে চোখ রেখে হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারলেন।

মাধব মুখুজ্জের যেন চমক ভাঙল। একটু ইতস্তত করে পাল্টা জিজ্ঞেস করল : আপনার কি স্যার খুব তাড়া আছে?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্নে শঙ্খ ঘাবড়ে গেল। মাধব মুখুজ্জে কি তার মুখে কিছু উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে? পেলে প্রথমিক এই দীনতার হয়ত সে মনে মনে ওকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে। তবে শঙ্খও এমন কিছু ছোট ছেলে নয় যে অত সহজে ধরা দিয়ে দেবে। তাই ধরা না দেবার ইচ্ছেতে বাক্যালাপ সহজ থেকে সামাল দেবার চেষ্টা করল : কিছু দরকার আছে না কি? আইডেনটি রিকোয়ার্ড লাগবে?

মাধব মুখুজ্জে হাসল। হাসিতে স্বীকারের যেন এক রহস্যময়তা। শঙ্খর এই প্রথম মনে হল, লোকটা চালাক। পেছনবাগের জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে মানুষের প্রতিমুহূর্তের পরিবর্তনটা চেনার অভ্যাস এখন তার সহজাত।

শঙ্খকে অস্বস্তিতে পড়তে দেখেও সে বাধা সত্ত্বেও বিনীতভাবে স্পষ্ট সোজাসুজি বলল : দেখুন স্যার, আমি জানি এখানে আপনার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। তবে কেন এসেছেন সেটা জানতে পারিনি।

এভাবে ধরা পড়ে গিয়ে শঙ্খ রীতিমতন লজ্জায় পড়ে গেল। তার কুণ্ঠা আর ইতস্তভাব দেখে মাধব মুখুজ্জেই হেসে ব্যাপারটা হালকা করে দিল : মিথ্যেই লজ্জা পাচ্ছেন স্যার। অন্যায়তো আপনি কিছু করেননি। যেকোন মানুষেরই আমার মতন লোকের প্রতি কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমি হলে এটাই করতাম। তবে দয়া করে একটিবার যদি গরিবের ঘরে পা রাখেন তো আপনার যা যা জানবার সবকিছুরই উত্তর পেয়ে যাবেন।

শঙ্খ এতটা ভাবেনি। মাধব মুখুজ্জের রহস্যময় আচরণের কারণটা জানতে তার ইচ্ছে আছে সত্যি। কিন্তু তার জন্যে একবারে বাড়ি বয়ে গিয়ে সরেজমিনে দেখে আসতে নিজেকেই কেমন যেন ছোট ছোট লাগছে।

তাই অকপটে নিজের উদ্দেশ্য স্বীকার করে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বলল : নেহাতই জানার ইচ্ছাতে এসেছিলাম মুখার্জিবাবু। জানি, এটা অনধিকার চর্চা। অন্যায়ও, তবু দয়া করে ব্যাপারটা খারাপভাবে নেবেন না।

কথাগুলো বলেই শঙ্খ আর দাঁড়াল না। যাবার জন্যে ফুটপাতে নেমে পড়ল। শঙ্খকে ওভাবে যেতে দেখে মাধব মুখুজ্জে হনহন করে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বিনীতভাবে অনুরোধ করল : বিশ্বাস করুন স্যার, আপনাকে অবজ্ঞা করা চোখেই দেখি। কোনও রাগ থেকে বলছি না। খোলা মনেই আপনাকে যেতে বলছি স্যার।

যেতে গিয়েও শঙ্খ ফিরল। মাধব মুখুজ্জের মুখের ওপর তার চোখ স্থির। অনেক অনেক দিনের দুঃখ দারিদ্র্য আর বঞ্চনার ইতিহাস সেখা সেই মুখে কোনও ছলনা নেই। বরং তার সহজ চাউনিতে একটা মজা মেজাজের আনুকূল্য।

শঙ্খ আর এড়িয়ে যেতে পারল না। হোক দৃষ্টিকটু হোক অবাঞ্ছিত। তবু যাবে। অভাব অনটন আর হতাশার অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়া মানুষগুলোর বেঁচে থাকার রহস্য ওকে জানতেই হবে। দেখতে হবে, টিকে থাকার লড়াইয়ে কোন পাতালের সুধাসরভা তাদের বুকের গরল ঘুচিয়ে দিয়ে অকাতরতার মন্ত্র জোগাচ্ছে।

সেই ইচ্ছেতেই ও রাজি হয়ে গেল। মুখে চেয়ে কোমল হাসি ছড়িয়ে বলল : ঠিক আছে। চলুন কোথায় যেতে হবে।

২

মধ্য কলকাতার একটা আদ্যিকালের বাড়িতে মাধব মুখুজ্জেদের বসত। বড়, কিন্তু জীর্ণ। মুখুজ্জেরা ছাড়া আরও চার-পাঁচটা পরিবার আছে। নামমাত্তর ভাড়ায় যখন পরস্পরায় এসে গুঁতোগুঁতি। তাই বাড়িওলা চেহারাও দেখে না। দেয়ালের আনাচে কানাচে পলেস্তারা খসা। জল-টিকলী নর্দমা বেয়ে পড়া চুন-সুড়কি আর নোনার খেয়া। জমে থাকা জলে ম্যালেরিয়া আর ডেঙ্গুর জীবাণুরাও নিশ্চিন্তেই বংশ বাড়িয়ে যায়।

উঠোনে কলের চাতাল ফুটিফাটা। ইলেকট্রিকের ওয়ারিং মাঝেমধ্যে দেয়াল থেকে ঝুলে এসেছে। অনেকদিনের পুরনো কয়েকটা বাচ্চা একঘরের পেরেক খুলে পড়ার অপেক্ষায় হাঁরিয়ে থেকে ঝুলছে। তাদের সর্বাঙ্গে ধুলো আর ঝুলের পলেস্তারার চারদিকে একটা অদ্ভুত নোনা গন্ধ।

তবু এর ভেতরেও মাধব মুখুজ্জের নিকট পরিচয় দেয়ালের পুরনো আয়নার ফটোগুলো ঝকঝকে। বিছানাপত্তর পরিপাটি। চেয়ার-টেবিলের পালিশ চটা হস্তশী দশার ওপর সুতোর ঢাকনা। বিশেষ একটা ফ্রেমিং টেবিলের ওপর নিখুঁত কুরুশের কাজ করা লেস কাপড়।

একদিকে কর্পার টেবিলের মতন একটা পুরনো কাঠের টিপয়ে নক্‌শাদার ফুলদানি। তাতে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। দেয়াল-আলমারিতে থরে থরে কাচের বাসনপত্তর। মাটির খেলনা। উল কিংবা সুতোর বোনা নানান মাপের পুতুল আর টিয়াপাখি। সারাঘর ম ম করছে হালকা মিষ্টি একটা গন্ধ, নিশ্চয়ই ধামি ধুপ।

চোখ চালিয়ে দেখতে দেখতে শঙ্খ'র মনে হল, এরা গরিব। কিন্তু মনের গভীরে একটা সূক্ষ্ম রুচির বস্তুরা এদেরকে আর সবাইদের থেকে আলাদা করে রেখেছে। অর্থের অভাব স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধকে গ্রাস করতে পারেনি।

শঙ্খ ঘরেই ঘরে ঢুকল মাধব মুখুজ্জে। শঙ্খকে বসিয়ে রেখে বোধ হয় জামাকাপড় ছেড়ে পরিষ্কার হতে গিয়েছিল। এখন সামনে দিকে চাইতে দেখল, মাধব মুখুজ্জের পেছন পেছন ছোদ্দ-পনেরো বছরের একটা ছেলে। তার হাতে চায়ের সরঞ্জাম। হাল আমলের এবং দৌখিন।

সেগুলো সামনের টেবিলের ওপরে রাখতে বলে মাধব মুখুজ্জে সহজ খুশিতে হাসল : স্যার, আপনার যোগ্য এ-বাড়িতে কিছুই নেই। তবু আপনি যে সবকিছু ভুলিয়ে দেবেন সে ভরসা আছে।

কথার পরিপাটো যেমন-তেমনের অনেক আন্তরিক সুরই ছিল। তাই তার ওপর এতখানি জায়গা শঙ্খ এবার লজ্জা পেল। প্রসাধনীকে পা-টানার জন্যে ঘরের চারদিকটায় একবার চোখ চালিয়ে নিয়ে জিগেস করল : আচ্ছা, এই যে অনেকরকম হাতের কাজটাজ দেখছি, এগুলো সব কার করা?

চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে মাধব মুখুজ্জে গর্বে গলগল হাসল : আজ্ঞে এই সবই দিউলি মায়ের হাতের। আমার মেয়ে। ও বলে, মানুষের অর্থের অভাবে কেন রুচির অভাব ঘটবে? রুচিহীন মানুষের আর যত কিছুই থাক, তাকে অন্তত সভ্য বলা যায় না।

মেয়ের গর্বে গর্বিত মাধব মুখুজ্জের দিকে চাইতেই সে লাজুক হাসল : আজ্ঞে পাকে তো ওসব করা সম্ভব নয়। নিজের টিউশনির পয়সা-টয়সা বাঁচিয়ে নিজেই যতটা পারে করবার চেষ্টা করে।

দিউলির রুচির আরও পরিচয় পেল শঙ্খ চায়ে চুমুক দিয়ে। দামি চা। চমৎকার আরামে। এদের আয়োজন সামান্য হোক, তার ভেতর কোন ফাঁকি নেই, সস্তার বাজিমাতের মনোবিলাসও নেই। এই যে পরিপাটি ঘর-দোর রজনীর গন্ধ। টেবিল-চেয়ার আয়নার চকমকি। সুগন্ধি ধূপ। এতো শুধুই শঙ্খ'র জন্যে নয়। ওর আসার কথাই তো কেউ জানত না। আসলে এসব হল এদের নিত্যদিনের অভ্যাসগত রুচি। পরিচ্ছন্নতার নিয়মেরই আনুগত্য।

শঙ্খর মন বলল শঙ্খ চোখ ফিরিয়ে দেখল, চওড়া লালপেড়ে শাড়ি পরে এক মহিলা দাঁড়িয়ে। অভাব অনটন আর সংসারের ঘানি টেনা শরীরের স্বাভাবিক যৌবন ঘরে গেছে ঠিকই। কিন্তু বয়সের ভার মুখশ্রীকে খুঁতে পারেনি। যেমন কোমল। তেমনই মমতাময়ী। মা বলে ডাকতে বুকের ভেতরটা যেন আনচান করে ওঠে।

মাধব মুখুজ্জে এগিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল : ইনি হলেন দিউলির মা। আমার সহধর্মিণী।

শঙ্খ সাধারণত যা করে না এবার তাই করে বসল। অন্তত একটা আবেগে প্রণাম করে ফেলল দিউলির মাকে।

মাধব মুখুজ্জে একঘরে হাঁ হাঁ করে উঠল : করলেন কী স্যার। আমরা কি আর আপনাদের মতন মানুষের প্রণামের যোগ্য?

শঙ্খ হাসল। চোখ ফিরিয়ে মাধব মুখুজ্জের দিকে চেয়ে বলল : যোগ্যতা কী সে হয় মুখার্জিবাবু? চাটি টাকা থাকলে? মনুষ্যত্ব আন্তরিকতা আর ভালবাসার কোনও মূল্যই নেই?

মাধব মুখুজ্জে মুহ্যমান। লজ্জা আর সঙ্কোচে একঘরে জড়োসড়ো দাঁড়িয়ে থাকা দিউলির মায়ের দিকে চেয়ে সে অপ্রস্তুতভাবে হাসল : বলেছিলাম না, স্যার আমরা অন্য ধাঁচের মানুষ।

উত্তর ঘোরটার ভেতর থেকে দিউলির মা কিন্তু একটা কথাতেই মাধব মুখুজ্জে হঠাৎ বড় হয়ে উঠল : স্যার, আপনাকে নিয়ে আর আমাদের কোনও সঙ্কোচ নেই। অনুরোধ যা আমাদের করেছি, তা মেয়ের আগে দিউলি মায়ের একটু গান শুনুন।

বলে লজ্জার দিকে ইসারা করতেই ছোকরা বিছানার ওপর একটা হারমোনিয়াম এনে রাখল। আর আসতেই যে ঘরে ঢুকল তাকে দেখে শঙ্খ হাঁ।

দিউলি তো সত্যিই দিউলি। যেমন ঝকঝকে রঙ। তেমনই মেয়ের গড়ন। যেন নিপুণ শিল্পীর ভাস্কর্য। খয়েরি পাড়ের একখানা টাঁপা ফুলের রঙের শাড়ি পরিপাটি করে পরা। শাড়ির টাঁপা ফুলের রঙেরই ব্লাউজ। এক ঢাল রেশমী চুল আলতো করে বাঁধা। আর কোনও প্রসাধন নেই। আস্তে আস্তে সে বিছানার ধারে হারমোনিয়ামটার পাশে বসল। তার চেহারার যেমন সৌন্দর্য। চলার ছন্দে তেমনই ব্যক্তিত্ব। সামখানে পা মুড়ে বসে শঙ্খ'র দিকে চেয়ে হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে হারমোনিয়ামটা টেনে নিল।

চকিতের দৃষ্টি বিনিময়ে শঙ্খ'র সারা দেহে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া। দিউলির শাঁখের মতন ধবধবে ছোট্ট কপালে মাঝারি একটা খয়েরি টিপ। তার চারদিকে ছড়ানো দু-চার গাছি কোঁকড়ানো এলোমেলো চুল। পানের মতন মুখখানার ছোট্ট চিবুক। আয়তনত চোখ দুটোর সরলতা আর স্বচ্ছন্দতার আশ্চর্য মেলামেশি। কিন্তু —

ঈশ্বরের এমন অপরূপ সৃষ্টির মাঝখানে নিখুঁত একটা মুখটিতে ওর মনের ভেতরটা যেন হায় হায় করে উঠল। এমন নিখুঁত সৌন্দর্যের ভেতর ছন্দপতনের মতন দিউলির নাকটা এমনই চাপা যে তার সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত ব্যক্তিত্ব, রুচি এক নিমেষে অন্ধকে দেছে।

মাধব মুখুজ্জের চোখ এবার শঙ্খ'র অবাক মুখের ওপর স্থির। ঘোমটার ভেতর দিয়ে দিউলির মা-ও বোধহয় চেয়ে আছে শঙ্খ'র দিকে। কিন্তু তাকে ঘিরে এতজনের মনের উথাল-পাথাল, সে চোখ বুজে একমনে গেয়ে চলেছে : আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে ...।

শঙ্খ আবার মুগ্ধ। এমন গলা। এমন ভাব। এমন রূপ। এমন ব্যক্তিত্বময় চলাফেরা। এরকম নারী যেকোনও পুরুষেরই সাধনার ধন। গাওয়া পর্ব। অন্তত একটা অতি তুচ্ছ কারণেই

ভাবে থাকতে হচ্ছে সকলের কল্পনার পাত্রী হয়ে। নিজেকে প্রকাশ করবার লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে হচ্ছে মনে মনে।

গান শেষ হয়ে গেলে হারমোনিয়ামটা বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে রইল লিউলি। এইরকম অস্বস্তিকর অবস্থায় শঙ্খ কী করবে বুঝতে পারছে না। তবে মাধব মুখুজ্জের রহস্যময় চলাফেরার সঙ্গে যে লিউলির কোথাও একটা যোগ আছে এটা বুঝতে পারছে।

অস্বস্তিটা কাটাবার জন্যে মাধব মুখুজ্জেই প্রথম কথা বলল। শঙ্খ'র দিকে একটু এগিয়ে এসে বিনীতভাবে জানাল : স্যার, এই হল আমার রহস্য। লিউলি মায়ের এই খুঁতখুঁতুনে সারাদায় জন্যেই হাজার কষ্ট হলেও মাসের প্রথমেই কিছু করে স্যারে জমা রেখে দিই। যত দিনেই হোক, ওটা না করতে পারলে মাকে যে আমার কেউ ঘরে নেবে না স্যার।

চেপে রাখা কষ্ট মাধব মুখুজ্জের গলা বুজে এল। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল জল। লজ্জায় কোনার লিউলির মাথা নিচু। জানলার দিক ঘরে পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছে লিউলির মা। আর এক আশ্চর্য নির্মম রহস্যের আবিষ্কারে শঙ্খ নির্বাক।

শুধু নির্বাকই নয়। স্তব্ধও। গোটা মুখুজ্জে পরিবারটার এ এক অদ্ভুত লড়াই। আশ্চর্য সহমর্মিতা। লজ্জার বাইরে যেতে না পারলেও লিউলি ঘরে থেকে লেখাপড়া শিখেছে। গান শিখেছে। ঘরে থেকেই টিউশানি করে বাপের অভাবের সংসারে সাধ্যমতন অর্থ দিয়ে সহায়তা করবারও চেষ্টা করছে।

তার আবার বিপরীত দিকে বিকলাঙ্গ মেয়ের লজ্জা, গোপন কষ্ট, সব থেকেও তার শূন্যতার হাহাকার অনুভব করে সার্জারির টাকা জোগাড় করতে মাসের অনেকগুলো দিনের অর্ধাহার-অনাহারকে হাসিমুখে মেনে নিচ্ছে বাকি তিনজন।

সময় পেয়ে সামলে নিল মাধব মুখুজ্জে। গলাটা ঝেড়ে শঙ্খ'র দিকে চেয়ে বড় কষ্টে হাসল : আমার চলাফেরায় অনেকেরই কৌতূহল আমি জানি স্যার। কিন্তু কী করব, ওদের সঙ্গে হাসি-মশকরায় যোগ দিতে ইচ্ছে হলে চোখের সামনে আমার লিউলিমায়ের অসহায় মুখখানা ভেসে ওঠে। তখন যে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয় স্যার।

মাধব মুখুজ্জের বুকের গোপন হাহাকার যেন ঘর ঘর হাওয়ার ছড়িয়ে পড়ল চারদিক ঘুড়ে। মাথা নিচু করে বসল শঙ্খ। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় ছোট, বড় অসহায় লাগছে। কৌতুকের মাধার এখানে না এলে হয়ত এ রহস্য কোনওদিনই জানতে পারত না। কিন্তু তা যে এখন দুঃখের, এখন লজ্জার, তাতো ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি।

ঘরের ভেতর এখন এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। রহস্যের আড়ালে লুকানো বেদনাময় সত্যির প্রকাশে ওরা কুণ্ঠিত। আর অজান্তে মুখুজ্জে পরিবারের মনে আঘাত দেবার অনুশোচনায় মাথা নিচু শঙ্খ'র। লিউলির হাহাকারে ওর জন্মমুড়ে এখন এক মায়াময় সহানুভূতির কী বেদনাবোধ। বুকের গোপনে কিছু করবার ইচ্ছের ক্রমাগত উথাল-পাথাল।...

ইচ্ছের সেই প্রবলতে মন স্থির করে শঙ্খ প্রথমে চাইল লিউলির দিকে। লজ্জায় কোনার তার মাথা নিচু আছে আগেরই মতন। অথচ বাপের মনের কষ্ট অনুভব করে সে যেন কুঁকড়ে এইটুকুন হয়ে গেছে।

লিউলির দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মাধব মুখুজ্জের দিকে চেয়ে ইতস্তত করে শঙ্খ ওর সিদ্ধান্তটা জানাল : ধরুন, সার্জারির বাকি টাকাটা যদি আমি দিতে চাই আপত্তি করবেন?

থমকে গেল মাধব মুখুজ্জে। এ প্রস্তাব তার আশে স্বপ্নেরও বাইরে। এর জন্যেই তাদের পরিবারের অনেকদিনের লড়াই, এটা সত্যি। তবু এই দেওয়া তাদের কাছে লজ্জার। অন্তরালের অপমানের।

মনের এই উত্তেজনা সামলে যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই মাধব মুখুজ্জে উত্তর দিল : স্যার, আমরা গরিব ঠিকই। তবে আত্মসম্মানও নেহাত কম ছিল না। এখন হয়ত সেসব দিন আর নেই। কিন্তু সম্মানটুকুন যত্নে রক্ষে করি। দানের আড়ালে আপনার এই অনুগ্রহ নিতে পারব না স্যার। আমাদের মাপ করবেন।

উত্তরটা যে এমন হবে শঙ্খ তা আন্দাজ করেই ছিল। তাই মাধব মুখুজ্জেকে একটু অন্যভাবে ধাক্কা দিতে অর্থপূর্ণ মুচকি হেসে বলল : মধ্যবিত্ত জাতটার সব গেছে। তবু আঁকড়ে ধরে রেখেছে তার ঠুনকো আভিজাত্যকে কিন্তু যা হারিয়েছে, তা হল বিশ্বাস। ক্রমাগত মার খেতে খেতে এরের বুকের ভেতর যে অবিশ্বাস বাসা বেঁধেছে, তার থেকেই কিন্তু পতনের শুরু।

এবার মাধব মুখুজ্জের অবাক চোখ শঙ্খ'র দিকে। তার মুখে বিশ্বাস-অবিশ্বাস। যন্ত্রণা অভিমান। আনন্দ লজ্জা।

খুব নিচু গলায় সে আস্তে আস্তে জিগেস করল : কিন্তু এই হাজার হাজার টাকা আপনিই বা দেবেন কেন, স্যার? কোন অধিকারে?

'অধিকার' কথাটা কানের ভেতর ঘাঁ করে দিয়ে লাগতেই থমকে গেল শঙ্খ। সবদিক দিয়েই সক্ষম ওর মতন একজন যুবক লিউলির মতন সুন্দরী রুচিশীলা মহিলার প্রতি যে অধিকারে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতে পারত, তার কোন উপায়ই রাখেনি পাকাপাকী।

পাকাপাকী। বড়লোক বাপের উগ্র আধুনিকা আর খেয়ালি, সুন্দরী, কিন্তু সেই সৌন্দর্যের তাপে স্নিগ্ধতা নেই। আছে দহন। দুদিনের খেয়াল মেটাতে শঙ্খ'র সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করেছিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ জানতে পারেনি। পাকাপাকীর সমস্ত খেয়ালপনা আর উগ্রতাকে মেনে নিয়েও শঙ্খ তাকে নিয়ে সংসার পাতবার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না।

আসলে পাকাপাকী অন্য ধাতুর। অন্য জগতের। সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি আর মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ তার কাছে হাস্যকর পাগলামো। তাই আরও আকর্ষণীয় অন্য একজন পুরুষের জন্যে স্বাচ্ছন্দ্যে সে ডিভোর্স চেয়েছে শঙ্খ'র কাছে।

যে ঘটনা ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাকেই সে টেনে এনেছে আদালতের কাঠগোড়ায়। ঝিন ঝিন করে গড়ে তোলা স্বপ্নের সংসার তছনিছ গেছে উজ্জ্বাদার ধরিয়ায়। শঙ্খ নামের সেই রুচিবান, শান্ত-সৌম্য মানুষটার ভবিষ্যত্ব আজ নির্ভর করছে বিচারকের কটা কথার ওপর।

শঙ্খকে বিহ্বলভাবে চুপ করে থাকতে দেখে মাধব মুখুজ্জে একটু ঝুঁকে আস্তে আস্তে জিগেস করল। স্যার ... আপনার কি শরীর খারাপ লাগছে?

বুকের গোপন থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে শঙ্খ এবার মাধব মুখুজ্জের চোখে চোখ রাখল। সেখানে এক আশ্চর্য আন্তরিক আকুলতা। ওর বুকের ভেতরে অনেকদিনের জমাট-বাঁধা পাথরটা কী এক আবেগে যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সেই আকুলতার চাউনিতে।

প্রাণপনে সেই উথলে ওঠা আবেগটা সামলাতে সামলাতে আবার চোখ গেল জানলার কাছে দাঁড়ানো লিউলির মায়ের মুখের দিকে। সে মুখে উছলানো মাতৃত্বের চিরন্তন স্নেহ আর মমতা খইখই করছে।

শঙ্খ'র বুকের ভেতরের জমাট পাথরটা এবার দুলে উঠলো আরও জোরে। জীবনের প্রথম কলম ফুলের বুকে রক্তের আলপনা আঁকবার অসহায় অক্ষমতা বুকে নিয়ে ওর ভালবাসার শুরু পাখিটা মাথা কুটে যাচ্ছে পাঁজরে পাঁজরে। লিউলির মায়ের মমতাময় চোখে চোখ রেখে সেই শুরু পাখিটা যেন চরাচর কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল : মাগো ...।

একটুখানির নিস্তব্ধতা। চোখ বুজে শুধু একটুখানির আত্মসংবরণ। তারপর চোখ খুলতেই শিউলির শুভ্র চোখ। ঝিনুক ঝিনুক আর সোপন কৌতূহলে টানটান। আর কালো পরীর জলার অতল থেকে কী যেন এক মর্মীত জলা মেলে উড়ে উড়ে আসছে শঙ্খ'র অনন্ত হাহাকারের আবদন ছুঁতে।

অনেক-অনেকদিনের অসহায় যন্ত্রণা ঘরে বেড়ানো শঙ্খ'র বুকের জমাট কষ্ট সোপন সহানুভূতির এমন ছোঁয়া উষ্ণতায় গলে গলে তরল হয়ে যাচ্ছে। আর উৎসল ধারা গলা বেয়ে বেয়ে আছড়ে পড়ছে দু চোখের জলার জলায়।

শঙ্খ বুঝতে পারছে বুকের গভীরে এতদিনের হাহাকারের কঠিন অভিমানটা আলগা হয়ে হয়ে ঝিনু যেন পদ্মার আকাশজলের এক পরম মৃদুতা সৃষ্টি করে চলেছে।

তবু, তবু আবছা-আবছা হয়ে যাওয়া অতীত মুখগুলোর মুখের দিকে চেয়ে বুকের সোপন ভেতে শঙ্খ টিকোর করে বলতে পারল না : আমার হাতপিণ্ড থেকে পাকড়শির ঘাবাটা সরিয়ে দিয়ে শিউলির গন্ধে ভরিয়ে দিন মুখর্জিবাবু।

সেই অক্ষম অনুশোচনার অব্যক্ত হাহাকারের শুধু ওর চোখ কাঁপল। ঠোঁট কাঁপল। ঝরঝর করে উঠল শরীরের অনু পরমাণু। তারা কেউ জানল না। কেউ বুঝল না। কেউ অনুভব করতেও পারল না শঙ্খ'র ভালবাসার ওক পাখিটা কী গভীর যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কঠিন তর্জনীর সামনে আস্তে আস্তে মাথা পেতে দিল। ☐

"সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।"

— স্বামীজি

শারদীয়া শুভেচ্ছা সহ

কনুইবাঁকা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

আকিলপুর, কনুইবাঁকা, হুগলি

রেজিঃ নং - ২৭ ■ তারিখ - ২৩-৪-৬২ ■ ফোন নং - ৫৫৩৮৩

বিনোদবিহারী পাল	প্রশান্ত পাত্র	হারাধন দাস
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

পুরী সমুদ্রতটে সর্বসুবিধা সমন্বিত ১১ কামরা

১ তল/দ্বিতল/ত্রিতল

হলিডে হোম

যোগাযোগ

কলিকাতা ট্রামওয়েজ কর্মীদের সমবায় ঋণদান সমিতি লিমিটেড

১২, আর এন মুখার্জি রোড (দ্বিতল)

কলিকাতা - ৭০০ ০০১

With

Best

Compliments

From :

North Bengal State Transport Employees' Co-operative Credit Society Limited

— SECRETARY

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ-সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে, নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩৮২১

মুদিয়ালী ফিসারমেন্স কো-অপঃ সোসাইটি লিমিটেড

কিউ ১৬৭/১, সন্তোষপুর রোড, কলিকাতা-২৪
রেজিঃ নং - ৭১/ ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) ১৯৬১
দূরভাষ : ৪৬৯-৫৫৫৫

"সমবায়ের মাধ্যমে ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, মাছ ধরা, মৎস্যজীবীদের উন্নয়নের একমাত্র চাবিকাঠি।"

* মৎস্য চাষের জন্য উপকরণ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ
* সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্টেশনারি দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ
* উন্নতমানের বিভিন্নপ্রকার চারাগাছ সরবরাহ

মৎস্য খামার ও নেচার পার্ক

তারাতলা রোড, কলিকাতা - ৮৮

দূরে নয় কলকাতার বক্ষে পিকনিক/প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় আমাদের সৃষ্টি মনোরম পরিবেশের প্রকৃতি উদ্যান।

পথ নির্দেশ

তারাতলা হইতে ৪২বি, ১২, ১বি, ২৪১এ, রামনগর ও আকড়াগামী অটো। ধর্মতলা হইতে ১৩বি ও ২৪১এ।

অষ্ট মণ্ডল, সভাপতি
নেপাল মান্না, সম্পাদক
অষ্ট পাত্র (২), পরিচালক

সমীর বেরা, সহ-সভাপতি
কিশোর মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ
গণধর পাখিরা, পরিচালক

রাধাকৃষ্ণ সরদার
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

প্রবন্ধ

সঠিক নেতৃত্বই উন্নতির চাবিকাঠি

প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিগত দুই দশক পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে কৃষি ক্ষণের ক্ষেত্রে কৃষিপ্রধানদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীরা যে সংখ্যায় সমবায় থেকে ক্ষণের সুবিধা পেয়েছে অন্য কোন রাজ্য তা পারনি এতখানি গর্ব করে বলা যায়। কিন্তু শহর অঞ্চলের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা সকল বিষয়ে পিছিয়ে আছি। এক্ষেত্রে আমরা গুণগত কোন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পারিনি, সেই সঙ্গে এদের সংখ্যা ও কার্যক্রমও সীমিত। সারা ভারতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগ ব্যাঙ্কই মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও দক্ষিণের চারটি রাজ্যে অবস্থিত।

এই জাতীয় ব্যাঙ্কগুলির বৈশিষ্ট্য এই যে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নিবিড়ভাবে, গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে, মোটামুটি এলাকার বহু মানুষকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি ও সমর্থন নিয়ে স্বল্পবিত্ত মানুষদের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়। মধ্য ও নিম্ন আয়সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উদ্বৃত্ত অর্থ সংগ্রহ করে সেই অর্থই আর্থিকভাবে যারা দুর্বল ও অন্য মানুষ যাদের নানা কারণে অর্থের প্রয়োজন আছে তাদের চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে। পরিচালক ও সভ্যদের মধ্যে পরিচয় ও যোগাযোগের ফলে পরিচালনা ও ঋণ আদায়ের কিছু সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে।

কিন্তু এই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কেনই বা এই অসম বিকাশ ও বৃদ্ধির মাত্রা পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতের মতো নয় তার কারণ অন্বেষণ করলে দেখা যায় যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে চলতে হয়। নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা খুবই কম, কিন্তু যেটুকু আছে তা এক অর্থে খুবই শক্তিশালী — রাজ্য সরকার এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকমণ্ডলীকে ভেঙে দেবার (অবশ্যই আর বি আই-এর অনুমোদন সাপেক্ষে) অধিকারী। আর বি আই আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির আর্থিক নীতি নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের সর্বময় কর্তা হিসাবে গণ্য। তাই পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সেক্টরের বিষয় যখনই কোন আলোচনা হয় তখনই এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত পরিচালকমণ্ডলী বা তাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনের সমবায়ী নেতৃবৃন্দ আর বি আই-এর ভূমিকা নিয়ে সমালোচনায় মুখর হন।

যেহেতু আর বি আই দেশের সার্বিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ অধিকর্তা এবং তারই নির্ধারিত নীতি অনুসারে স্টেট ব্যাঙ্ক, ন্যাশনালাইজড ব্যাঙ্ক, প্রাইভেট ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ও নন ব্যাঙ্কিং ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি আর্থিক সংস্থাগুলিকে চলতে হয় তাই আর বি আই-এর বিষয়ে আলোচনা তথা সমালোচনা হওয়া স্বাভাবিক। এবং আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির স্বার্থের প্রশ্নে তাদের প্রসার, বিকাশ ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আর বি আই-র ভূমিকা যে সাহায্যকারী নয় তার বিষয় বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ হাজির করা যায় কিন্তু যেহেতু বিষয়টি বহু আলোচিত তাই পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত হয়ে আর্বান ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত তৃতীয় বিষয় যথা পরিচালকমণ্ডলীর দায়দায়িত্বের কথা আলোচনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আর বি আই-এর কারণে যদি পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হয় তবে তার প্রতিক্রিয়া রাজ্যের সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উপর পড়া উচিত। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহল জানেন যে আর বি আই-এর নীতি ও নির্দেশ সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কমবেশি মূলকভাবে প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও এবং এই প্রতিকূলতার মধ্যেও কেন কিছু আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে উন্নতির পথে চলছে। অপরদিকে কিছু আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের শুধু বয়সই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুই বিপরীত অবস্থার মধ্যে আর এক শ্রেণীর আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আছে যাদের শ্রীবৃদ্ধি আপাতদৃষ্টিতে দৃশ্যমান হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের আর্থিক ভিত শক্ত নয়। সুতরাং এই বিভিন্নতার কারণ নিশ্চয়ই আর বি আই নয় — কারণ বর্তায় কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিচালকমণ্ডলীর উপর।

পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সভ্য, আমানতকারীরা, ঋণগ্রহীতা ও পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বর্তমানে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি মফস্বল শহরে ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ দেবার অনিচ্ছার কারণে কিছু কিছু ছোট ব্যবসায়ী দোকানদার সাধারণতঃ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন। উচ্চবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মানুষদের বেশির ভাগের কাছে কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে উচ্চমধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী মানুষরা অনেক আগে থেকেই যুক্ত আছেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর শুধু ছোট ব্যবসায়ীরা নয় অনেক বড় ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিকে নিজেদের ব্যাঙ্ক হিসাবে গ্রহণ করেছে তাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে কিছু গুণগত পার্থক্যও আছে। পশ্চিমবঙ্গের আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে কেন কিছু ব্যাঙ্ক পিছিয়ে থাকবে এটি একটি কঠিন বক্তব্য মনে হলেও তা ভুল হবে না।

ঋণের চাহিদার বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন ফর্মুলা বলে দেওয়া যায় না। এলাকাগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঋণের চাহিদার পার্থক্য হয়। মেদিনীপুরের কাঁটাই এলাকার ঋণের চাহিদার সঙ্গে হাওড়ার বাঁটরা এলাকার ঋণের চাহিদার মিল নেই, আবার হাওড়াই শিলপুর এলাকার ঋণের চাহিদার সঙ্গে বাঁটরার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই যে এলাকায় মধ্যে একটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কাজ করছে সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, বাসিন্দাদের পেশা, আয়ের সীমা, কাদের কি কি বিষয়ে অর্থের চাহিদা আছে তার সম্পর্কে পরিচালকমণ্ডলীর সঠিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার। এবং এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারাই ঋণ বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সঠিক পরিকল্পনা ঋণ বিনিয়োগের পরিমাণকে বাড়াবে

অনেক সময় পরিচালকমণ্ডলীর রক্ষণশীল মনোভাবের কারণে সময়মতো অনুমতি নতুন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না, ফলে বিকাশের গতি হয় রুদ্ধ। এমতাবস্থায় অবস্থা ও চাহিদা অনুসারে এলাকার মানুষের স্বার্থে, বিনা দ্বিধায় করে প্রয়োজন বিনিয়োগের পথে যেতেই হবে। নতুবা উদ্বৃত্ত অর্থের জোগান ব্যাহত হয়ে মোটামুটি ক্ষেত্রে দুর্বল করবে।

জমার টাকা অনাদায়ী হবার ভয়ে পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্বিধা ও অনীহার সৃষ্টি হয়। তাই জমার টাকা অনাদায়ীর কারণগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করা দরকার। জমার আবেদন বিবেচনা করার সময় আবেদনকারীর সঙ্গে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য বা সদস্যদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের ফলে আবেদনকারীর জমার প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিশোধের আর্থিক সঙ্গতি আবেদনকারীর আছে কিনা তা বিবেচনা না করেই আবেদন মত জমার পরিমাণ মঞ্জুর করা হয়। ফলে কিস্তিমত সঠিক পরিমাণ টাকা পরিশোধের ক্ষেত্রে জমাগ্রহীতা অপারগ হন। আবেদনকারীর আয় অনুসারে জমা পরিশোধের ক্ষমতা অনুযায়ী জমা মঞ্জুর করার সময় আবেদনকৃত জমার পরিমাণ কমিয়ে নিয়ে অধিক সংখ্যক মুখোমুখি হতে চান না পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যরা। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে অনেক সময় জেনে শুনেও পরিচালকমণ্ডলী আবেদনমত অর্থ মঞ্জুর করে জমাগ্রহীতা সভ্য ও প্রতিষ্ঠান উভয়কে দুর্বল করে দেন। ঋণের পরিচালনার ক্ষেত্রে এই ধরনের মানসিকতা থেকে মুক্ত হবার প্রয়োজন আছে। অনাদায়ীর আর একটি কারণ জমার টাকা পরিশোধের দিকে দৃষ্টি ও তাগিদের অভাব। জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হবার মনোভাব ত্যাগ করে এবং অন্য কোন চাপের কাছে নত না হয়ে দায়দায়ীর তাগিদের প্রয়োজন আছে। অনাদায়ী টাকার পরিমাণকে আড়ালে রেখে কেবলমাত্র বিনিয়োগের বার্ষিক পরিমাণ সাফল্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

সহজ কথায় ব্যাঙ্কিং ব্যবসা বলতে জোগানের টাকা কেনাবেচার ব্যবসা। সেইদিকে ব্যাঙ্ক ও বিভিন্ন প্রকার আমানতে দেয় সুদই টাকা কেনার দাম। কিন্তু কোন অবস্থায়ই এটা টাকা কেনার মোট দাম নয়। হিসাব রক্ষণের জন্য কর্মচারিদের বেতন প্রভৃতির জন্য খরচ, অনুবন্ধিত বাইপাসের খরচ টাকা কেনার দাম হিসাবে যুক্ত করতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া আমানত ও ঋণ বিনিয়োগের উপর সুদের হার এখন আর বি আই-এর নির্দেশে চলে না। আজকাল সমবায়ের আদলের প্রায় সকল আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেই বাড়তি সুদ দেবার ব্যবস্থা করে থাকে। কোন কোন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কম মূল্যে মূলধন সংগ্রহ করার চেষ্টায় এজেন্ট মারফৎ কমিশন দিয়ে দৈনিক জমা প্রকল্প চালু করে। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর মূলধন কম মূল্যের হয় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অন্যদিকে স্থায়ী আমানতে স্বাভাবিক হার অপেক্ষা বেশি সুদ দেওয়া (যা ব্যবসাসুলভ নয়) অন্যদিকে নানারকম জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা যুক্ত দৈনিক জমা প্রকল্প মারফৎ মূলধন সংগ্রহ অর্থহীন বলেই মনে হয়। স্বাভাবিক হার অপেক্ষা বাড়তি সুদ না দিলেই মূলধন জোগার দাম কমাতে পারে। বিশেষ করে যেখানে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির বেশির ভাগই উদ্বৃত্ত অর্থের অঞ্চলে নয় সেখানে এবং উদ্বৃত্ত অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে এমনকী বিদেশি ব্যাঙ্কে যারা জাতীয় আর্থিক ক্ষেত্রে কোন সহায়কারী ভূমিকা পালন করে না সেখানেও বিনিয়োগে ব্যস্ত হয়, সেখানে সস্তায় মূলধন সংগ্রহের চেষ্টায় উদ্বৃত্ত অর্থের অঞ্চলকে যে আরো বাড়াবে সেটা বিবেচনার রাখা দরকার। মূলধন জোগার দর সঠিক মূল্য নির্ধারণ পরিচালকমণ্ডলীর একটি বড় কাজ। সেই সঙ্গে যে মূলধন প্রত্যক্ষভাবে ঋণে বিনিয়োগের সুযোগ নেই সেই মূলধন সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ প্রয়াস ও বাড়তি সুদ দেবার প্রয়োজনের বিষয়ও চিন্তা করা উচিৎ।

কাজ ম্যানেজমেন্ট বা অর্থভাতার সঠিকভাবে পরিচালনা করার উপর ব্যাঙ্কির প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই পরিচালক-মণ্ডলীর অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতার কারণে অর্থ-ভাতার সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। ফলে সম্ভাব্য লাভ থেকে প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত হয় ও অকারণ অনেক অসুবিধার পড়তে হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা একটি পূর্ণাঙ্গ নিবন্ধের অবকাশ নিতে পারে, তাই অর্থভাতার পরিচালনার লক্ষ্য কি এবং কি কি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত তাই উল্লেখ করা হলো মাত্র।

ক) প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ নগদ পাছে রাখা উচিৎ নয়, কারণ ঋণে প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত বা অন্য ব্যাঙ্কে যারা অর্থের বিনিময়ে সুদ বহন করে হয় কিন্তু নগদ অর্থের থেকে কোন আয় আসে না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে আমানতের ক্ষেত্রে অর্থ সংগ্রহের দিন থেকেই উক্ত অর্থের উপর সুদ দেবার দায় সৃষ্টি হয়।

খ) কোন সময় বিভিন্ন খাতে আনুমানিক মোট কত টাকা জমা হবার (cash inflow) সম্ভাবনা আছে এবং কোন সময় বিভিন্ন খাতে টাকা বিনিয়োগ বা আমানতকারীদের টাকা ফেরৎ দেবার (cash outflow) দায়বদ্ধতা আছে সে বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা আছে।

গ) সেই কারণে উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগের সময় লগ্নিকৃত অর্থের নিরাপত্তা ও সুবিধাজনক সময়ে বিষয় বিবেচনা করার সময় বিশেষভাবে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজনীয়তা আছে যে কত পরিমাণ অর্থ কত সময়ের জন্য বিনিয়োগ করা যাবে। লগ্নীটা সর্বোচ্চ লাভ এবং সেই কারণে সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ দীর্ঘমেয়াদি আমানতে লগ্নি করা নয়। সুবিধাজনক আয় নিরাপত্তা ও প্রয়োজনে টাকা যোগানের ক্ষেত্রে (cash inflow) যাতে কোন অসুবিধা না হয় এই বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব বর্তায় পরিচালকমণ্ডলীর উপর।

ঘ) C.R.R. ও S.L.R.-এর নিয়ম অনুসারে টাকা গচ্ছিত রাখার বিষয়টি সুনিশ্চিত করা বিশেষ প্রয়োজন।

ঙ) এই কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করা তখনই সম্ভব হয় যখন হিসাব ও অন্য খাতাপত্রের কাজ হাল অবস্থায় থাকে। হিসাব ও খাতাপত্রের কাজ বকেয়া থাকলে সামগ্রিকভাবে আর্থিক অবস্থাটা বোঝা হয়ে পড়ে।

আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলির হিসাব যথাযথভাবে এবং হাল অবস্থায় রাখা, আর বি আই-এর নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন রিটার্নগুলি সময়মত দেওয়া প্রভৃতি কাজ ঠিকমত করা সম্ভব হয় যদি উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী সেই খাতে থাকে। এখানে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী নিয়োগের দায়িত্ব ব্যাঙ্ক পরিচালকদের। সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মচারীর সংখ্যা নির্ধারণের বিষয়টি পরিচালকদের ফেলনা হওয়া উচিত নয়। ক্রেডিট সোসাইটি স্তরে কর্মচারিদের যে দক্ষতার প্রয়োজন হয় ক্রেডিট সোসাইটি ব্যাঙ্ক স্তরে উন্নীত হবার পর কর্মচারিদের কর্মদক্ষতার মান উন্নত হওয়া আবশ্যক। তাই একদিকে

বর্তমানে কর্মরত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দ্বারা তাঁদের উন্নয়নের চেষ্টা করা দরকার অপরদিকে যোগ্যতাসম্পন্ন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পরিচালকরা প্রশিক্ষণের বিষয়টি তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। দুঃখের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করা যায় যে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলিতে এখন কিছু কর্মী আছে যাদের শিক্ষার মান ও জ্ঞানবুদ্ধি এমনই স্তরে আছে যে প্রশিক্ষণ দ্বারা তাদের ব্যাঙ্ক কর্মচারীর যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলা খুবই কঠিন। আর নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের কাজের মান উন্নয়নের বিষয়কে অগ্রাধিকার না দিয়ে পরিচালকদের নিজেদের স্বার্থ বা নিজেদের গোষ্ঠিস্বার্থের বিষয়টি যদি বড় করে দেখা হয় তবে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর পরিবর্তে যোগ্যতা যাই হোক না কেন পরিচিত প্রার্থীরাই কাজের সুযোগ পাবে। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মচারী নিয়োগে ভুল ও স্বার্থান্বেষী নীতির ফলে ব্যাঙ্কের ক্ষতিই বাড়ে, কাজের মান উন্নয়ন হয় না।

সুষ্ঠুভাবে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিচালনার বিষয়টি খুব সহজ কাজ নয়। আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহু আইন জড়িত। State Co-operative Acts and Rules, B. R. Act as applicable to Co-operative Societies, Payment of Wages Act, Provident Fund Act, Bonus Act, Gratuity Act, Negotiable Instrument Act, Income Tax Act, Limitation Act, Land Ceiling Act প্রভৃতি আইন ও বিভিন্ন প্রকার ঋণ প্রকল্পের জন্য রেজীর বা রাজ্য সরকারের অন্যান্য আইন ও নির্দেশের বিষয় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যদের বিশেষ করে সভাপতি ও সম্পাদকের কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কিন্তু নিজের জীবন জীবিকার সমস্যা মিটিয়ে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছাড়া অন্যদের পক্ষে সুচারুরূপে এই দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন কাজ। এই কারণে আর বি আই মুখ্য নির্বাহী অধিকারীর পদে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন সুদক্ষ বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে থাকে। এই সূত্রেই সভার কার্যকর্মকে পেশাদারী করার কথা ইদানিং আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু কর্মচারিদের যোগ্যতার মান যদি সামগ্রিকভাবে উন্নত না হয় তবে একটি দুর্বল পরিকাঠামোর উপর একজন এম কম, সি এ বা এম বি এ পাশ ব্যক্তিকে মুখ্য নির্বাহী অধিকারিক পদে নিয়োগ করলেই কার্যকর্মের উন্নতি হবে বা তা পেশাদারী পরিচালন ব্যবস্থা হয়ে যাবে এমন ধারণা করা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। একজন সুদক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারীর যে পরিচালকের ক্ষেত্রজ্ঞ ও ভূমিকা যদি সঠিক না হয় তবে যোগ্যতাসম্পন্ন একজন মুখ্য নির্বাহী অধিকারিকের পক্ষে ব্যাঙ্কের কাজের উন্নতি সহজ সম্ভব নয়। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারী, যোগ্যতাসম্পন্ন নির্বাহী আধিকারিক ও পরিচালকদের যৌথ পরিচালনা এই বিষয়ের সম্মিলিত প্রয়াসেই ব্যাঙ্কের কাজের যথার্থ উন্নতি সম্ভব। কিন্তু পরিচালকদের দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে গোড়ার কথা।

বহু ব্যাঙ্কের বিভিন্ন সমস্যার সুরাহার নিয়ম ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক ব্যবস্থা আছে এবং এই বাবদ বহু অর্থ ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারিদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সুষ্ঠুভাবে সমস্যাদের জন্যেও নিয়মের ব্যবস্থা আছে, সেইসঙ্গে পরিচালকদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্যও রাজ্য এমনকী সর্বভারতীয় স্তরে নিয়ম ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিচালকদের মধ্যে এই বিষয়ে অনীহা ও উদাসীনতাই বেশি। এর কারণ হয়তো সমবায় প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা বর্তমানে পরিচালক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন তাঁরা কোন না কোন রাজনৈতিক দল বা শ্রেণীয় প্রতিনিধি বা সমর্থনে এই দায়িত্বে আসেন। এঁদের সামাজিক পরিচিতি ও প্রভাব থাকে, অনেকে হয়তো অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। ফলে এঁদের সামাজিক পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠার কারণে এঁদের মধ্যে হয়তো সুপ্তভাবে নেতৃত্বগুণ এক অহংবোধ থেকে যায়। এঁরা হয়তো মনে করেন যে আমরা তো সাধারণ মানুষের থেকে বেশি বুঝি, বেশি জানি, আমাদের আরও জানার বা শিখার কি আছে। এই মানসিকতার কারণে এরা নিজেরা যেমন শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ থেকে দূরে থাকেন তেমন কর্মচারিদেরও প্রশিক্ষণের জন্য সচেষ্ট হন না। এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করার প্রয়োজন আছে। কারণ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকর্মের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং সেখানে পরিচালকগণের যথাযথ ভূমিকা পালনের জন্য নিজেকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যোগ্য করে তোলা প্রয়োজন।

সঠিকভাবে ব্যাঙ্ক পরিচালনার একটি বড় বিষয় কর্মচারিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সহজ সুন্দর কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা। অনেক সময় দেখা যায় পরিচালকদের পরিচালকসুলভ অহং বোধের ফলে কর্মচারিদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কর্মচারিদের অজ্ঞতা অক্ষিতাদের বিষয় সৃষ্টি না দেওয়া, তাদের মতামতকে উপেক্ষা করা ও তাদের আত্ম-সম্মানের প্রতি মর্যাদা দেওয়ার অভাবে কর্মচারিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় তা ক্রমে বিস্তৃততর রূপপরিগ্রহ হয়। অনেক ক্ষেত্রে পরিচালকরা সুসম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ন্যায্য ও অন্যায্য বিচার না করেই সব দাবি মেনে নেন এবং এমন সব আচরণে অভ্যস্ত হয়ে যান যে তার ফলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শৃঙ্খলা যে নষ্ট হয়ে যায় এই বোধ হারিয়ে ফেলেন। এই দুই ধরনের প্রবণতা ভুল এবং এর থেকে নিজেদের মুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক স্বার্থকে কথা রেখে কাজের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা বজায় রেখে কর্মচারিদের ন্যায্য দাবি যথাসম্ভব পূরণ করা, তাদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা এবং তাদের আত্মমর্যাদার বিষয়টি স্মরণে রেখে কর্মচারিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় কর্মচারিদের অসংযত আচরণ ও ট্রেড ইউনিয়নের নামে হঠকারী কার্যকর্ম প্রতিষ্ঠানের ক্ষতির কারণ হয়।

আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সাধারণ সভা সকল সভ্যদের উপস্থিতির পরিবর্তে এলাকাভিত্তিক সভ্যদের প্রতিনিধি মারফৎ অনুষ্ঠিত হয়। বিধি সম্মত সাধারণ সভ্যদের উপস্থিতিতে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানে সাধারণ সভার আলোচ্য বিষয়গুলি ভালভাবে আলোচনার সুযোগ কম থাকে। বিভিন্ন সভ্যের বিভিন্ন মতামতে আলোচ্য বিষয়ের মূল কথা হারিয়ে যায়। অন্যদিকে বিরোধী অসৎ সভ্য ইচ্ছা করলে সাধারণ সভা ভণ্ডুল করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিনিধিদের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সকল বিষয় সুষ্ঠু আলোচনার সুযোগ থাকে। তাই আইনে এই ব্যবস্থার নির্দেশ আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কারণে সাধারণ সভ্যরা ব্যাঙ্কের কাজকর্ম, ভালমন্দ কোন সংবাদই পান না বা ব্যাঙ্ক বিষয় কোন মতামত দেওয়ার সুযোগ পান না। ফলে পরিচালক ও সাধারণ সভ্যদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি হয়। প্রতিনিধি নির্বাচন ঘটনা বা ব্যাঙ্কের কাজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তার থেকে বেশি নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রভাবের উপর। তাই

পরিচালক ও সমবায় সভ্যদের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই যখন তখন যোগাযোগ হয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানের সমবায় চরিত্র তথা সভ্যদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ পরিচালক ও সভ্যদের মধ্যে যোগাযোগ, সহমর্মিতা ও মত বিনিময়ের অভাব দেখা দেয়। ফলে সমবায় সভ্য ও পরিচালকরা যেন দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যান।

সমবায় সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার উদ্দেশ্যে পরিচালকদের উচিৎ অডিটের স্বাভাবিক অতিরিক্ত কিছু কিছু পদ্ধা অবলম্বন করা যাতে সাধারণ সভ্যদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়। সমবায় সভ্যরা যতদিন অন্তর থেকে অনুভব করবেন যে এই সমবায় প্রতিষ্ঠানটি আমাদের এবং পরিচালকরা যতদিন বিশ্বাসভরে মনে রাখবেন যে তাঁরা সাধারণ সভ্যদেরই প্রতিনিধি ততদিনই প্রতিষ্ঠানের সমবায় চরিত্র বজায় থাকবে।

আলোচনার শেষ পর্বে আশা করি লেখকের সঙ্গে আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকরাও একমত হবেন যে শুধুমাত্র আয় বি আই-এর সমালোচনার দ্বারা আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উন্নতি সম্ভব হবে না — দর্পণে নিজেদের আদলও দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আছে। পরিচালকরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার উপর আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের উন্নতি বহুল অংশে নির্ভরশীল। শুধুমাত্র আর্বান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক নয়, যে কোন সমবায় প্রতিষ্ঠানে পরিচালকদের ভূমিকাই প্রধান — তার প্রমাণ আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা নেতৃত্বের পরিবর্তে সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক পরিচালিত হবার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ক্ষেত্রে যে নতুন জোয়ার এসেছে তা জাতীয়স্তরেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ☐

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

রোহিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ৩৩ এইচ, জি তাং ১৬-২-৬০

গ্রাম ও পোঃ - খড়ুয়া জেলা : হুগলি

পাঁচুগোপাল ব্যানার্জি	অমলেন্দু ধর	শ্রীকণ্ঠ দাস
ম্যানেজার	*সম্পাদক*	*সভাপতি*

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

যদুপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

(মিনি ব্যাঙ্ক)

রেজি নং ৮৮ তাং- ২৯-৬-৭৭

মাধবনগর, ইংরেজবাজার, মালদহ

সমবায়ের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নে সমিতি বদ্ধপরিকর

ব্যবসা :

মিনিব্যাঙ্ক শাখার আমানত	১,৪০,০০,০০০.০০ টাকা
অনাদায়	২৩,০০,০০০.০০ টাকা (১৯৯৭-৯৮)
রাসায়নিক সার	৭,৯১,০০০.০০ টাকা (১৯৯৭-৯৮)
গভীর নলকূপ	একাকার চারটি গ্রামের ৮০ জন চাষিভাইদের জল সমবায় করা হয়।

নবীন সরকার	অনিলকুমার মণ্ডল	আমিনুল ইসলাম
চেয়ারম্যান	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

সাফল্যের পথে

সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি

(আই সি ডি পি)

এন সি ডি সি এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ সহায়তায়, হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা রূপায়ণাধীনে এই প্রকল্প শুরু হয়েছিল ১লা মার্চ, ১৯৯৪ এবং সমাপ্ত হবে ৩০শে জুন ১৯৯৯।

জেলার - আরামবাগ, জাঙ্গিপাড়া, ধনিয়াখালি, হরিপাল, পাণ্ডুয়া ও সিঙ্গুর – এই ছটি ব্লক এই প্রকল্পের অন্তর্গত।

এ যাবৎ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ ঃ

- ★ ৪৯টি ১০০ মেট্রিক টন গো-ডাউন নির্মাণ,
- ★ ৬৭টি আমানত কাউন্টার ও লৌহ সিন্দুক প্রদান,
- ★ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলিকে ৪০ লক্ষ টাকার মার্জিন মানিসহ ১ কোটি টাকার ব্যবসায়ের মূলধন প্রদান,
- ★ ২টি সমবায় হিমঘর সমিতির হিমায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, ব্যবসা এবং ড্রাইং শেডের জন্য মোট ৩৬ লক্ষ টাকা প্রদান,
- ★ ৪টি সমবায় বিপণন সমিতিকে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যবসায়ের মূলধন প্রদান,
- ★ ১০টি সমবায় তন্তুবায় সমিতিতে ১৪ লক্ষ টাকার রাজ্য সরকারি অংশগত মূলধন প্রদান,
- ★ মোট ৮০টি সমবায় সমিতির কর্মচারিগণকে ৮ লক্ষ টাকা উৎসাহভাতা প্রদান, এবং
- ★ সকল সমিতির কর্মচারী পরিচালক এবং সদস্যগণকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান; মোট ৭০০০ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

এ যাবৎ এই প্রকল্পে প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে (অগাস্ট ৯৮ পর্যন্ত)

ঘরের বাইরে ঘর

পরিবেশ পরিবারের ★ স্বাচ্ছন্দ্য হোটেলের

পুরী

দার্জিলিং

দিঘা

(দিঘাতে কর্মী সমবায়ের নিজস্ব ভবন)

উটি

মানালি

পঞ্চগনী (মহারাষ্ট্র)

যোগাযোগ

স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া

এম্‌প্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

২, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

ফোন : ২২১-১৪৫৮, ২২০-৮১২৯ (সরাসরি), ২২০-২৩৭১

এক্সটেনশন : ৩২৫, ৩৯৮

আপনার, আমার সকলের ব্যাঙ্ক

৩৯৬, জি টি রোড, বালি, হাওড়া

দূরভাষ : ৬৫৪-২১০৮

- সকাল ও সন্ধ্যা উভয় সময়েই লেনদেনের সুযোগ, এমনকী রবিবার সকালেও।
- বিভিন্ন জমা প্রকল্পে যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা অধিক সুদ।
- সহজ শর্তে এন এস সি, আই ভি পি, কে ভি পি এবং স্বর্ণ বন্ধকি অগ্রিমের সুবিধা।
- গিফ্‌ট চেক, পে-অর্ডার, ড্রাফ্‌ট-এর সুবিধা আছে।
- একটা পূর্ণ ব্যাঙ্কের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গ্রহণে আজই আসুন।

মনে রাখবেন
এই এলাকার আমানত
এলাকার আর্থিক মানোন্নয়নেই ব্যয়িত হয়।

দেবকুমার বসু	নিরঞ্জন গুপ্ত	সুবীরকুমার ব্যানার্জি
সভাপতি	সম্পাদক	চিফ এক্সিকিউটিভ

ওরে নিপীড়িত, ওরে ভয়ে ভীত শিখে যা

আয় রে আয়।

দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র – "সমবায় সমবায়"

– কাজী নজরুল ইসলাম

বালি জুট মিলস্ এমপ্লয়িজ কো-অপরেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

৫ নং, শ্রীচরণ সরণি
বালি, হাওড়া
পিন : ৭১১ ২০১

শিশির চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি

ধনঞ্জয় বণিক
সম্পাদক

অন্য পথের খোঁজে

প্রদীপকুমার ভাদুড়ি

বাবার ঘরে আলনার হ্যাঙারে ঝোলানো পাঞ্জাবির পাশ পকেটে হাত ঢোকালো সে, উইলস ফিল্টারের একটা প্যাকেট বেরিয়ে এল। খুলে দেখল একটা মাত্র সিগারেট। কাজলে ধরা পড়ে যাবে। বাবা মাকে বলবে, দ্যাখো, বাপের পকেট মেরে কেমন সিগারেট খাচ্ছে তোমার সুপুত্তুর।

মা চিরনী কাটবে, যেমন রাগ তার তেমনি ছেলে। নিজে একসময়ে বাপের পকেট মেরে বিড়ি টানতে। ছেলে তোমার পকেট মেরে সিগারেট টানছে। অপরাধ কি হল?

পাঞ্জাবির বুক পকেটে হাত গলালো সে। বেশ কয়েকটা দশ আর পঞ্চাশ টাকার নোট। মুণ্ডো নবুই। শালা নিশ্চয়ই ব্ল্যাকমেল টাকা। একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে বাকিটা পকেটে রেখে দিল।

নিজের ঘরে গিয়ে সিডিপ্লেয়ারে ঝরনাতের ক্যাসেট চালিয়ে বিছানায় লম্বা হল। ঝরনাতের গানগুলো ভালো লাগে সুজিতের — 'লাভ তুমি লাভ ব্যাড করত।'

মন দিয়ে গানটা শুনলো। পরের গান — 'হাম্মকো লিফ তুমসে পেয়ার হ্যায়'। গানটা শুনতে শুনতে মেয়েটার কথা মনে হল তার। দারুণ হট পায়রা। মীনাক্ষী।

তখনটা একদণ্ড লাইন করে দিতে পারলো না। ওদের বাড়িতে নাকি ঘাতায়াত আছে। শুনলা, নিজেই-না। তাহলে তখন বলতো, ও তো জানে সুজিতকে।

আজ একবার চেষ্টা করবে।

ড্রয়ারে একটা প্যাকেট কখন রাখা ছিল। একটা সিগারেট আছে। ধীরেসুস্থে মাথার পিছনে দুই হাত রেখে আরাম করে টানতে লাগলো। দেওয়ালে মীনাক্ষীর বড় পোস্টার। তার পাশে শচীন আর সৌরভের।

মোপার মুখটা মনে পড়লো। একদম মীনাক্ষী। চোখ, কপাল, ঠোঁট। পুরো দারুণ। চড়াক, করে উঠে মীনাক্ষীর ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে ফিরে তাকাতেই দরজায় মাকে দেখলো।

ওই করো তুমি! ঘর সব অন্ধকার!

ও! মা! মীনাক্ষী দারুণ হট। আমার তীব্রণ প্যাশন। তোমরা এসব বুঝবে না। দশটা টাকা দাও।

বা! কথা ঘোরাতে কি রকম পারিস।

কথা ঘোরানো কি আছে। আই লাইক মীনাক্ষী। দশটা টাকা দাও।

এখন আবার টাকা কি হবে। পরশু তোর বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিবি। কিসে এতো খরচ করিস?

দশটা টাকার জন্যে এতো কৈফিয়ৎ? থাক লাগবে না।

কোথা থেকে পাবি?

সে তোমায় দেখতে হবে না।

মিষ্টি বাবা। সব কথাতেই ছেলের তেজ। প্রতিমা আর কথা বাড়ালো না।

সিগারেট বাস স্টাণ্ড হাফ রাউণ্ড করে দাড়ানো ব্লেডের কোণে সাইকেল দাঁড় করালো সুজিত। মীন ভবনের পাঁচিলের গায়ে কয়েকটা গুমটি। শেষেরটা পান-সিগারেটের। সিটে বসেই পকেট থেকে দশ টাকার নোট বার করলো। টাকাটা এগিয়ে দিয়ে দোকানীকে বললো, এক প্যাকেট চারমিনার।

হাসপাতালের কাছে সস্তুর চায়ের দোকান। দু পাশে বেঞ্চি পাতা। সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সুজিতদের ঠেক। সন্তুকে এক কাপ চায়ের কথা বলে সিগারেট ধরালো সে। এখনো শালারা কেউ আসেনি। পল্টু তো নটার আগে বিছানা ছাড়ে না। পল্টুর মালটার যেন কি নাম? শ্রীপর্ণা। সুজিত কয়েকমাস আগে জরিতার পিছনে লাইন লাগিয়েছিল। এক আষাঢ়ের সাইকেলে পিছন পিছন গিয়েছে। একদিন বিকেলের দিকে ঝরনাতের সেই গানটা গেয়েছিল — হাম্মকো লিফ তুমসে পেয়ার হ্যায়। শুনে বিস্ময় চোখে তাকিয়ে হেসেছিল জরিতা।

এর দুতিন দিন পর শ্রেপাকে চোখে পড়ে গেল। ফ্যান্টাস্টিক, একদম মীনাক্ষী। ঠোঁট, চোখ, কপাল। জরিতার পেছন ছেড়ে দিল। সেই থেকে জরিতা আসছে দেখতে পেলে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। উদাস চোখে অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টানে। জরিতা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, হঠাৎ পিছনে ফেরার কারণ বুঝতে পারে না।

জরিতাই কেস কথাবার্তা হয়নি। লাভ-টাভ কিছু হয়নি। চার্জ করার সুযোগ নেই জরিতার। প্রসূনকে একদিন সুজিত বললো, তুই ওটার পিছনে লেগে যা।

ড্যাট্। ওটা তো তোর পায়রা। একটা ভালো মাল আসছে কলিন থেকে। একদম মীনাক্ষী বললো।

ওটা আমার, গম্ভীরভাবে বললো সুজিত, ওদিকে হাত বাড়ালে তোর হাত কেটে নেব।

কাট নিবিরে তুই। জরিতার পিছনে লাইন লাগিয়েছিলি। আবার এখন নতুন পায়রা।

বললাম তো। জরিতাকে তুই নিয়ে নে।

তোর এঁটো এাম আমি নেব কেন? ক্ষুব্ধস্বরে প্রসূন বললো।

নিবি না তো অন্য কোন একটা বেছে নে। কিন্তু ওটার দিকে হাত বাড়ালে ভালো হবে না। সুজিত হুমকি দিল।

সুজিত আর প্রসূনের মধ্যে লিডারশিপের টানেল একটা তরোই লেগে গিয়েছিল। এই ঘটনা ওদের মধ্যে তিক্ততা বাড়ালো। দুদিন পর প্রসূন এই ঠেক ছেড়ে দিল। এখন ও বসজিম মোড়ের কাছে নতুন ঠেক করেছে। একদিন ফাটাফাটি হয়ে যাবে সুজিতের সঙ্গে।

কোয়ার্টারের দিকে মুখ করে বসে আছে সুজিত। পল্টু আর তনুময় এসে সাইকেল স্ট্যাণ্ড করাচ্ছে। তিন কাপ চায়ের অর্ডার দিল সুজিত; সিগারেট প্যাকেটটা পল্টুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ইণ্ডিয়া-সাউথ আফ্রিকার খেলা কটায় স্টার্ট?

রাত নটা থেকে থ্রো নাইট। পল্টু উত্তর দিল।

আজ তোর বাড়িতে খেলা দেখতে যাব।

প্রাণ, বাড়ি খালি। আজ কিন্তু হয়ে যাক। পল্টু বললো।

কাইন। হাত বাড়িয়ে সুজিত পল্টুর হাতে তালি দিল। খেলাটা খেলার মাঠে ডিকটির পর

জলি মেয়ে হোস্টেলের।

তপন তখন এসে বসেছে। বললো, আমাদের চেয়ারম্যান আর প্রধান।

সুস্মিত বললো, ও আমাদের সঙ্গে ঠিক মিশ করবে না।

পল্টু বললো। প্রধান কিন্তু ভালো বাঁধতে পারে। আর মালটাল আসে। কি নিবি আজকে? রাম?

তপন বললো, হেভি লেগে যাবে। পার হেড একপেগ।

তাই। সুস্মিত বললো, ঘাট-সত্তর এনাফ, পল্টু, তোর পারফা।

শ্রীপর্ণা একটু মোটাসোটা। পুষ্ট শরীর। সাইকেলে তাকে আসতে দেখে পল্টু উঠে দাঁড়াল, তাহলে ওই হোস্টেলটাই ঠিক, বলিহারি।

সুস্মিত বললো, ঘুরে আয়, এন্টিসেট করতে হবে।

শ্রীপর্ণার সাইকেল এগিয়ে গেল। পল্টু প্যাডেলে পা লাগালো।

তপনকে কাছে ডেকে নিয়ে সুস্মিত জিজ্ঞেস করলো, পারমাকে বলেছিস?

বলেছি তো। কিন্তু শালার মেয়ে বড্ড চালু। কিছুতেই ঘাড় কাত করে না।

ভাই শালা।

জরিতা আসছে সাইকেলে। মুখটা ঘুরিয়ে সিগারেট টানতে লাগলো সুস্মিত। জরিতা পার হয়ে গেলে তপনকে জিজ্ঞেস করলো, খুব ফাঁট আছে না মেয়েটার।

তপন রাস্তার দিকে একমনে মেয়ে দেখছিল। জিজ্ঞেস করলো কার?

গোপার। একদিন রাস্তায় দাঁড় করিয়ে পটিয়ে চুমা, চুমা দে। ওর আবা হেভি জিনিস, তপন মাথা না ঘুরিয়ে বললো, যা কমপ্লি সমঝে গুরু।

আমার চাই ওকে, মেয়ের ওপর ঘুরি মেরে বললো সুস্মিত, সেজন্যে আমি যে কোন রিস্ক নিতে রাজি।

সে তোর ব্যাপার। লাভ সব সময়ে অত জোর-জবরদস্তি করে হয় না!

তবে কি শালার তোষামোদ করে পায়ে পড়তে হবে।

বীরেন চাহিয়ে বসে। মুডসেট ওয়াচ করতে হবে। কিন্তু ট্যাকটিক্যাল অ্যাকশন নিতে হবে। লাভ ইজ এ ওয়ার। আসছে তোর পারফা।

সুস্মিত দেখতে পেল গোপাকে। সাইকেলে মরালীর মত গ্রীবা উঁচু করে কোনদিকে না তাকিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে গোপা। সুস্মিত তার সাইকেল নিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। গোপা পাশ হতেই প্যাডেলে চাপ দিল সে। ক্রস গোপার পাশাপাশি এসে গেল। এবার একটু এগিয়ে দিয়ে হ্যান্ডেলটা বেঁকিয়ে দিল। ক্রস নিজের সাইকেল ঘুরিয়ে বাঁদিকে সরিয়ে নিয়ে রাগত চোখে তাকালো সুস্মিতের দিকে। একটু এগিয়ে সুস্মিত আবার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে গোপার রাস্তা অবস্ট্রাকশন করলো।

ছেলে ইস্কুল পার হয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছাকাছি সুস্মিত আবার সাইকেল ঘুরিয়ে গোপার রাস্তা আটকে দিল। বাধ্য হয়ে সাইকেল থেকে নেমে ক্ষুব্ধস্বরে গোপা জিজ্ঞেস করলো, আপনি আমাকে ডিসটার্ব করছেন কেন?

সুস্মিত মুচকি হেসে বললো, একটা কথা ছিল ডার্লিং।

অসভ্যের মত কথা বলছেন কেন? রাস্তা ছাড়ুন, কি চান আপনি?

মুচকি হেসে সুস্মিত ভদ্রী করে বললো, ঘোড়া পার চাইরে।

চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে গোপার। ক্রুদ্ধস্বরে বললো, অসভ্য, ইতর ছেটলোক কোথাকার?

লোকজন যাতায়াত করে এই রাস্তায়। কয়েকটা স্টল আছে। পাশে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। একজন মধ্যবয়সী লম্বা মত লোক গোপাকে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে মা?

দেখুন না, ইস্কুলে যাচ্ছি। এ আমাকে রাস্তা আটকে নোংরা নোংরা কথা বলছে।

চেনো একে?

না কাকু। ক'দিন ধরে দেখছি সাইকেল নিয়ে আমার পিছনে আসে। রাস্তা আটকে নোংরা হিন্দি গান গায়। আজকে — ঘেন্নায় কথা বলতে পারে না গোপা।

লোকটা সুস্মিতের কলার ধরে গালে থাপ্পর কষালো, কিরে হারামজাদা! মেয়েদের পিছনে লাগছিস কেন?

সুস্মিত লোকটার হাত টানতে টানতে বললো, কলার ছাড়ুন।

আবার গালে চড় কষিয়ে লোকটা বললো, কলার ছাড়ুন! ইভটিজিং হচ্ছে?

এটা আমাদের প্রাইভেট ম্যাটার। আপনি মস্তানি মারছেন কেন? কলার ছাড়ুন।

আরে ওস্তাদের বাচ্চা, আমার মস্তানি তো দেখিসনি এখনো। অ্যাই নিত্য, শালার সাইকেল কাড়ো তো। মস্তানি কাকে বলে একটু দেখিয়ে দিই।

নিত্যকে চেনে সুস্মিত। পুলিশের কনস্টেবল। এ তাহলে পুলিশের অফিসার হবে। সুস্মিত বুঝতে পারলো যে ফাঁদে পড়ে গেছে। কিন্তু গোপার সামনে ওর প্রেস্টিজ পাতায় হয়ে মেতে বসেছে। বললো, ও মিথ্যে বলছে।

আর তুই যুধিষ্ঠিরের বাচ্চা। চুলের মুঠি ধরে মাথাটা নিচে নামিয়ে ঘুম ঘুম করে পিঠে দিল কষালো দারোগা। কষায় কঁকিয়ে উঠল সে। চল থানায়, একটু ভালো করে ধুনিয়ে দিই। ব্রোমিওগিরি তাহলে ছুটে যাবে। গোপার দিকে চেয়ে বললো। তুমি মা ইস্কুলে যাও। তোমার নাম ঠিকানা বলতো?

ভিড় জমে গেছে। তার মধ্যে প্রফুল্লও আছে। নিত্য লোকটা ওর কলার ধরে। এত ছেলেরা। এত অপমান। রাগে, দুঃখে, অপমানে ওর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। মাথাটা জ্বাম হয়ে গেছে। পুলিশের খপ্পরে পড়েছে। ছেলেটা ওর ডুবিয়ে যাচ্ছে।

ধুলা থেকে ছাড়া পেল বিকেল বেলা। ওর মন আর শরীর বিষণ্ণ। সারাটা দিন প্রায় ঘরের মেঝের পাশে-উবু হয়ে বসে থাকতে হয়েছে। বন্ধুর বাইকের পেটে উঠিবুঠি মেরে ওর সাহস ঘুচিয়েছে। কৌতূহলী মানুষ ব্রোমিওর বিষণ্ণ অবস্থা দেখে কৌতুক আর রস করেছে।

বিকেলের দিকে বাবা এল। সব শুনে নিজেও দু-চারটে থাপ্পর দিয়ে অফিসারকে বললো, বেশ করেছেন স্যার, জানতেই পারি না আমার ছেলে একটা হবে।

চাঁদা চেয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে অফিসার বললো, কি করেন আপনি?

কনস্ট্রাকশনে কাজ করি।

এস ডি ওকে দিয়ে কেন করিয়েছিলেন আমার আমাকে বলছেন বেশ কাজ করেছি? ছেলে মস্তানি করছে, ব্রোমিও হয়ে উঠেছে-লক্ষ রাখেন না কেন?

আজকালকার ছেলেদের ক্যারেক্টার ওইরকম স্যার। বাবা মা কাউকে মানতে চায় না।

ছেলেমেয়েদের ওপর দোষ চাপানোর আগে নিজেদের চরিত্র আর দায়িত্ব নিয়ে ভালো করে ভাবুন। ওদের সামনে যে রকম রাস্তা দেখাবেন ওরা সেই পথেই হাঁটবে।

সুস্মিতের বাবা চুপ করে রইল।

অফিসার একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললো, নিন সই করুন। পি আর বন্ডে ছেড়ে দিচ্ছি। ছেলেকে ঠিক রাস্তায় দায়িত্ব আপনার। এরপর এসব করতে দেখলে সোজা চালান করে দেব।

বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে ঢুকে সুস্মিত দরজা বন্ধ করলো। বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরালো। অপমানে আর গ্লানিতে ও বিষণ্ণ। এরকম অপমানিত যে হতে পারে

কথন করতে পারেনি। চিন্তা-ভাবনা সব ব্লাঙ্ক হয়ে যাচ্ছে। অথচ সময় হয়ে যাচ্ছে।

দরজায় টোকা। মা ডাকছে, দরজা খোল সুজিত।

কোন জবাব দিল না সে।

দরজার বাইরে থেকে মা বলছে, কিছু খেয়েদেয়ে সুজিত। সারাটা দিন না খেয়ে আছিস।

ড্রয়িংরুমে সুজিত বসেছিল, এখন যাও তুমি। এখনই ছাড়বে না।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছে সে। উঠে বসেছে। মীনাক্ষীর পোস্টারের দিকে তাকালো। রাগে ঘুষু ছিটিয়ে দিল সে। তাকিয়ে আছে হাসি মুখে। স্নোপার কথা মনে পড়ল। দেয়ালে। সুন্দর মুখের দেয়াল। আজ পর্যন্ত সুজিতকে কেউ রিজেক্ট করেনি। কিন্তু একটা করতে হবে। কিন্তু একটা না করলে এই অপমানের জ্বালা সে ভুলতে পারবে না।

আবার তাকালো সে মীনাক্ষীর পোস্টারের দিকে। মীনাক্ষীর মতো দেখতে। শালির এই মুখ আমি — হ্যাঁ। অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে। সোজা হয়ে বসলো সে। এতোক্ষণে ঠিক ঠিক প্রতিশোধের উপায় খুঁজে বার করতে পেরে অপমানের জ্বালা একটু প্রশমিত হল।

জেলা আর অনুমন্ত সন্তোষেলা এসে দেখা করে গেল। পাত্তা দিল সুজিতকে। একটি কথাও সে বলল না। তপন এল। পল্টু এল। স্নোপার সম্বন্ধে নানা অশ্লীল কথা বললে। সিগারেট দিলে। সুজিত কোন কথা বললো না।

তপন বললো, আজকের মিস্ট অনেকে বন্ধ থাক।

সুজিত হ্যাঁ না কিছুই বললো না।

ওরা চলে গেল ঘরের দরজা বন্ধ করে, সিগারেট ধরিয়ে নিজের প্ল্যান নিয়ে ভাবতে লাগলো।

পরদিন সকালে সুজিত ঠেকে গেল না। বাজারে খোঁজ নিয়ে এক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড কিনে ব্যাগে পুরে বাড়িতে এল। বইয়ের তাকের পিছনে লুকিয়ে রেখে বিছানায় শুয়ে থাকলো অনিক। পা নাচালো। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করলো। তারপর উঠে সাইকেল নিয়ে বেরোল স্পট ঠিক করতে।

পাইকপাড়ার জেলা ওদের বাড়ির কাছেই স্নোপাদের বাড়ি। স্নোপা আর ওদের বাড়ির মাঝামাঝি যে বাঁক আছে ওই জায়গাটাই স্পট হিসেবে ঠিক করলো সে। এখানে লোকজন কম যাতায়াত করে। কিন্তু স্নোপা ওকে চিনতে পারলে। এই ব্যাপারটার সমাধান কিভাবে করা যায় ভাবতে ভাবতে ওদের দরজায় কড়া নাড়লো সে।

ওমাই দরজা খুললো কি খবর সুজিত? আয় ভেতরে আয়। সুজিত হেসে বললো, কদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি। তা বেশ করেছিস, ওরা হাসল, মা সুজিত এসেছে।

ছোটবেলায়, তখনও ইস্কুলে ভর্তি হয়নি, সুজিতরা এই পাড়ায় ভাড়া থাকত। ওদেরই পাশের বাড়িতে। সারাটা দিনই কাটতো ওদেরই বাড়িতে-ওর আর ওর ছোট বোনদের সঙ্গে খেলা করে। তারপরে ইস্কুলে ভর্তি হল একই সঙ্গে, একই ইস্কুলে।

কবে থেকে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘটিত হল? ক্লাস নিন-এ পড়ার সময়। সুজিতদের বাড়ি তৈরি হল। ওরা উঠে এল জগদলপাড়ায়। ওদের পারিবারিক জীবন-যাপনের পদ্ধতিটা কেমন যেন গাপ্টে গেল। সুন্দর সাজানো বাড়ি, ফার্নিচারে আর আধুনিক উপকরণে সাজানো। সন্ধের পর বন্ধুবান্ধব নিয়ে তখন মদের আড্ডা। বাবার বন্ধুদের সঙ্গে মায়ের হাল্কা চটুল রসিকতা। কেবল সাইন লাগানোর পর রাত জেগে সিনেমা দেখা।

বেপরোয়া বন্ধনহীন জীবনযাপনের স্বাদ পেতে আরম্ভ করলো সুজিত।

এখানেই ওদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেটে যেতে আরম্ভ করলো। ওরা শান্ত, বিনয়ী, মেধাবী। পরিচ্ছন্ন চকচকে ছেলে সে, স্বভাবতই মুহূর্তে দূরত্বে দূরত্বায় বয়ে যেতে শুরু করলো।

ওরা নিজের ঘরে এনে কাছে সুজিতকে। বললো, কাল রাতে এসেছি কলকাতা থেকে। কেমন আছিস তোরা?

জানে, সুজিত হাসল। অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয়নি।

বেশ করেছিস। মাকে ডাকি। তোকে দেখলে মা খুব খুশি হবে। মা বোধ হয় শুনতে পায়নি তুই এসেছিস।

ওরা নিজে ঘাকে ডেকে নিয়ে এল। ওকে দেখে ওদের মা বললেন, হাঁরে সুজিত। এমন রুক্ষ লাগছে কেন তোকে? শরীর-টরীর খারাপ নাকি?

সুজিত প্রণাম করে বললে, না ঠিক আছি মাসীমা।

ওদের মা বললেন, হাঁরে তোর সম্বন্ধে যে নানারকম কথা শুনি? পড়াশোনা ঠিকমতো করছিস তো? কতদিন যে তোর মায়ের সঙ্গে দেখা হয় না।

আপনি চলুন না আমাদের বাড়ি? সুজিত বললো।

এই সপ্তাহের মধ্যেই। পেরে উঠি না সময় করে। যাব একদিন সময় করে দেখিস।

হাঁরে, লেখাপড়া ঠিকমতো করছিস তো? দেখ বাবা, জীবনে এই সময় সবচেয়ে উপযুক্ত, একে অবহেলা করলে আর পাবে না। আজ ঠিকমতো কাজে লাগালে জীবনটাকে সুন্দর করে তুলতে পারবে। হাঁরে, তোর বাবা মা সব কেমন আছে? একদিন আসতে বলিস আমাকে।

এখন প্রশ্নের জ্বান মারবে। সুজিত উঠে দাঁড়াল, আসি আসি মাসীমা।

সে কিরে। ক'দিন পর এলি। ওদের সঙ্গে গল্প কর। তোকে একটু কিছু খাওয়াই। হাঁরে, চানটান করে খেয়েই যা।

পরে একদিন খুব মাসীমা।

সুজিত বেরিয়ে এল। তার মাথার এখন স্নোপা আর নাইট্রিক অ্যাসিড। ওদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলা যাবে না। মাসীমা জ্বান মেরে যাবে। স্নোপার বাড়ির পাশ দিয়ে জোরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল সে।

এত তাড়াতাড়ি যে ওকে দেখতে পেতে হবে ভাবতে পারেনি সুজিত।

একটু আগে ঠেক ছেড়ে যে যার বাড়ি চলে গেছে। সাড়ে ন'টার ভলো সিনেমা ডিভিতে। ন'টার একটু পরে তপন এল, লিপগ্লির হাসপাতালে চল, তোর বন্ধু ওর স্টাবড্ হয়েছে।

সে কিরে। আশ্চর্য হয়ে গেল সুজিত, আজ সকালে ওর সঙ্গে দেখা হল। ও তো কোন ব্যাপারে থাকে না। ওকে স্টাবড্ করবে কে?

সে সব অনেক কথা। হাসপাতালে গিয়ে শুনবি।

হাসপাতালে ছুটলো সুজিত।

ওদের সঙ্গে ছোটবেলা থেকে মিশছে সুজিত। একদিতে সে শান্ত, বিনয়ী, ধীর এবং ধৈর্যশীল। কিন্তু কাপুরুষ নয়, সামনে অন্যায় দেখলে অথবা কিছু করে পালানোর পথ খোঁজে না। মাসীমা সে অবশ্যই তাকে গড়ে তুলেছেন।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার সে লক্ষ্য করেছে মাসীমার মধ্যে। কখনো অহেতুক প্রশ্রয় দেননি। কখনো কোন ব্যাপারে অভিভাবক সেজে বসেননি। কোন সমস্যা যা বিপদের মধ্যে পড়লে হাত বাড়িয়ে টেনে তোলেননি। অথচ বোঝা গেছে পরোক্ষ উপায়ে বিপদের মোকাবিলা করার জন্যে। অন্যায় করলে তীব্র তিরস্কার করেছেন, অথচ অন্যের কাছে ওর সমর্থন খুঁজিয়েছেন সমস্তরকম অসুবিধা সত্ত্বেও। এমন সুস্থ সবল চরিত্র ওরা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে।

আজ সন্তোষের দলছুটি পাল্টা নিয়েছিল ওর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। যেতে যেতে তপন সংক্ষেপে বলল, বেরার পথে সতর্কতা করতে হাল স্টারের কাছে বাঁকা গলি দিয়ে

আসছিল সে। ওখানে চোখে পড়ে একটা ছেলের কাছে একটা মেয়েকে টানাটানি করছে দু'তিনটে লোক। ব্যাপারটা অনুমেয়। মেয়েটা ছটফট করছে। ব্যাপার দেখে ওর মাথা গরম হয়ে পড়ে। এখানেই ও স্টার্টবন্ধ হয়।

একটু আগে ও টি ছেড়ে বার করে আনা হয়েছে ওদের। নাকে অক্সিজেন নল। ব্লাড আর স্যালাইন চলছে। ওদের মা, বোন আর কয়েকজন ছেলে কাছে। নিচে একটা জায়গার দেখে এসেছে হাসপাতাল কম্পাউন্ডে। ওরা ওদের জন্যে আসছে।

সুস্মিত জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছে এখন ও?

ওদের মা বললো, আর সুস্মিত, সকালে তোর সঙ্গে দেখা হল আর সন্ধেতে এই ঘটনা।

উনিশ/কুড়ির একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে মাসীমার পাশে। মুখে চোখে আশঙ্কা, অনুকম্পার ছাপ। তখন বললো, এই মেয়েটি।

সুস্মিত বলে ফেললো, আপনার জন্যে ওদের এই দশা।

কেন ওকে এ কথা বলছিস? ওদের মা ধমকে উঠলো, ওর কি দোষ? একটা মেয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে সন্ধেবেলা, কাজে যোক আর অকাজেই যোক, তার একটা নিরাপত্তা থাকবে না? কতকগুলো জন্তু-জানোয়ারের কলবাইসি দেখে ল্যাজ গুটিয়ে পালিয়ে আসতে হবে না কি?

সুস্মিত বললো, কিন্তু এইরকম বিপদ মাসীমা!

বিপদ তো জীবনে যেকোন সময়েই হতে পারে সুস্মিত। এই মেয়েটি না হয়ে যদি আমার মেয়ে মন্দিরা এইরকম অবস্থায় পড়তো আর তুই যদি দেখতে পেতিস তাহলে? পালিয়ে আসতিস? আসতে পারতিস পালিয়ে?

সুস্মিত বললো, না মাসীমা।

তাহলে? তাহলে তুই বল্ সুস্মিত? আমাকে তো তুই দেখছিস এতদিন ধরে, আমার ছেলেমেয়েরা ছেলেবেলার মত, কাপুরুষের মত জীবন কাটাবে এই আমি কখনই চাইবো না। এতবড় একটা অন্যায় চোখের সামনে ঘটছে আর তাতে মুখ লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে — এ যদি জানতাম তাহলে ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিতাম না।

ওদের মা একটু থেমে আবার বললো, আমার ছেলে মরে যেতে পারতো, মা হিসেবে আমার চিন্তাটা কি পাল্টে যেত না, কোন মায়ের তা না যায় বল? কিন্তু অবলীলায় আমার ছেলে একজন বীরের মত, মানুষের মত কাজ করতে গিয়ে মরে গেছে। অনেক মেধাবী ছেলে আছে, তারা শুধু নিজের জন্যে, মার্কশিটের মত বাঁচে। অন্তত ওতো সেরকম নয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করে।

সুস্মিত ভাবলো, সোপাকে ও টিজ করছে যখন, ওর যদি ওখানে থাকতো, তাহলে? মাসীমা কি জানে সোপাকে ও টিজ করছে!

নিজের ভেতরটা গ্লানি আর সঙ্কোচে ভরে গেল। অনেক বড় মনে হল ওদের। ওর শারিত দেহ হাসপাতালের এই বেড। ওর মা। এতগুলো মানুষ ওর মঙ্গল কামনা করছে। হাসপাতালের কম্পাউন্ডে যে ভীড় দেখে এসেছে ওরা তো সবাই এসেছে ওদের জন্যে, একজন মানুষের মত কাজ করেছে ওরা এই ভেবেই তো, তার মহানতার প্রতি আন্তরিক টানেই তো এসেছে।

নিজের কথা মনে পড়ল সুস্মিত। সেদিন যখন পুলিশের দারোগা কলার ধরে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে তো অনেক লোকের ভীড় জমেছিল। কোন্ ভাবনা নিয়ে তারা দেখছিল সুস্মিতকে, ভেবে নিয়ে? একটা জন্তুকে দেখছিল তারা? নিজের ভেতরটা অনুচিতায় ভরে গেল তার। এই পরিবেশের মধ্যে থাকার কোন অধিকার নেই।

জীবনকে কেমন করে ভালবাসা করতে হয় ওরা তা জেনেছে, শিখেছে। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেই তো সে শিখেছে? ওর মা হয়তো সাহায্য করেছে। আর সে? পাল্লাপালি তো প্রায় বড় হয়ে উঠেছে। অথচ নিজের জীবনকে কী অর্থে নিয়ে চলেছে। কত তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবে ব্যবহার করছে জীবনকে। এই বিদেশ রেখা তাকে আত্মগ্লানি আর অনুশোচনায় ভরিয়ে তুলল। ❑

'শিউলি তলার পাশে পাশে
ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে
অরুণ রাঙা চরণ ফেলে'

— রবীন্দ্রনাথ

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ

বারুল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম- পোঃ - বারুল, জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৩৮ এইচ জি ; তারিখ - ১৬-৩-৬০

গৌরহরি পাল
সভাপতি

অমল চক্রবর্তী
সম্পাদক

পতিতপাবন চৌধুরী
প্রবন্ধক

With

Co-operative

Greetings

M. R. Plastics

MANUFACTURER OF

FIBRE GLASS REINFORCED PLASTICS PRODUCTS

WORKS :

147/A, DAWANGAZI ROAD

BALLY, HOWRAH-711 201

PHONE : 654-3048

CENTRAL BANK OF INDIA EMPLOYEES' CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED

10, NELLIE SENGUPTA SARANI, (3RD FLOOR)
CALCUTTA-700 087
TELEGRAM : CENTSAMABA

- ☆ *Share Capital* — *More than one Crore*
- ☆ *Working Capital* — *More than Eleven Crores*
- ☆ *Serves more than 7,500 members in Eastern India.*
- ☆ *Offers Loan Facility Rs. 40,000/- (maximum)*
- ☆ *Runs Eight Holiday Home at —* ★ *Bakkhali* ★ *Calcutta* ★ *Digha* ★ *Puri* ★ *Rajgir* ★ *Darjeeling* ★ *Santiniketan* ★ *Varanasi*
- ☆ *Extends many more facilities under social benefit scheme.*

প্রবন্ধ

প্রকৃতির নির্বাচন

অরুণাভ সান্যাল

শুধু বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অন্তত কিছুটা খাদ্য। 'শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়'— মনে পড়ে। প্রকৃতির শীত-গ্রীষ্মের নরম বা চরম অবস্থা সইবার জন্য জীব তার ইন্দ্রিয়গুলিকে উপযুক্তভাবে বিন্যস্ত করে। কিন্তু পেট না ভরলে পিঠে সইবে কেন ঐসব চরম ঋতু ও পরিবেশের আক্রমণ?

কিন্তু জন্ম নিয়েছে এমন সব প্রজাতি, সবারই হয়তো প্রকৃতির যোগান দেওয়া কোন উপকরণটিই বেঁচে থাকার জন্য জরুরি। এ-প্রজাতি ও-প্রজাতির মধ্যে প্রথমে চলে শান্ত প্রতিযোগিতা, পরে দাঁতে রক্ত, নখে রক্ত চলে এ ওকে ঠেলে বের করে দেবার চৈরথ। ঐ মরণপণ চৈরথে কত প্রজাতিই নাকি পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। এক দল খাবে তো অন্য দল খেতে পাবে না। যারা জঙ্গল ছেড়ে তিন জঙ্গলে খাবার সুযোগ পেল, সেখানকার ঘাসপাতায় যদি সে বাঁচল তো বাঁচল। সেখানেওতো রয়েছে প্রতিযোগিতা। এই প্রক্রিয়ার নামই হেরবার্ট স্পেনসারের কথায় সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট। 'যোগ্যতমেরই টিকে থাকার' প্রক্রিয়ার অন্তঃসার। খাবার যেখানে যথেষ্ট নয়, নানা প্রজাতিও যেখানে নেই, একটি-দুটি প্রজাতিই প্রকৃতির যোগান দেওয়া ঘাসপাতার পরিমাণের সঙ্গেই তখন তারা নিজেদের মিলিয়ে নেয়। ব্রিটেনের খুব জাতের বীজ সেটল্যান্ড। সেখানে ছোট্টখাট্ট, প্রায় আমাদের দেশি কুকুরের মাপে ঘোড়া পাওয়া যায়। একসময় বলা হত সেটল্যান্ডের ঘোড়া মূল ঘোড়ার প্রজাতির থেকে ভিন্ন। কিন্তু সেটল্যান্ডের ঘোড়া অঢেল ঘাস যোগানের তৃণভূমি প্রেইরির চারণভূমিতে পরীক্ষামূলকভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা গেল দু-তিন প্রজন্মেই তারা সাধারণ মাপের ঘোড়ার রূপ ও গড়ন পেয়েছে। ঐ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার যোগানের ওপর ভিত্তি করে কোনজীব কোন প্রজাতি টিকে থাকবে একে ডারউইন নাম দিয়েছিলেন প্রাকৃতিক নির্বাচন, ন্যাচারাল সিলেকশন। ন্যাচারাল সিলেকশনই বলি, আর সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্টই বলি, দুটি অভিধার লক্ষ্য প্রজাতি, কোন প্রজাতির অংশবিশেষ নয়। অংশবিশেষ বরলেই জন্ম নেবে অন্যপ্রজাতি বিধিষ্ট প্রজাতির আত্মহত্যার পথ।

মানুষের সভ্যতার বয়স তো বেশি দিনের নয়। সম্ভবত দু-সাত হাজার বছর মাত্র। মানুষের জন্ম নাকি প্রজাতি হিসাবে লক্ষ লক্ষ বছরের আগে পরে। নয়লক্ষ তিরানব্বই বা সুরানব্বই হাজার বছর মানুষ অসভ্য ছিল: কিছু কিছু প্রকৃতির উপকরণকে ব্যবহারে নিয়েছিল। পুরনো পাথরের যুগে, নতুন পাথরের যুগে, মানুষের সভ্যতা-পূর্ব বর্বরতার পর্যায়ে। ওসব পর্যায়ে মানুষের অস্তিত্ব ছিল বাঘ ভালুক, বুনো ঘোড়া-গরু-মোষের মতো প্রকৃতিতে যেমনটি পাই তেমনটি খাই গোছের। বর্বরতার পর্যায়ে চাষ আবাদ, পশুপালনের একটু আধটু মুখ দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃতিকে মানুষের শ্রম আর মনুষ্যের তৈরি হাতিয়ার ব্যবহার করে দোহন করা তেমন হয়ে ওঠেনি। যেমন যেমন হাতিয়ার ব্যবহারের কলাকৌশল উন্নত হয়েছে, উৎপাদন বেড়েছে, উৎপাদিত সামগ্রীর নানান ধরন দেখা গেছে। ভোগ করার পরেও উৎপন্ন সামগ্রীর অনেকটাই বেঁচে গেছে। পরিকল্পনা মাফিক ঐ সঞ্চয় ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে গ্রাম-শহর-রাস্তা-ঘাট। গড়ে উঠেছে রাজা-প্রজা-লোকলস্কর-শিক্ষক-ছাত্র-গুরু নানান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক। ঐ যে সঞ্চয় গড়ে ওঠা সমাজে নানা ধরনের কাজকর্ম, জীবিকা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি পরস্পরের সম্পর্ক নিয়ে গড়ে উঠল ঐ ব্যবস্থারই নাম সভ্যতা। ইউরোপে শহর গড়ে উঠেছিল এভাবে, আর শহরগুলিতেই ছিল সমাজে সামঞ্জস্য গড়ে তোলার নিয়মকানুন। ঐ সিভিটাস বা শহরের নিয়মকানুন মেনে চলা সংস্থার সভ্য বা সদস্যরাই গড়েছে নগরভিত্তিক সভ্যতা, সিভিলাইজেশন। ভারতের মতো দেশে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রথম শহরে নয়, গ্রামে। সিভিলাইজেশনের আমরা অনুবাদ করেছি 'সভ্যতা' শব্দ দিয়ে। যেমন রিলিজিয়নকে ধর্ম দিয়ে। কিন্তু সভ্যতা নির্দিষ্ট সিভিলাইজেশনের নূনতম প্রতিধ্বনি হলেও হতে পারে। কিন্তু রিলিজিয়নের প্রতিশব্দ ধর্ম? কখনও নয়। হয়তো সিভিলাইজেশনের ভারতীয় রূপ ছিল 'সদাচার'. কিন্তু পণ্ডিতেরা বলেন সদাচার কালাচারকে বোঝায়। শেষ পর্যন্ত বাঙালিরা মহারাষ্ট্র থেকে ধার করে এনেছে কালচারের প্রতিশব্দ হিসাবে সংস্কৃতি।

সদাচার-সভ্যতা-সংস্কৃতির কতকটি থাক। আমরা পুরনো প্রসঙ্গে ফিরি। ঐ যে কোন্ প্রজাতি টিকে থাকবে, কোন্ প্রজাতি টিকতে পারবে না — এই বিষয়টি দুর্জ্ঞেয়রা সমাজেও প্রয়োগ করার কথা ভেবেছে। এতে নানা নৃ-গোষ্ঠী বিষয়ে মতবাদ তৈরি হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীতে একদল পশ্চিমী পণ্ডিতেরাই বললেন উত্তর ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে ইউরোপীয় ভাষাগুলির মিল রয়েছে একসময় এসব ভাষার উৎস ছিল একটিই নরগোষ্ঠী। তারা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন পণ্ডিত তো বলেই ফেললেন, বড়দিন একজন ঈশ্বর বা চাঁদী এবং ইংরেজ বড়দুর, দু-জনের পূর্বপুরুষ বর প্রজন্ম পেছিয়ে গেলে হয়তো একজনই ছিলেন। ব্যস, সাহেবদের হাতে খুব সোনা হল। রাজার জাত বলে কথা। রাজার জাতের ভাষা-রক্ত-নৃগোষ্ঠী সব কিছুই ভিন্ন। প্রয়োজনে ইংল্যান্ডে চালু আইন বিকৃত করে মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি দেওয়া চলবে। কিন্তু ভারতীয় ও ইংরেজের একই ভারতীয় আইনমাফিক বিচার হবে? সে ইলবার্ট বিল কতি চালাতে নেই।

এমনিতেই শাসক-শোষক জাতি, শাসিত ও শোষিত জাতি তো ডারউইনের মূলাবানের আগে থেকেই ছিল। ডারউইনতো মানুষে মানুষে ভেদ দেখেননি, ভালো-মন্দ-হলদে-বাদামি সব মানুষ নিয়েই তাঁর কাছে ছিল 'মানব প্রজাতি'। বরং তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায়, মানব প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছিল প্রথমে আফ্রিকাতেই। মানব হিতৈষী ডারউইনের মতটা বিকৃত করে পৃথিবীতে রাজনীতি ও পণ্ডিতি করা বর্ণদ্বেষী ব্যক্তিদের অভাব নেই ইউরোপেই ভাল করে দেখা হয়েছে অ্যাংলো-স্যাকসন, লাতিন, গল, টিউটন, নর্ডিক, স্লাভ — নানা নৃগোষ্ঠীর মানুষকে। হিটলার এই বিভাজন বুকে নিয়েছিলেন। হিটলার তো

আর্য জাতির মানুষ বলে জার্মানদের ঘোষণা করে গল (ফ্রান্স), অ্যাংলো-স্যাকসন (ব্রিটেন), লাতিন (স্পেন-ইতালি-রুমানিয়া), স্লাভ (হিসেবকরে রুশ) নানা নৃগোষ্ঠীকে নানাভাবে মূল্যায়ন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের শোষকদের এখনীয়ে বেহেতু স্যাকসন রক্ত আছে, তাই তারা জার্মানদের আপনজন হতে পারে। কথায় হল ফ্রেঞ্চরা আত। লাতিনদের সঙ্গে জার্মানদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্লাভরা হচ্ছে অতি। ঐ নীচু জাতের মানুষজনের ভবিষ্যত জার্মান টিউটনদের দাস হওয়া। তাদের কতজনকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, কতজনকে খতম করা হবে, সবটাই নির্ভর করছে 'বাঁচার জায়গা' বা লিবেনসরাউমের সম্ভাব্য বিস্তার ও পরিধির উপর। তাই ১৯৪১ সালের ২২ জুন কোন কারণের যুদ্ধ ঘোষণা না করেই তিন লক্ষের বিশেষজ্ঞিনীয় সীমান্ত জুড়ে নাৎসি জার্মানি অপারেশন বারবারোসা নামে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। হিটলার ভালইনস্পেই তার অভিপ্রায় ছিল স্লাভদের খতম করতে। ষাট লক্ষ ইহুদিকে খতম করেছিলেন। ইহুদিদের মানুষ প্রজাতির মধ্যেই গ্রন্থ গণ্য না করে। ইহুদিদের খতম করার নাম ছিল নাৎসিদের কাছে 'স্থায়ী সমাধান', পার্মানেন্ট সলিউশন।

মার্কস ছিলেন মানব সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। তিনি সমাজ বিপ্লবের কথা বলেছিলেন। বিশেষ সঙ্কটের কালে শোষিত শ্রেণী শোষকদের ক্ষমতা বলপ্রয়োগ করে হটিয়ে দেয়। কিন্তু কখনই বলেননি পরাস্ত শ্রেণীর ব্যক্তি-মানুষগুলিকে খতম করো। বলেননি, বিপ্লবের বিজয় নিশ্চিত করতে গেলে প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরোধীদের খুন করো। কিন্তু মার্কসের নাম করেই কত খুনেরই না বীভৎসতা ঘটেছে। রাশ্যুটিয়ার পলপটের শাসন তার জলন্ত সাক্ষী।

আমাদের নীরদ সি চৌধুরী তো খুবই পণ্ডিতের ভক্ত। তাঁর লেখা একটি বই আছে 'দ্য কনটিনেন্ট অব সার্সি'। সার্সি ছিল প্রাচীন গ্রিক উপকথার এক মায়াবিনী। সার্সি তার ইচ্ছামতো অন্য কাউকে ওতর-ভেড়া বা কিছু বানাতে পারতো। নিজেও ইচ্ছামতো রূপ ধারণ করতে পারতো। পশ্চ হাজারে ওদেসিউস-এর সাথীদের নাবিকদের সে বানিয়েছিল ভেড়া। নিজে সেজেছিল ওদেসিউসের বৌ পেনিলোপি। আর ওদেসিউসের মাথাও করেছিল মেরামত। নীরদবাবু চৌধুরী কথাই মনে করেছেন, ভারতে ক-হাজার বছর আগে আগন্তুক 'আর্য'রা এদেশের জল হাওয়ার ভেড়া বনে গেছে। ব্রিটিশদেরও নাকি খুনের বছরেই হয়ে নেশা করে গেছে। ভারতীয় আর্যবংশ অবতংসদের আর যেমন মাপট নেই, তেমনি ইংরেজরাও শেষ পর্যন্ত খাঁচে কুটো নিয়ে ভারত ছেড়েছে। এই ধরনের ভাবনা আসলে বর্ণবৈষম্যবাদের ভিত তৈরি করে। নীরদবাবু আক্রমণকারী কালপী আর্যদের কথা ভেবেছেন। এদেশে তার আগেও তো (মহেঞ্জোদারো-হরপ্পা) চের সভ্য মানুষ ছিল। ছিল আন্ট্রিক-মোঙ্গোল-দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। তাদের ওপর দাপট দেখানোটাই ছিল আর্যত্ব? নীরদবাবুর মনে হয়নি এই ভারতে ভোট-মোঙ্গল-আন্ট্রিক-দ্রাবিড়ও আছে। আছে সাঁওতাল-নেগ্রিটোরও হিটলোকীটা। হয়েছে নিখুঁত দ্রাবিড় জনগোষ্ঠী। এদের মিশ্রণেই নানা রঙের মানুষ গড়ে তুলেছে এক মোজাইক।

দেশে দেশে এই যে নৃগোষ্ঠী অনুভবী উঁচুনীচু ধারনা তৈরি করার জন্য প্রচার ও আন্দোলন কার্যত এসবই কোন বিশেষ জাতি বা জনগোষ্ঠীর শোষক-শোষিতের মধ্যে বিভাজন তুলিয়ে নিতে চায়। হিটলার জার্মানিতে বড় বড় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখেছেন, বলেছেন সব জার্মান ভাই ভাই। ইহুদি, বিপ্লবিরা ছাড়াই মনস্তত্ত্বজ্ঞানী যে কোন মানুষকেই শেষ করে দাও। ভিন্ন জাতির মানুষকে দাস বানাও। তাতে জার্মানদের বিশ্বাস কেবল চাঁই বাড়বে। ইজ্জৎ বাড়বে। ওদিকে একচেটিয়াপুঁজিদের মুনাফা বাড়লি দাস মজুর ব্যবহার করে। তাদের আরাম বাড়লি পরাস্ত দেশগুলিতে। ভিটামিন বাড়িয়ে ও কাঁচামাল আর দাসশ্রমিক সংগ্রহ করে। খুনি এস এস বাহিনীকে লালনের হয়েছিল এই কাজে। জার্মান ভরল কেন রুশক্ষেত্রে মারিল? জার্মান কেটিপতিদের স্বার্থে। কেটিপতিদের অধিক নেতা রোজেনবার্গ, প্রয়োগকর্তা হিটলার-হিমলার-হেড্রেরি-গোয়েবলস। এরাই ইহুদীর কম্পেক্সিট স্টেটের প্রধান মুদ্রেলিনি। এই ব্যক্তিরা একটি সঙ্কীর্ণ শোষকগোষ্ঠীর স্বার্থে জাতির অন্তর্গত সব মানুষকে তাদের নিজ স্বার্থ বিসর্জনের ডাক দেয়।

ইউরোপে তবু ভাল। এক একটি অঞ্চলে এক এক জনগোষ্ঠীর বাস। তারা এক একটি জাতি। এই এক একটি জাতির স্বার্থ খুঁড়িয়ে পরজাতি বিদেশীরা নানা অনুভবী কথার প্রচারে ধনী-নির্ধন-শোষক-শোষিতদের এক কাতারে সামিল করে। এরা ভিন্ন জাত বিদেশী সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী। সমাজসচেতন হয়ে উঠে যখন একচেটিয়া পুঁজিপতিদের পুষ্ট করা। তারা হয়ে পড়ে শাসিক। আবার যারা শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলে, তারা এক জাতির মধ্যে বিপরীত স্বার্থের মানুষ দেখতে পায়। শোষিতদের নিয়ে তারা দল গড়ে। এদের দেখে নানা দেশের নানা জাতির শোষিত মানুষদের মিলিয়ে দিতে চায় তারা। এরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। এরা প্রজাতিভাতক বিকৃত জার্মানিজমীদের প্রতিপক্ষ। এরা শোষক পুঁজির প্রতিপক্ষ হিসাবে শোষিত ও দুর্বল মানুষজনকে সমবায় আন্দোলনেও সমবেত করে। প্রসঙ্গত মনে পড়ল, নানা জাতির শোষক-শাসকেরাও নিজের দেশ নিয়েও জার্মানদের মোহাই দেয়। বলে, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় যারা হেরে গেছে তারা বাতিল মানুষ। তাদের কাজ জাতী শ্রেণীশত্রুকে সেবা করা। নিতান্ত অর্থনীতিতে খাপ্টি খেলেই মজুর মজুর হয়েছে। পুঁজিরা নিজিদের ধনী ধনী। পুঁজিপতি পুঁজিপতি। সুতরাং নিজা করার উপায় কোথায়?

এই ধরনের চিন্তা কিন্তু ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের কথা বলে। যদি বলি 'জগতারা যারি জয়ন্তন গাহি উল্লাস কলরবে / তেমি মরণপ নিরিপর্বত যারা এসেছিল' — তারা নানাভাবে মিলেমিশে দেশেও সমাজে তবু নানাভাবে বৈপরীত্য রয়েই গেছে।উচ্চবর্ণ রয়েছে, নিম্নবর্ণের মানুষ আছে হিন্দু সমাজে। উচ্চবর্ণের মানুষজনই এতদিন নানা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামে বা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে। হিন্দু মুসলমানের নাম করে যে বিভাজন ভারত-পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল, সেখানে ধর্মের নামাবলী জড়ানো নেতাদের মধ্যে ছিল শোষক-শোষিতের এক কাতারে সমানের অভিসন্ধি। ছিল ভিন্ন অভিলাষী মানুষের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেবার বিষেষ। বিকৃত জার্মানিজম। মুসলিম লিগের কাছে ছিল হিন্দু আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ভিন্ন রাষ্ট্র গড়ার দাবা। আসলে তা ছিল জার্মানিজমের বিকৃতি। বর্তমান ভারতে এই যে মুসলমান-খ্রিস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নানা আক্রমণ সংঘটিত হচ্ছে, তারতীয় সংস্কৃতির পরিচয়ের নামে, এও এক বিকৃত জার্মানিজম। ব্যক্তিমাত্রই এর অন্তর্গত। এই বিকৃতি জাতিকে দুর্বল করে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে পশু করে মানুষকে-মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষেই একদল বিদুষজনী তবু বর্তমান ব্যক্তিগত ধর্মই দেখছেন, দেখছেন না

রাজনীতি করা জোতদারদের উচ্চবর্গের নেতাদের প্রতিপক্ষ হয়ে আসছে তফসিলি ও অন্ত্যজ শিল্পে বর্ণের ছোটজোতী নেতারাও। কার্যত ঘটতে চলেছে ভারতভূমিতে উচ্চনীচ সামাজিক অবস্থানের মানুষদের মধ্যে সম্ভাব্য আন্তর্বিগ্রহিক লড়াই। ডারউইনবাদের বা বিকৃতি। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কব্জা করার জন্য লড়াই। যেন এক 'প্রাকৃতিক নির্বাচনে'র অঙ্ক খেলা।

উচ্চবর্গের হাতে এখন ছিল বিজ্ঞান-প্রশাসন-সমরাস্ত্র সবকিছু থাকা সত্ত্বেও ছুঁচটি কালে যেতে কতক্ষণ। কমিনিস্ট উচ্চারণের নেতাদের যেমন চিন্তার ভিত্তি, নীচুজাতেরও তিত্তি হতে তা বাধা নেই। আর এই অবস্থায় কিন্তু উচ্চনীচ দুই সম্প্রদায়ের পরিশ্রম ও মেধাবিত্তের এক কাতারে মিলতে হবে। তাছাড়া গতি নেই। উচ্চজাতের হাতে যে সম্পদ রয়েছে, তার পারম্পরিক যোগ কাটিয়েছে, তাদের সমর্থ দেখাতে। শেষ পর্যন্ত এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল কালের ঝড়ে নিহিত হবে এখনো তা স্পষ্ট নয়। মনে রাখা দরকার, ভারতে কেবল বাঙালি-ওড়িয়া-আসামিয়া-পাঞ্জাবি-তেলুগুরাই প্রকৃতি জাতিই নেই, রয়েছে উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণের ভারতব্যাপী অনুক্রমিক সমাজ (নদিই পেশাগত পরিচয়ের নয়গোত্রী), আর রয়েছে আর্য ভাষাভাষী উত্তর ভারত, দ্রবিড়ভাষী দক্ষিণ ভারত। রয়েছে উত্তর-পূর্বে নানা জাতি অধ্যুষিত নানা রাজ্য ও অঞ্চল। তাদের ভাষা না ইন্দোইউরোপীয় না দ্রাবিড়। এবং নানা ধর্ম ও ভাষা অনুসৃত ছোটবড় জনগোষ্ঠী এদেশে কোন ভাষা বা গোষ্ঠীর প্রাধান্যের কথা আজকেই মনে পড়বে, বিকল্পনা ডারউইনবাদ। হিন্দুত্ব বা হিন্দিভাষা প্রচারের ব্যাপারেও এই সত্য ভুলে যাবার নয়। যে রাজ্যের নেতৃত্বরাও পা ফেলতে ভয় পায়, আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে এমনিই ঘাড়ে গর্দানে মত স্বভাব পেয়েছি যে নির্বিকারভাবে আমাদের বহু ভূষিত ভবঘুরে টানাহাঁচড়া জনপদগুলোকে ডুবে পড়েছি আর ওঁতোমি ও দাবি তুলিনি।

□

শারদীয় অভিনন্দনসহ —

জেরুড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং ১১২ তাং ২৬-৭-৬৩

গ্রাম - বালিডাঙা পোঃ খানপুর জেলা ঃ হুগলি

ফোরুন শীতলা — সভাপতি

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ — সম্পাদক

নিবারিতেন্দ্র ঘোষ — সম্পাদক

আপনাদের সেবায় —

হরিনারায়ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং ৮ মিড-১ তারিখ ২৫-৭-৬৪

পোঃ - বালিঘাটা, থানা ঃ ডেবরা, জেলা ঃ মেদিনীপুর

আপনার পরিবারের ভবিষ্যতের জন্য সকল প্রকার (ব্যক্তি বিজ্ঞান) সকলে মোপনীয়তা, অধিক সুদ, নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি।

কৃষকদের প্রয়োজনে কৃষিঋণ দাদন করা হয়।
এবং বাড়ি তৈরির কাজে কমপোট সীট ও সিমেন্ট বিক্রি হয়।

বছরের কখনো আপনার অসময়ের বন্ধু কাঁসা, পিতল, কৃষকদের উৎপন্ন ধান-চাল-অন্যান্য চাকুরিজীবীদের চাকুরি বন্ধক ও ছোট ছোট মোকদ্দমায়ের দোকান বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়।

বৈচিত্র্যে ভরা বস্ত্র বিজ্ঞান, মনের মতো শাড়ি, ধুতি ইত্যাদি পাওয়ার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রসাধনী ও স্টেশনারি, বেবিফুড, বাড়াই তৃণিমাল ও মেডিসিনারি পাইপ পাওয়া যায় এবং ফ্রেশ দোকান রয়িয়াছে।

কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় ডিজেল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ, মহুয়া খৈল ও চুন বিক্রয় হয়।

কৃষকদের সেবার বীজ আলু, বীজ ধানায়, বীজ ধান সরবরাহ করিয়া থাকি

শাখা অফিস ঃ পটিয়া বাজার ও অলা কাঁথ, ডেবরা মার্কেটিং এ ইকবো ওয়ার হাউস

অফিস সময় ঃ সোম, মঙ্গল ও শনিবার সকাল ৮-১২টা, বুধ ২-৫টা, রবি ও বুধবার ১০-৫টা, বৃহস্পতিবার ৮-১২টা (অর্ধদিবস) ও তারপর বন্ধ

সভাপতি - কালাইলাল মাইতি সম্পাদক - ভবতারণ জানা সহসম্পাদক - কৃষ্ণচন্দ্র মণ্ডল হিসাবরক্ষক - রাজকৃষ্ণ ভুঁইয়া

Enjoy

Holiday

at

our

☆ **Digha** ☆

☆ **Rajgir** ☆

☆ **Darjeeling** ☆

HOLIDAY HOME

Please Contact with

C. S. I. C. EMP. COOP. CREDIT SOCIETY LTD.

45, GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA - 700 013
PHONE : 27-1217

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন...
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ - ৩০২১

ময়নাপুর অঞ্চল সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

প্রধান কার্যালয় ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ ময়নাপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া
শাখা কার্যালয় ঃ গ্রাম ও ডাকঘর ঃ আসুরালী, জেলা ঃ বাঁকুড়া
রেজিঃ নং ঃ ১৬ বি কে, তারিখ ঃ ১৬.২.৭৩
(জনাতম অংশীদার পশ্চিমবঙ্গ সরকার)

- ✧ বাঁকুড়া জেলার বৃহত্তম সমবায় সমিতি।
- ✧ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক দ্বারা শ্রেষ্ঠ হিসাবে নির্বাচিত।
- ✧ ২.৫ কোটি টাকার আমানত সংগ্রহ।
- ✧ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ দাদনের সুব্যবস্থা।
- ✧ নিজস্ব দ্বিতল গৃহে সকাল-বিকাল ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা।
- ✧ কৃষি যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সার কৃষকের প্রয়োজনে সরবরাহ।
- ✓ ফসল বন্ধকি ঋণ, স্বর্ণবন্ধকি ঋণের ব্যবস্থা।
- ✧ সমাজসেবামূলক কাজে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা সদস্যদের বিনাপয়সার চিকিৎসা এবং দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রদের পঠনপাঠনে সবরকমের সাহায্য।
- ✧ প্রতিবছর পঞ্চায়েতের সাথে যৌথ উদ্যোগে কৃষিমেলার আয়োজন।

গুরুপ্রসাদ চৌধুরী	সামিদ জমাদার
সভাপতি	সম্পাদক

ড়া জ গ
ক্রী ৎ

টোটাল ফুটবল এবং এবারের বিশ্বকাপ

অর্ণব ঘোষ

আসছে বছর আবার হবে। মূর্তি প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে পরাজয় মাথায় নিয়ে সবাই এই ভেবে স্বস্তি দেয় — আসছে বছর আবার হবে। পরবর্তীর শেষ বিশ্বকাপের ওপর যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজিলের ভাবী হাটের মধ্য দিয়ে শুরু হল একবিংশ শতাব্দীর প্রথম বিশ্বকাপের প্রস্তুতি, অনুষ্ঠিত হবে যেখানে পূর্বতন জার্মান-শাসিত কোরিয়ার। অবশ্য আসছে বছর নয়, চার বছর পর ২০০২ সালে। তবে সুরটা মূলত এক — একটা সমাপ্তির বাজনার ভেতর থেকে আর একটি আগুয়ানীর সানাই-এর শব্দ ভেসে আসে।

ফলতলোর বিগত চার বছর ধরে তিল তিল করে চারা গাছ থেকে মহীরুহ তৈরি করার পিছনে যে নিবিড় আত্মনিয়োগ, অনুশীলন এবারের শেষ হল। পড়ার পড়ার ব্রেমারতো, ওর্তেগা, রিভাল্ডো, আওরেন, বাতিস্তুতা, বার্দকাম্প, জিদান, সুকেরদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের সমাপ্তি ঘটল। আবার নতুন উদ্যমে শুরু করতে হবে নতুন প্রজন্মের, আগামী পরবর্তীর প্রথম বিশ্বকাপের জন্য। এর মধ্যে কত ওঠানামা চলে যাবে বিশ্বকাপের আঙিনা থেকে জার্মানির ক্রিস্টেল কোপকে, স্নেহময় ম্যাথিউস, মুরসেন ক্লিনসম্যান, কলম্বিয়ার ভালদেরামা, অস্ট্রিয়ার, রুমানিয়ার হিওর্ঘে হাগি, ব্রাজিলের মুঞ্জা, ভেবেতো, ইতালির বার্গোমি, রবার্তো বাজ্জিও, ক্যামেরুনের খাঁদেয়ে মিঁদি, চেকোস্লোভাকের মাইকেল লাইঙ্কার, পিটার ভিশ্চেল, স্পেনের জুবিজারেতা — আরও কত কে! এবারের বিশ্বকাপ ট্রফি ঘিরেও হয়তো ভাল আছা হাল কে! কেউ না। আসলে কেউ হারে না, জেতেও না কেউ, প্রকৃত জিৎ ফুটবলের।

শারীরিকভাবে পর পর দুটো বিশ্বকাপে জোর দিতে পারেনি ডিগো। এবারে দ্বিতীয় রাউন্ডেই উধাও — শুধু তাই নয়, দুই সুপার ফুটবলার উপহার দিয়েছে — মারাদোনা সালাম ও জামোরানো। ভাল পর দুই বিশ্বকাপে ফাইনাল রাউন্ডে আসতেই পারেনি। আর এবারে একেবারে চ্যাম্পিয়ন। তবে এবারের ফাইনাল সবাইকে হতাশ করেছে। 'ব্রাজিল' 'ব্রাজিল' করে প্রচারণার পারদটা অনেক উপরে উঠে গিয়েছিল, সেখান থেকে একেবারে ধরাশায়ী। এটা ঠিক, ব্রাজিল দলের অন্তর্নিহিত শক্তিটার সর্বনাশ করে দিল। দুটো ম্যাচ সত্যিই খুব বাজে দিয়েছে আবেগের — কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির মুখে যাওয়া রোনেরিয়ার কয়েদ ডিন গোলে, আর ফাইনালে ব্রাজিলের কাপুরুষের মত আত্মসমর্পণ।

বিশ্ব ফুটবলে চমক দিয়েছে ভাল চ্যাম্পিয়ন হল কোন স্ট্রাইকার ছাড়া। ভালকে প্রকৃত লড়াই করতে হয় দ্বিতীয় রাউন্ডে পারাগুয়ের বিরুদ্ধে। একদম চোদ্দ মিনিট খেলার পর জার আসে স্টেলার লম্বা থ্রোর সোনালি গোলে, ইতালির বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে জিতে। সেমিফাইনালে দুটি গোলই করেন উইংব্যাক ফ্রাম। ফাইনালের তিনটির মধ্যে প্রথম দুটি আসে মিডফিল্ডার জিদানের থেকে থেকে, আর শেষটা করেন আর এক মাঝমাঠের খেলোয়াড় - পেতি। স্ট্রাইকারের দুর্বলতাটা পুষিয়ে দিয়েছে অন্যরা। রোনাল্ডো, সুকেরদের মত স্ট্রাইকার পেলে ওরা ম্যাচের করা বাঁধিয়ে দিতে পারত।

হল্যান্ডের পূর্বতন জাতীয় ফুটবল কোচ রেমন রিজেগল 'টোটাল ফুটবল' চালু করেন সত্তরের দশকে। এবারের বিশ্বকাপে দুটি দলের মধ্যে টোটাল ফুটবলের প্রেমের দেখা মেলে। হল্যান্ড ৪-০ টাইব্রেকারে ব্রাজিলের কাছে হেরে সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল। আর ভাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাওয়া শেষ করল।

এখানে উল্লেখ করা ভাল, লাতিন আমেরিকা ও ইউরোপ — দুই মহাদেশের দলগুলো দুটো ভিন্ন ধরনের ফুটবল খেলে। লাতিন আমেরিকান ফুটবল সরু দিয়ে জন্মায়, কারণ এদের খেলার মাঠগুলো ছোট — ছোট ব্যক্তিগত ক্রীড়াশৈলী ভিত্তি। আর ওরা একটু গোলের দেখা খেলে। গোল হয় বেশি। আর লেকে তো গোল লেগেই আসে। আর্জেন্টিনা গ্রুপ এইট লিগ ম্যাচে জামাইকাকে ৫-০ গোলে পর্যুদস্ত করে, বাতিস্তুতা রেকর্ড কম সময়ে হ্যাটট্রিক করেন। কিন্তু ইউরোপীয় দেশগুলি টিম গেম বা দলগত খেলার ওপর জোর দেয় বেশি। রক্ষণকে মজবুত রেখে প্রতিআক্রমণে বিপক্ষ রক্ষণকে বিপর্যস্ত করতে চায়। লাতিন আমেরিকার আমরা যেমন পেয়েছি পেলে, গারিঞ্চা, জিকো, মারাদোনা, ক্যানিজিয়া, রোমারিও — তারপর রোনাল্ডো, ওর্তেগা, বাতিস্তুতা ইত্যাদি তেমনি ইউরোপে আমরা দেখেছি জর্জ বেস্ট, ইউসেবিও, তারও আগে পুসকাস, তারপর মোহান ক্রুয়েফ, বেকেন বাওয়ার, মিশেল প্লাতিনি, গ্যারি লিনেকার, গাওলো রোসি, রবার্তো বাজ্জিও, ফ্রিলম্যান ও বর্তমান প্রজন্মের মাইকেল আওরেন, বার্দকাম্প, সুকের, জিদান প্রমুখ। টোটাল ফুটবলের কনসেপ্টটা ইউরোপীয় ধরনের সঙ্গে মোলায়েম বেশি খাপ খায়।

টোটাল ফুটবলের জনক রেমন রিজেগল বর্তমানে উরুগুয়ের টেকনিক্যাল কমিটির প্রধান। এবারে বিশ্বকাপ চলাকালীন হঠাৎ উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু অসুস্থ হবার আগে উনি কয়েকটি কথা বলেছেন যেগুলি আমোঘ সত্যিরূপে পরিলক্ষিত হয়েছে। উনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যে দলের টেকনিক্যাল এবিলিটি আছে অর্থাৎ টেকনিক ছাড়াও ট্যাকটিস-এর দিক থেকে যে দল টেক্কা দিতে পারবে সেগুলি '৯৮-বিশ্বকাপ জিতবে। আরও থেকে বলা যায়, বিশ্বকাপের এই পর্যায়ে মোটামুটি সব দলের খেলোয়াড়দের টেকনিক অর্থাৎ পাসিং, ওটিং, হিডিং ইত্যাদি মূল জিনিসগুলির সম্যক জ্ঞান আছে। অর্থাৎ এলোপাথাড়ি ওটিং, ভুল পাস, হিডিং করতে গেলে বল পা থেকে বেরিয়ে যাওয়া — এইসব ভুলগুলো হয় না, সেজন্য টেকনিক-এর ওপর এত জোর। অর্থাৎ বিজয়ের খেলবে তিনজন ডিফেন্ডার,

পাঁচ বিভিন্নতার আর দুই আটাকার, যা একজনকে আক্রমণে রেখে (যেমন লাওতারো টোরে-মার্তেজ-হোর) পাঁচজন মাঝমাঠে ও চারজন রক্ষণে। রক্ষণের একজনকে স্টপার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, আর মাঝমাঠের দুজন একটু ওপরে থাকবে আটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে। এইভাবে কোচ আর খেলোয়াড়ের শক্তি অনুযায়ী ছাঁচ সাজাবেন।

মিশেলস খেলাটিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন — ডিফেন্স অর্থাৎ রক্ষণ ভাগ, মিড-ফাল্ড অর্থাৎ খেলা তৈরির জায়গা, যাকে আমরা খুশি মাঝমাঠ আর আটাক বা আক্রমণ। সারা মাঠকে তিন ভাগে ভাগ করে ইংরেজি পরিভাষায় বলা হয় ডিফেন্সিভ জোন, মিডফিল্ড জোন আর আটাকিং জোন। উনি জোর দিয়ে বলেছেন, যে দলের এই তিন বিভাগের মধ্যে ভাল যোগাযোগ আছে সেই দলই জিতবে। অর্থাৎ আক্রমণে ওঠার মুখে স্টপার সমেত দলগুলোরই সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার বল বিপক্ষের পায়ে চলে গেলে প্রতিআক্রমণে রক্ষণ কাজে তাদের কার কি ভূমিকা হবে। অর্থাৎ বল বিপক্ষের দখলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বল কেড়ে নেওয়ার লড়াই শুরু হওয়া উচিত। আর এটাই হওয়া উচিত ফুটবলের সহজাত চেতনা। এই জানাটা তো হাঁচাৎ একদিনে হবে না। প্রতিটি খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অনুযায়ী তাদের আলাদা আলাদা দায়িত্ব দেওয়া থাকবে। কঠিনের অনুশীলনের মাধ্যমে সেগুলোর রপ্ত করা দরকার। খেলার প্রকরণগত দিক থেকে যারা শক্তিশালী তারাই সফল হবে। মিশেলস-এর কথাই ঠিক, প্রকরণগত দিক থেকে রক্ষণ অন্য দলগুলোর থেকে অনেক উন্নত এবং শক্তিশালী, সেজন্য ওরাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের চেয়ে দলগত খেলার দিকেই ওদের নজর ছিল বেশি। উনি স্পষ্ট বলেছেন, নাইজেরিয়া-কলম্বিয়ার মত দলগুলি কখনই এই পর্যায়ের খেলার সফলতা আনতে পারবে না, যদি না তারা এই দলগত খেলাটা অর্জন করতে পারে। ব্যক্তিগত ভিন্ন থাকলেও এই পর্যায়ে সব সময় জয় আনতে পারবে না। সমস্ত দলটির একসাথে ওঠানামা করতে হবে।

উনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন, 'টিম ট্যাকটিক্যাল এফিসিয়েন্সি' কথাটা শুধু কাগজ কলমে নয়। এটা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই নয়, ফুটবল খেলার সঙ্গে ওটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং খেলার সঙ্গে সঙ্গেই এর উন্মেষ হয়। একজন ফুটবলারের ভিন আছে, সেটা নিয়ে সে সন্তুষ্ট হয়ে বসে থাকলে ভুল করবে। কারণ ভিন ক্রীড়াশৈলী খেলোয়াড়ের কেবল একটা গুণ। বলগত গুণ, টাকলিং বা কভারিং সামর্থ্য না থাকলে তার সেই শৈলীর পূরণ হারাতে হবে। মিশেলস-এর মতে, অনেক ভাল ভাল খেলোয়াড় ঘুরে গেল কারণ তাদের অন্য গুণগুলো ছিল না। প্রকৃষ্ট উদাহরণ রুমানিয়ার জর্জে হাজি। কোন একটা গুণ নিয়ে মডার্ন ফুটবলে বিচু করা যায় না। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে যেমন অলরাউন্ডার, ফুটবলে তেমনি 'ইউটিলিটি প্লেয়ার'। শুধু গোলকের বা ভাল স্ট্রাইকার হলেই চলবে না, প্রয়োজনে ডিফেন্স করার ক্ষমতা অর্থাৎ রক্ষণের কলাকৌশল জানতে হবে। যেমন টাকল্ বা কভার করার ক্ষমতা থাকা চাই। তেমনি ডিফেন্ডারকেও উঠে প্রয়োজনে গোল করতে হবে। ব্রাজিলের ব্রাঁ. বুচায় প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইদানীং -আর্জেন্টিনার হাতে দেখা গেছে বার্সেলোনা খুদিনন্দন বিতীয় গোল করা ছাড়াও টাকল্ করতেও সক্ষম। ব্রাজিলের উইং ব্যাক পুরাম মুটো গোল করে ব্রাজিলকে কাইনালে তুলে দেখিয়ে মিডেল রক্ষণকে মজবুত রাখা ছাড়াও গোল করতে কত পটু ও। বোঝা গেল, মিশেলস-এর 'টোটাল ফুটবল' কতটা উন্নত এখনও।

সমস্যের মনকে মিশেলস্-এর খেলার প্রকরণ অনুসরণ করে খেলোয়াড়রা সবসময় স্থান ও অবস্থান পরিবর্তন করে খেলতে তার কারণ প্রতিপক্ষকে ধোকা বানাতে এবং এই কারণে খেলাটারই নাম হয়ে গেল 'টোটাল ফুটবল'। অর্থাৎ খেলোয়াড়রা শুধু জন বা যাঁ হাতে বলটা করত না তারা তাদের অবস্থানও পরিবর্তন করত। যেমন, রক্ষণের খেলোয়াড় যে টাকল্ করতে পারে, সে আক্রমণে উঠে করে দু-তিনজনকে কাটিয়েও নিয়ে যেতে পারে এবং শটও গোলের তিনকাঠির মধ্যেও রাখতে পারে। অর্থাৎ যে যেখানে খেলছে সে সেখানকার খেলোয়াড়, আলাদা করে রক্ষণ মাঝমাঠ বা আক্রমণের জন্য খেলোয়াড় থাকল না। মিশেলস-এর 'টোটাল ফুটবল' পরিকল্পনা সার্থক হয়েছিল বলেই উনি জোহান ক্রুয়েফ, রোনাল্ড রিসকেম্প, রুদ গুলের প্রমুখ প্রতিভাবানী ও গুণী ফুটবলার পেয়েছিলেন। একটু অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় এই তারকা উজ্জ্বলদের প্রতিভার ফুটবলার পেয়েছিলেন বলেই মিশেলস্ তাঁর এই 'টোটাল ফুটবলের' কনসেপ্ট মাথায় আনতে পেরেছিলেন। মার্কিন্যাপ, জর্জিওস্, রিজাল, সেন্টা, ইয়াপুরেল পেত্তি, প্যাট্রা ব্রাঁ. সুকের ইত্যাদি এই ধরনের প্রতিভাবান খেলোয়াড়। সমাজের প্রচণ্ড গতিতে আক্রমণে উঠেছেন আবার প্রতিআক্রমণ ঠেকাতে রক্ষণে নেমে আসছেন।

মিশেলস্-এর মতে পায়াতরো ও মরতো যদিও বিতীয় হাফটে উঠতে পারেনি, ওরাই কিন্তু আসল খেলাটা খেলেছিল। বিপক্ষের দলগুলির মতে প্রকরণগত ও সামর্থ্যগত অনেক পার্থক্য আছে। যেমন ইউগোস্লাভিয়া ও কলম্বিয়া দল দুটি টেকনিকের দিক থেকে খুবই সাধারণ মানের। ওদের মূলত আটাকার ও একজন আটাকিং মিডফিল্ডার ছিল যারা কখনই রক্ষণের জন্য নীচে নামত না। বিপক্ষের পায়ে বল জমা পড়ে গেলে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করত না। "কিন্তু ওসব দিন চলে গেছে" মিশেলস্ বলেছেন। "আমরা যে যুগে বাস করছি এখন ফুটবল খেলতে হলে ওই মান্ধাতার চলবে না। কোচদের একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে এর মোকাবিলা করার জন্য, কারণ সেই টিমই প্রকৃত আক্রমণে যেতে সক্ষম যে দলের রক্ষণ মজবুত বা যে দল বল দখলের লড়াই-এ বেশ পটু।"

'গেলেন গেলে' রক্ষণের কাছে পরাজিত হয়ে পায়াতরো বিতীয় হাফটে থেকে বিদায় নিল, কিন্তু ওদের খেলা খুব উঁচু পর্যায়ে উঠেছিল কারণ ওদের রক্ষণের বাঁদুনি ত্রুটি ছিল। প্রত্যেকটি খেলোয়াড় তার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিল এবং সেটা পরিপূরণে সচেষ্ট ছিল। মিশেলস্ যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন অধিনায়ক-গোলকিপার ঈসেলার্ট সমেত সমস্ত রক্ষণ ভাগের।

ওঁর মতে মাঝমাঠ যেখানে খেলা বেশি তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে আসল জায়গা যার সম্পর্কে প্রতিটি কোচের গাইডলাইন ঠিক করা উচিত। প্রতিটি কোচের ওঁর পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার, তিনি কিভাবে খেলা তৈরি করতে চান, প্রতিআক্রমণ — কাউন্টার আটাক না পুরো আক্রমণ বা ওপেন আটাক — কি ওঁর লক্ষ্য। সেইভাবে তার দলকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং ওঁকে দেখতে

হবে প্রতিটি খেলোয়াড় তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন এবং পালনে সচেষ্ট।

মজার সম্পর্কে পূর্বতন কোচ কেউ মুখ খুলে কথা বলেছেন, তার একটুর জন্য তিনি বাইরে থেকে যেতে পারলেন না। অথচ তাদের মাঝমাঠের খেলার প্রচুর বৈচিত্র্য ছিল। এদের কেউ প্রয়োজন মাফিক ছিলেন মজার্ন ফুটবলের চাহিদা সম্বন্ধে সজাগ। হয়তো সব জায়গায় প্রয়োজনমত খেলোয়াড় পাননি, তাই প্রথম রাউণ্ড থেকেই বিদায় নিতে হল। সত্যি কথা, মজারের বিদায় বড় দুঃখের। ফ্রান্স শেষ ম্যাচে অস্ট্রিয়াকে ৩-০ ব্যবধানের পর মজারের ফুটবলাররা খেলাই নিয়েছিল তারা পরের রাউণ্ডে যাবেন। কিন্তু বিধি বাম। ওই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠতে গেলে নরওয়েকে শেষ ম্যাচে হারাতে হত ফ্রান্সকে। আর নরওয়ে তাই করল শেষ মুহূর্তের পেনাল্টিতে গোল দিয়ে।

ডিফেন্সিভ থার্ড অর্থাৎ নীচে গোলমুখ থেকে এক-তৃতীয়াংশে জায়গা টেনে রক্ষণভাগ, অ্যাটাকিং থার্ড বা উপরে আক্রমণের এক-তৃতীয়াংশে আর মাঝটা হচ্ছে মাঝমাঠ যেটাকে বলা হয় মিড-ফাল্ড জোন বা অর্গানাইজেশন জোন। উনি বলেছেন, হল্যাণ্ড এই বিশেষ জায়গাটার কর্তৃত্ব করতে সক্ষম। কারণ ওদের সবার পায়ে নড়চড়া করে, ওরা অনেকগুলি পাস খেলে এবং প্রতিআক্রমণে জোর যায়। উনি জাপানের বিতর্কিতভাবে রিফেরি নাকাতার প্রশংসা করেন একজন নিপুণ রেফারেকার হিসেবে। কিন্তু ও সতীর্থ অরওয়ার্দের কাছ থেকে সাহায্য পায়নি।

জার্মানিও মাঝমাঠের সমস্যায় ভুগছে। ওদের কোন সৃজনশীল হাফব্যাক নেই। ওদের রক্ষণে ও আক্রমণে ভালই ভাল খেলোয়াড় আছে, কিন্তু মাঝমাঠে খেলা তৈরী করার লোকের অভাব। সম্ভবত এটাও একটা কারণ ওদের শোচনীয় পরাজয়ের।

তিনি বারবার রেফারণের দৃষ্টান্ত তুলে আনেন, তাদের নির্বাচনের মত কি কোন দল কার্ড দেখে? ওরা কি বলের জন্য খেলে? বর্তমান ফুটবলে ফিরতে গেলে জোরার দক্ষতার শীর্ষে তোমায় পৌঁছতে হবে। তুমি এরকম কাজ করতেই পার না। ফলতঃ খেলার তোমার ফুরালে সম্বন্ধেই তুমি সচেতন নও।

উনি আশীকার করেন, মজার্ন ফুটবলে একজন ফুটবলারকে দক্ষতার উৎকর্ষে আসতে হলে রোবটের মত হতে হবে। অনুযোগ উঠেছে এত চাপ খেলোয়াড়ের পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওঁর অভিমত, প্রতিটি খেলোয়াড়কে প্রশিক্ষণের কঠিন নিগড়ে বাঁধলেও তাদের ছিল ও সৃজনশীলতার ওপরও জোর দেওয়া উচিত। একজন ফুটবলারের মধ্যে যদি ছিল ও উদ্ভাবনী শক্তি বা সৃজনশীলতা থাকে এবং ট্যাকটিসে সে যদি উন্নত হয় তখন সে তার উন্নত টেকনিক বা ক্রীড়াশৈলী আরও ভালভাবে দেখাতে পারবে। ট্যাকটিকাল পরীক্ষার মানের নেই, হক-কৌশল মিলিয়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানা মানানসই হয়ে উঠতে পারে না, তাদের সাফল্য পাওয়া খুবই কঠিন। গুপের অ্যাটাক বা শুধু আক্রমণে গেলেই হল না — তাতে আক্রমণের ধারকোকরগুলোর জন্ম দেওয়া যায় না। কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রাজিল-ডেনমার্ক ম্যাচে মাঝমাঠের রাশ ডেনমা তখনই হাতছাড়া করেনি। কিন্তু ওইখানে অধিনায়ক রেখেও শুধু ট্যাকটিকাল বৈচিত্র্যের অভাবে তারা ২-৩ গোলে হেরে গেল।

ব্রাজিলকে তার যাবতীয় খেলা নিয়েছিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে চিলির বিরুদ্ধে ৪-১ গোলে জেতার সময়। ব্রাজিল দলে তারকা সমাবেশ ছিল কিন্তু কোন সমন্বয়োক্তা ছিল না খেলোয়াড়দের মধ্যে। দুই স্টপার আলবের্তো ও দুনিগার মাঝমাঠের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, আক্রমণে নিয়মতোকে শুধু খেলা তৈরির চেষ্টার দেখা পেয়ে। সেদিক থেকে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড অনেক বেশী 'টোটাল ফুটবল' খেলার চেষ্টা করেছে। হল্যাণ্ড স্ট্রাইকার ফ্লুইফার্ট যদি অত সুযোগ অপচয় না করত তাহলে সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে বিদায় নিতে হত।

দেখা হলেই একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে — *এবারের বিশ্বকাপ কিরকম দেখলেন?* ফাইনালে ব্রাজিলের অভ্যুদয় থেকেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা। আবারও আপনাদের কাছে বলি, সত্যি কি কিছু নেই? শরীরের লোলার বিস্ফোরণ দুই ডিফেন্ডারকে বোকা বানিয়ে মাইকেল আওরেলিয়ানোর সেই দৃষ্টিনন্দন গোল আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে, কার্লিয়াস্পার সেই অসাধারণ ক্রসফুটবল গোল কোয়ার্টার ফাইনালে, ডান পায়ের ইনসাইড দিয়ে রিসিভ করে ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে বলটা নিয়ে ডান পায়ের আউট সাইড দিয়ে গোল, ডাভর সুকোরের ওই ব্যালান্সের বাঁ পা, নাইজেরিয়ার ইকপেবা, প্রথম ম্যাচেই ইতালির বিরুদ্ধে চিলির জোড়া গোল সা-জার দাপট, বাস্তিস্তুতার রেকর্ড সময়ে হ্যাটট্রিক, গর্ডেশার পায়ের কাজ, জিদান রোনাল্ডোর কিছু টাচ-থ্রো, কনট্রোল — অনেক কিছুই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মণিমুক্তোর মত এবং সর্বোপরি ব্রাজিল-হল্যাণ্ডের 'টোটাল ফুটবল'। আপনাদের উত্তরের আশায় রইলাম।

পরিসংস্থান

বিশ্বকাপের পূর্ববর্তী খেলার ফল

সাল	আসর	দল	সাল	আসর	দল
১৯৩০	- উরুগুয়ে	— উরুগুয়ে (৪) : আর্জেন্টিনা (২)	১৯৭০	- মেক্সিকো	— ব্রাজিল (৪) : ইতালি (১)
১৯৩৪	- ইতালি	— ইতালি (২) : চেকোস্লোভাকিয়া (১)	১৯৭৪	- পঃ জার্মানি	— পঃ জার্মানি (২) : হল্যাণ্ড (১)
১৯৩৮	- ফ্রান্স	— ইতালি (৪) : হাঙ্গেরি (২)	১৯৭৮	- আর্জেন্টিনা	— আর্জেন্টিনা (৩) : হল্যাণ্ড (১)
(দ্বিতীয়বারের জন্য যেন খেলা হয়নি)			১৯৮২	- স্পেন	— ইতালি (৩) : পঃ জার্মানি (১)
১৯৫০	- ব্রাজিল	— উরুগুয়ে (২) : ব্রাজিল (১)	১৯৮৬	- মেক্সিকো	— আর্জেন্টিনা (৩) : পঃ জার্মানি (২)
১৯৫৪	- সুইজারল্যাণ্ড	— পঃ জার্মানি (৩) : হাঙ্গেরি (২)	১৯৯০	- ইতালি	— জার্মানি (১) : আর্জেন্টিনা (০)
১৯৫৮	- সুইডেন	— ব্রাজিল (৫) : সুইডেন (২)	১৯৯৪	- আমেরিকা	— ব্রাজিল (০) : ইতালি (০)
১৯৬২	- চিলি	— ব্রাজিল (৩) : চেকোস্লোভাকিয়া (১)			টাইব্রেকার (৩) (২)
১৯৬৬	- ইংল্যাণ্ড	— ইংল্যাণ্ড (৪) : পঃ জার্মানি (২)	১৯৯৮	—	ফ্রান্স (৩) : ব্রাজিল (০)

সর্বোচ্চ গোলদাতা

১৯৩০ — সিলভেস্ত্রো স্টাবিলে (আর্জেন্টিনা) — ৮ গোল
১৯৩৪ — নেজেদলি (চেক) — ৫ গোল
১৯৩৮ — লিওনিদাস (ব্রাজিল) — ৮ গোল
১৯৫০ — আদেমির (ব্রাজিল) — ৯ গোল
১৯৫৪ — সান্দোর কোসিস (হাঙ্গেরি) — ১১ গোল
১৯৫৮ — জঁ ফঁতে (ফ্রান্স) — ১৩ গোল
১৯৬২ — ভ্লাদান জাকোভিচ (যুগোস্লাভিয়া) — ৫ গোল
১৯৬৬ — ইউসেবিও (পর্তুগাল) — ৯ গোল
১৯৭০ — গার্ড মুলার (পঃ জার্মানি) — ১০ গোল
১৯৭৪ — জোহন নাটা (পোল্যান্ড) — ৭ গোল
১৯৭৮ — মারিওবেন্সেস (আর্জেন্টিনা) — ৬ গোল
১৯৮২ — পাওলো রোসি (ইতালি) — ৬ গোল
১৯৮৬ — গ্যারি লিনেকার (ইংল্যান্ড) — ৬ গোল
১৯৯০ — সালভাতোর সিলাচি (ইতালি) — ৬ গোল
১৯৯৪ — ওলেগ সালেঙ্কো (রাশিয়া) — ৬ গোল ও
হিস্টোমোভিচ্‌কভ (বুলগেরিয়া) — ৬ গোল
১৯৯৮ — ডাভর সুকের (ক্রোয়েশিয়া) — ৬ গোল

শারদীয়ার অভিনন্দন সহ

কবিলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৬৫ এইচ ঘি তাং১৫-৫-৬১

চিনাগোড়ী, ভাণ্ডারহাঠী, হুগলি

প্রবীণ মুখোপাধ্যায়	অনাবকুমার পাল	অমলেন্দু সরকার
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা

নর্থ সেকেন্ড ট্রান্সপোর্ট এজেন্সীজ

কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী লিঃ

মালদা

দূরভাষ

এস টি ডি - ০৩৫১২

সভাপতি সম্পাদক

শারদ সম্ভাষণ গ্রহণ করুন ঃ—

ফোন ঃ ৫২৪০২ (হেড অফিস)
৫১৩২৩ (সেভিংস ব্রাঞ্চ)

"উন্নয়ন ভবন"

মালদা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

১৭/এ, রবীন্দ্র এভিনিউ (৪র্থ তল), মালদা

ব্রাঞ্চ অফিস ঃ চাঁচল ব্রাঞ্চ, সামসী; সেভিংস ব্রাঞ্চ, মালদা, গাজোল ব্রাঞ্চ, গাজোল (প্রস্তাবিত)

সাব-অফিস ঃ হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, কালিয়াচক, পাকুয়াহাট, বুলবুলচণ্ডী

সময়মত ঋণ পরিশোধ করুন, বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুযোগ গ্রহণ করুন।

দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে ঃ প্রচলিত প্রকল্প ছাড়াও ট্রাকটর, পাওলার টিলার, ট্রাক (LPT), মিনিট্রাক, নার্সিং হোম, কম্পিউটার সেন্টার, গৃহনির্মাণসহ বহুমুখী ঋণের সুযোগ।

ব্যাঙ্ক আমানত প্রকল্পে ঃ সেভিংস, রেকারিং, ফিক্সড ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট। (যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদ) এবং লকারের ব্যবস্থা।

(একমাত্র এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ডিপোজিটের উপর অর্জিত সুদ আয়কর থেকে রেহাই পাবে)

অমরকুমার দে
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

রণজিৎ চক্রবর্তী
চেয়ারম্যান

বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মুখ্য কার্যালয় : মাচানতলা, বাঁকুড়া

দূরভাষ : (০৩২৪২) ৫০৩০২/৫১০৯০/৫০৪৫৮

☆৭৫ বছরের গৌরবোজ্জ্বল উত্থানের ইতিহাস ☆
☆৭৫ বছরের নিরলস সংগ্রামের স্মৃতি ☆

- জেলাবাসীর সেবায় নিয়োজিত বৃহত্তম লগ্নিকারী একমাত্র ব্যাঙ্ক।
- ১৫টি শাখা দ্বারা সমগ্র জেলাবাসীর স্বার্থে নিবেদিত সুষ্ঠু পরিষেবা।
- ১০০ কোটিরও বেশি টাকার মূলধন।
- যেকোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রদেয় সুদের চেয়ে প্রদত্ত সুদের হার বেশি।
- সমবায়ের সুবিশাল পরিকাঠামোর সাহায্যে প্রতিটি পরিবারের সুখদুঃখের অংশীদার।

মানুষের গভীর আস্থার ফলশ্রুতি আমাদের শ্রীবৃদ্ধি,
তাকে মানুষের সেবায় পুনর্নিয়োজিত করাই
আমাদের লক্ষ্য।

প্রবন্ধ

শিশু শ্রমিক

গৌরহরি বসু

"I am a Child.
All the world waits for my coming.
All the earth watches with interest
to see what I shall become.
Civilisation hangs in the balance.
For what I am, the World of
tommorrow will be.
I am the Child.
You hold in your hand my destiny.
You determine, largely, whether
I shall succeed or fail.
Give me, I pray you, these things
that make for happiness.
Train me, I beg you, that I may be a
blessing to the world."

১০ ডিসেম্বর, ১৯৮৬।

সুদিন কোর্টের মাননীয় বিচারপতি কুলদীপ সিংহ, বি এল হনুমানিয়া এবং এল বি মহুকদার সমিতিদের ৩২ ধারা অনুযায়ী দায়ের এম সি মেহতা বনাম তামিলনাড়ু সরকার ও অন্যানদের মামলার রায় দান শুরু করেন Mamal Gene Cole-এর এই বিখ্যাত কবিতাটির উদ্ধৃতি দিয়ে। এই প্রসঙ্গে মাননীয় বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, "Child is the father of man'. To enable fathering of a valiant and vibrant man, the child must be groomed well in the formative years of his life. He must receive education, acquire knowledge of man and materials and blossom in such an atmosphere that on reaching age, he is found to be a man with a mission, a man who matters so far as the society is concerned."

শিশু শ্রমিকদের নিয়ে বিচারপতিদের এই ঐতিহাসিক মামলার যে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন তাই অবলম্বন করে সারা ভারতের শিশু শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও কেন আইনেই সঠিক প্রয়োগ হয়নি। দেশিত অবহেলিত শিশুরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার অবলম্বনের দিকে এগিয়ে যেতে কেউই এ সম্পর্কে ইতিবাচক কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি। এই প্রথম সুদিন কোর্ট একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ নিলেন।

"তোমরা আমাকে বাঁচতে দাও, আমি তোমাদেরই সন্তান" — এটা শুধু একটা স্লোগানের কথা নয়, এ সারা পৃথিবীর শিশু শ্রমিকদের অন্তরাত্মার এক করুণ কাহিনী। ১৯৫৯ সালের রাষ্ট্রসংঘের সনদের সপ্তম নীতিতে বলা হয়েছিল, "The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities by law and by other means to enable him to develop physically, mentally, morally, spiritually and socially in a healthy and normal manner and in condition of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interests of the child shall be the paramount consideration". ৯নং অধিকৃতীত নীতিতে বলা হয়েছিল, "The child shall be protected against all form of neglect, cruelty and exploitation. He shall not be the subject of traffic in any form. The child shall not be admitted to employment before an appropriate minimum age. He shall, in no case,be caused or permitted to engage in any occupation or employment which would prejudice his health or education or interfare with his physical, mental or moral development"— কিন্তু আজও শিশু শ্রমিকদের অবস্থানের কোন হেরফের হয়নি। জনসংখ্যার সাথে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ছে। এই নিয়মের পর ৩০ বছর পার হয়ে গেলেও অবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

শিশু শ্রমিকের সংজ্ঞা কি ও কাদের শিশু শ্রমিক বলা হবে কোন-কাজ-পেশা থেকে সরকার থাকলেও মৌলিকভাবে শিশুদের সমস্যা গোটা বিশ্বে একই রকম। ১৯৭৩ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ১৩৮তম Minimum Age Convention-এ গৃহীত প্রস্তাবে শিশু বলতে ১৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের ধরা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৯ সালের United Nations Convention of Human Rights of the Child অনুযায়ী ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাদের ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশুরা যদি নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে তাদের শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়। শিশুরা যদি নিজের পরিবারে কাজ করে এবং তা যদি তার শৈশবে ও ঐতিহ্য পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে তাদের শিশু শ্রমিক হিসাবে গণ্য হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে সব শিশুরা স্কুলে যায় না তাদেরও শিশু শ্রমিক হিসাবে ধরা হবে। এটা ধরে নেওয়া হবে, যে শিশু স্কুলে যায় না সে নিজের বাড়ি বা অন্য কোথাও কিছু না কিছু কাজ করে সেটা তার বাঁচা ও বাড়ার পক্ষে সহায়ক নয়।

শিশু, বাল্য ও বয়-এর সংজ্ঞা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম থাকলেও এটা মৌলিকভাবে স্বীকৃত যে ৬/৭ বছরের বেশি বয়সের ছেলেমেয়েরা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের প্রয়োজনে কাজ করে যা পরিবারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটায় এবং যার মাধ্যমে সে অর্জিত বংশপরম্পরা, কর্মদক্ষতা ও সৃজনশীলতার ধারক ও বাহক হিসাবে পরবর্তীকালে আত্মপ্রকাশ করে। এই কাজকে শ্রম হিসাবে গণ্য করা হয় না। শিশু শ্রম শুধু অর্থ বয়ে করে। শিশুদের শ্রমের মূল্য না দিয়ে শোষণ করা, শিশুদের দিয়ে বেশি সময় কাজ করানো, শিশুর সামর্থ্যের বর্হিভূত ও আইনে প্রদত্ত

অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে আজ, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা নষ্ট করা, অল্পের বিনে পরে খাটিয়ে মারার কারণে ইত্যাদি থাকলেই তার জন্যকে শিশু শ্রমিকের জন্ম হিসাবে গণ্য করা হবে।

সমগ্র বিশ্বে শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা কত এ নিয়ে মতভেদ আছে। যেহেতু আলোচ্য বিশ্বের সমস্ত দেশগুলিতে এক ধরা নেই, যেহেতু সব দেশের পরিসংখ্যান একত্র করে কোন সর্বসম্মত সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আই এল ও-র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আমরা পরিসংখ্যান প্রকাশিত বিশ্বের ৪০টি দেশ পূরণ করে পাঠাইনি। বহু দেশ শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত পরিসংখ্যান রাখেই না। তবুও আমরা হিসাবমতে বিশ্বে ৫ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২৫ কোটি। এর মধ্যে সব সময়ের ১২ কোটি এবং আংশিক সময়ের ১৩ কোটি। ১ থেকে ৫ বছর এবং ১৪ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের এতে ধরা হয়নি। আই এল ও সূত্রে অক স্ট্যাটিসের মতে ১৯৯০ সালে সমগ্র বিশ্বে ১২ কোটি ৮০ লক্ষ শিশু কোন শিক্ষার সুযোগ পায়নি; অবশ্য এদের শিশু শ্রমিক হিসাবে ধরা হয়নি। এদের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র শিশুর অন্তত ২০ শতাংশ।

বেসরকারি সমীক্ষকদের মতে, পৃথিবীর শিশু শ্রমিকদের সংখ্যা ২০ থেকে ৪০ কোটি যার শতকরা ১৮ ভাগ কাজ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। আকাশবাণী ২১-৬-৯৬ তারিখের এক সমীক্ষায় জানিয়েছে ১০ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বে ৬ কোটি ৩ লক্ষ। এর অর্ধেকই কাজ করে দক্ষিণ এশিয়ায়। এই শিশুদের ১৫ শতাংশ কাজ করে ভারতে আর ১০ শতাংশে পাকিস্তানে।

১৯৮১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৬৮.৩০ কোটি এবং শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১.০৬ কোটি। ১৯৯১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ৮৪.৬০কোটি। শিশু শ্রমিকের সংখ্যা রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ সেন্সাস অপারেশনের কাছ থেকে এখনও জানা যায়নি। ১৯৮১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে শিশু শ্রমিকের হার ধরে ১৯৯১ সালের জনসংখ্যার শিশু শ্রমিক নির্ধারণ করলে সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১.৬৯ কোটি।

ভারতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। এ থেকে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা মেলে।

১। L.O's Global Labour Force, Report, 1975 — ১.৪১ কোটি

২। National Sample Survey 1977-78 — ১.৬২ কোটি

৩। Cencus Report 1981 — ১.৩৬ কোটি

৪। The Planning Commission 1983 — ১.৭৪ কোটি

৫। Operational Research Group, Boroda, 1983 — ৪.৪০ কোটি

৬। The Balai Data Banik, Manila — ১১.১০ কোটি

৭। Labour Minister, Govt. of India - 1994 — ২.০০ কোটি।

উল্লিখিত তথ্যগুলির মধ্যে অপারেশনাল রিসার্চ গ্রুপ, বরোদার সংখ্যাটিকে তথ্যভিত্তিক সংখ্যা হিসাবে গৃহীত হয়। এছাড়া অনেক রাজ্য সরকারও আলাদাভাবে এ ব্যাপারে সমীক্ষা করেছেন। উড়িষ্যা সরকার ১৯৯১ সালে এক সমীক্ষা করে জানিয়েছেন উড়িষ্যায় ৬ লক্ষ শিশু শ্রমিক আছে এই সংখ্যা মোট শ্রমজীবী মানুষের ৬ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী বিগত এপ্রিল ১৯৯৭-এর এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ৫ লক্ষ।

১৯৮১ সালের আদমসুমারিতে শিশু শ্রমিকের ক্ষেত্রে অন্ধ্রপ্রদেশ শীর্ষে ছিল। এ সংখ্যা ছিল ১১,০৬,৮৭৩। পশ্চিমবঙ্গে ছিল ২,৯৯,৮৪৫। ১৬ বছর পর এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ। মোটামুটিভাবে উল্লিখিত তথ্যগুলি থেকে এ কথা প্রমাণিত সমগ্র বিশ্বে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কমশই বাড়ছে।

ভারতে শিশু শ্রমিকের কাজের ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংগঠিত ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নেই। অসংগঠিত ক্ষেত্রের একমাত্র কৃষি ক্ষেত্রেই ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ শিশুশ্রমিক কাজ করে। এছাড়া আছে খনি, দোকানে, রেস্টুরেন্টে, হোটেল, গারেজ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে। এছাড়া বিপজ্জনক শিল্পে কাজ করে অন্তত ২০ লক্ষ শিশু।

কয়েকটি বিশেষ সুবিধার জন্য যাঁদিকেরা শিশু শ্রমিক পছন্দ করেন। সেগুলি হল (১) শিশুকে ন্যায্য পারিশ্রমিক দিতে হয় না, সীমাহীন শোষণ করা যায় (২) কাজের সময়সীমা নেই, যত খুশি খাটান যায় (৩) ট্রেড ইউনিয়ন বা সংগঠন প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নেই (৪) সামাজিক নিরাপত্তার ধার ধারতে হয় না (৫) প্রয়োজনে অতিশূরণ ছুড়াই ছাড়িয়ে দেওয়া যায় (৬) ঋণ শোধের জন্য শিশুকে বিনা পারিশ্রমিকে খাটান যায় (Bonded Labour) (৭) আইন থাকলেও আইনী বাধ্যবাধকতা নেই ইত্যাদি।

শিশু শ্রমিকের উৎপত্তির মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দারিদ্র একটি প্রধান কারণ। এছাড়া অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব, প্রাচীন অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবার কারণে শহরে জমির টানে আগত ও বংশপরম্পরায় পারিবারিক কাজ হারানর কারণে শিশু শ্রমিকের যোগান বাড়তে থাকে। আই এল ও-র এক সমীক্ষায় জানা গেছে একটি দরিদ্র পরিবারের আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ শিশু শ্রমিকেরা পূরণ করে। শিশু শ্রমিক সমস্যা আলাদা কোন সমস্যা নয়। সব সমস্যার আবর্তে পড়ে শিশু শ্রমিকের উৎপত্তি। অর্থনীতি বিশারদ হওয়া, অল্প বয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা না মেনে অধিক সন্তানের জন্ম দেওয়া, বেকারি, অশিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, সীমাহীন দারিদ্র এগুলি চক্রাকারে পরিবারকে দারিদ্রের আবর্তে ঠেলে দেয়। তাই পরিবারের অভাব পূরণে শিশুকেই বলি দেওয়া হয় তার শিক্ষা, বৈশোরের খাঁচা ও বাড়ার আনন্দময় পরিবেশ থেকে উৎপাত করে।

শিক্ষার সাথে শিশু শ্রমিকের একটা সম্বোধ আছে। শিক্ষিত বাবা-মায়ের বত দরিদ্রই হোন না কেন ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠান। আই এল ও-র এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে ভারতে কেরালা রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের সমান হলেও শুধু শিক্ষার হার বেশি থাকায় ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কারণে এই রাজ্যে শিশু শ্রমিক নেই বললেই চলে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যেও এই তথ্যের প্রমাণ মেলে। অর্থনীতিতে একটি প্রবাদ আছে হওয়ার সত্ত্বেও বহু দেশ শুধু শিক্ষার কারণে শিশু শ্রমিক সমস্যা অনেক কমিয়ে এনেছে। প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কা এর নজির।

সংবিধানে সব শিশুর শিক্ষার অধিকার ও বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সংস্থান থাকলেও পরিসংখ্যানের অঙ্কে, রাষ্ট্রীয় সদিচ্ছা ও অনুদান কমলে আজও কোটি কোটি শিশু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। শিশুকে পড়াশুনার সুযোগ দিলে সে পরবর্তীকালে শিশু শ্রমিকের মতো শিশু হিসেবে সমাজে অবস্থান নেবে না।

বিপজ্জনক শিল্পে শিশুদের কাজ ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আইনে বিপজ্জনক শিল্পগুলি হল (১) বিড়ি তৈরি (২) কার্পেট তৈরি (৩) সিমেন্ট উৎপাদন (৪) কাপড় কেচা, ছাপা ও রং করা (৫) দিয়াশলাই, বিস্ফোরক ও বাজি তৈরি (৬) অঙ্ক কাটা ও বিভাজিকরণ (৭) দামড়া উৎপাদন (৮) সাবান তৈরি (৯) চামড়া প্রস্তুতকরণ (১০) উল পরিষ্কার (১১) নির্মাণ শিল্প (১২) গ্লেট পেনসিল তৈরি ও প্যাকেজিং করা (১৩) Agate কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য উৎপাদন (১৪) সীসা, পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, বেনজিন, কীটনাশক ও অ্যাসবেস্টস তৈরি (১৫) খনিতে আইনে বর্ণিত বিপজ্জনক কার্যক্রম (১৬) কাচ ব্যাবসায় জাহাজ ও তদসংক্রান্ত কাজ (১৭) ইলেকট্রনিক শিল্পের বিভিন্ন কাজ। এছাড়া বিভিন্ন কাজকেও বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) রেলওয়েতে যাত্রী ও মাল পরিবহণের কাজ (২) রেলওয়ের ঝাড়ি তৈরি ও পরিষ্কার রাখার কাজ (৩) স্থান পরিবর্তনশীল কারিগরি-এর কাজ (৪) রেলওয়ে স্টেশন বা লাইনের ধারের নির্মাণ কাজ (৫) পোতাশ্রয়ের কাজ (৬) সাময়িক অনুমোদনভিত্তিক বাজি বিক্রয় (৭) কবাইখানার কাজ। আকাশবাণী কলকাতার ২৫-৭-৯৭ তারিখের এক খবরে জানা গেছে ভারত সরকার আরো একটি পেশা ও ৩৬টি কাজ শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করেছে।

বিপজ্জনক শিল্পে ও কাজে শিশুদের নিয়োগ করলে শিশুদের দেহ, হাড়, মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, চোখ, কান, কিডনি, হৃৎযন্ত্র, অন্ননালিতন্ত্র সংক্রান্ত ও প্রজনন সম্বন্ধীয় অঙ্গ, ত্বক, ফুসফুস ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিরের যে বিপুল ক্ষতি হয় তাতে বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ হতে থাকে। এর সাথে অপুষ্টি, অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ মিলিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে সে যৌবনেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশ জাতির পক্ষে সে একটি সম্পদ সৃষ্টি না হয়ে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

বিপজ্জনক শিল্পে শিশুরা কাজ করে কি ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয় তার খবর নিলে পর দিন দেখলেও আমাদের মনে দাগ কাটে না। ১২-৯-৯৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার খবরের শিরোনাম "কারখানে বিস্ফোরণ - মৃত্যি কারখানার, মৃত ১২, জখম ১৭"। আতসবাজির এই কারখানার বিস্ফোরণে যারা মারা গিয়েছে তারা সবাই শিশু। এরা জানত না কি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে তাদের। বেআইনী এই কারখানার মালিকের নামে পুলিশ কেস করে। কেস কিছুদিন এ নিয়ে খুব উত্তপ্ত আলোচনা, সংবাদপত্রে খবরাখবর হেডলাইন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সব আগের মত চলছে। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে পুলিশী ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। আগের মালিকেরা কায়দা বেকায়দা মালিক কারখানা চালাচ্ছেন, আর দুর্ঘটনায় নিহত পরিবারের ও আত্মীয়-স্বজনের ছেলেমেয়েরাই সেখানে কাজ করছে। এ থেকে এটা পরিষ্কার, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি না হলে, সচেতনতার অভাব থাকলে ঘুষ-দারিদ্র-অপুষ্টি থাকলে ঘুরে ফিরে একই আবর্তে ফিরে আসতে হবে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ভারতের রপ্তানিযোগ্য কার্পেট শিল্পের পণ্য রপ্তানি খুব অসুবিধার পড়ে। রপ্তানি করতে হলে ঐ শিল্প শিশু শ্রমিক মুক্ত এই সার্টিফিকেট নিতে হবে। এ সম্পর্কে অনেকে বলেন, শিশুদের আঙুল কার্পেট তৈরির খুব উপযুক্ত। শিশুদের নিযুক্তির ফলে উৎপাদন খরচ কম, তাই প্রতিযোগিতায় ভারতে টিকে আছে। অন্যথায় ভারত বাজার হারাবে। সে যাই হোক, আন্তর্জাতিক চাপে শিশুদের এই বিপজ্জনক কাজ থেকে মুক্ত করতে পারলে শিশুরা উপকৃত হবে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের কথা বলা যায়। বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৩০ ভাগ যোগায় বাংলাদেশের পোশাক শিল্প। আই এল ও ভারতের মত বাংলাদেশেও পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে ঐ শিল্প শিশু শ্রমিক মুক্ত এই সার্টিফিকেট দাবি করে। বাংলাদেশ সরকার তৎপরতার সাথে এই সমস্যার মোকাবিলা করেছে। আইন করা হয়েছে যে প্রতিষ্ঠান শিশু শ্রমিক নিয়োগ করবে তার শাস্তি হবে ৫০০০ ডলার। এছাড়া আই এল ও-র কাজ থেকে ১ লক্ষ ৭ শত ৫০ জনের পূনর্বাসন তহবিল নিয়ে ঐ শ্রমিকদের স্কুলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র প্রতি মাসিক ৩০০ টাকা অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সার্টিফিকেট নিয়েছেন পোশাক তৈরি নিয়ে বাংলাদেশে কোনশিশু শ্রমিক নেই — এ খবর ১-১১-৯৬-এর বাংলাদেশ বেতারের। বাংলাদেশ যা পারে ভারত তা কেন পারবে না এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে।

সারা বিশ্বে শিশুদের নিয়ে যৌন ব্যবসা আজ রমরমা। খুব সংগঠিত পরিচালনাতে এর আন্তর্জাতিক ও আন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের জড়িত। এর আয় শিশুর পর্ন, পায় আত্মীয়-স্বজন ও পরিচালকদের সম্ভ্রমায়। রাষ্ট্রসংঘের ১৯৯৬ সালের বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে এশিয়াতে ১০ লক্ষ শিশু এর শিকার। যেটাবুটি এশিয়ার সব দেশই এই কাজে জড়িত।

ভারতে শিশু যৌন কর্মীর সংখ্যা কত তা সঠিক বলা সম্ভব না হলেও নিম্নলিখিত বিবরণ থেকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। ২৯-৭-৯৫ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার এক খবরে বলা হয়েছে "শিশু যৌন কর্মীর সংখ্যা সারা বিশ্বে সব থেকে বেশি ভারতে।" এক চাইল্ড প্রটেকশন ইন এশিয়ান ট্রাস্টিবিষয় (একপেট) নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এই তথ্য জানিয়েছে এশিয়ার ১০ লাখ শিশু যৌন কর্মীর মধ্যে ৪/৫ লাখই ভারতীয়, আড়াই লাখ আছে থাইল্যান্ডে, ফিলিপিনে ৬০ হাজার। এই সমীক্ষার জানা গেছে খুব কম শিশুই নিজের ইচ্ছায় এই ব্যবসায়ে নেমেছে। এদের এক-তৃতীয়াংশ এইচ আই ভি বহন করছে। অমৃতবাজার পত্রিকার ১৫-১০-৯৫ তারিখের একটি 'হটলাইন' খবর বলা হয় তার শিরোনাম ছিল " Children in flesh Trade"। মৈত্রেন সেন্টার এই প্রতিবেদনে জানা গেছে হৃদয়বিদারক সব ঘটনা। নেপালের এক শিশুকে বোম্বাইয়ে বিক্রি করা হয়। প্রথম দিনে তাকে আট জন খরিদ্দারকে সন্তুষ্ট করতে হয়। পুলিশের সাহায্যে তাকে আট মাসের মধ্যে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। প্রতিবেদনের মতে, বোম্বাইয়ের কামাথিপুরা 'রেডলাইট এরিয়ায়' দশ হাজার শিশু যৌনকর্মী আছে, কলকাতার

এর সংখ্যা কম করে ৫০ হাজার। নিউইয়র্কে ৩০ হাজার, বাংলাদেশে কম করে ৫০ হাজার। বাংলাদেশের এক সমাজসেবীর কথায় কানে বেজে, "you may not get food but a teen aged girl if you have money."

একটি এন জি ও সংস্থা মেয়েদের সম্পর্কে সমীক্ষা করে জানিয়েছে শতকরা ৮০ জন মেয়েই শিশুকালে 'Sexually abused' হয়, এর মধ্যে শতকরা ৫০ জন বাড়ির ভেতরের পরিবেশে। এই যদি হয় স্বাভাবিক শিশুদের পরিস্থিতি সেখানে শিশু শ্রমিক বা শিশু যৌনকর্মীদের কি অবস্থা তা কল্পনার বাইরে।

শিশু শ্রমিকদের আইনী সুরক্ষার জন্য স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যবস্থা ছিল। লর্ড রিপন, গভর্নর জেনারেল ও ভারতবর্ষের আইনসচিব, শিশু শ্রমিকদের প্রতি মালিকের অত্যাচার, শোষণ ও অপব্যবহার দেখে ১৮৮১ সালে প্রথম কারখানা আইন পাশ করান। ঐ আইনে ৭ থেকে ১০ বছরের শিশুদের দৈনিক ৯ ঘন্টার বেশি কাজ নিষিদ্ধ ছিল। ১৯০৮ সালের শিশু শ্রমিক নিয়োগ আইনের ওপর ভিত্তি করে শিশুদের দিয়ে বিপদ্জনক কাজ করানোর প্রতি নিষেধাজ্ঞা ছিল। ভারতীয় সংবিধান প্রনয়ণের পর বহু আইন তৈরী করা হয়েছে যার মাধ্যমে ১৪ বছরের নীচের শিশুদের শ্রমিকের কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন ১৯৫১ সালের খনিজ শ্রম আইন, ১৯৫২ সালের খনি আইন, ১৯৬১ সালের শিক্ষানবিশ আইন, দোকান এবং সংস্থা আইন-১৯৬১, বিড়ি, চুরুট শিল্পে নিয়োগ শর্ত সংক্রান্ত আইন - ১৯৬৬, মোটর যান আইন - ১৯৬১, ভারতীয় চুক্তি আইন - ১৯৭২, বেগার শ্রমিক প্রথা চুক্তি আইন - ১৯৭৬, অভিভাবক ও ন্যাসরক্ষক আইন - ১৯৯০ ইত্যাদি। ভারত সরকার ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শিশু শ্রম বিল পাশ করেন। ঐ বছরই মোটামুটি সব আইনগুলির সমন্বয়ে শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন - ১৯৮৬ কার্যকরী হয়। এই আইন কার্যকরী করার নিয়মাবলী ১৯৮৮ সালে প্রণীত হয়।

১৯৮৬ সালের শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন একটি ব্যাপক পদক্ষেপ। ঐ আইনে বিপজ্জনক ও বিপজ্জনক নয় এমন সব কাজ ও পেশায় শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আইনে বিপজ্জনক তালিকাভুক্ত শিল্প, পেশা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদি কোন মালিক ঐ কাজ লঙ্ঘন করে শিশু শ্রমিকদের ঐসব কাজে নিয়োগ করে তাহলে তার তিন মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় শাস্তিই একসাথে হতে পারে। কোন মালিক দ্বিতীয়বার এই অপরাধ করলে তার ৬ মাস থেকে ২ বছর জেল হতে পারে।

বিপজ্জনক কাজের ক্ষেত্রে এই আইনে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা ও শর্ত আরোপ করা হয়েছে। সেগুলি হল (১) কোন শিশুকে নির্দিষ্ট সময়ের বেশি কাজ করানো যাবে না। (২) একটানা তিন ঘন্টা কাজের পর এক ঘন্টা বিশ্রাম দিতে হবে (৩) কাজের সময়সীমা বিশ্রামসহ ছয় ঘন্টার বেশি হবে না (৪) কোন শিশুকে দিয়ে সকাল ৭টার আগে বা রাত ৮টার পর কাজ করানো যাবে না (৫) কোন শিশুকে অতিরিক্ত সময় (ওভারটাইম) খাটানো যাবে না (৬) একই দিনে একাধিক প্রতিষ্ঠানে কোন শিশুকে খাটানো যাবে না (৭) শিশুকে সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে ছুটি দিতে হবে (৮) বয়স নিয়ে বিরোধের ক্ষেত্রে পরিদর্শক শিশুকে বিধিবদ্ধ চিকিৎসকের কাছে পাঠাবেন।

ঐ আইনসহ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৯৫ সালে 'পশ্চিমবঙ্গ শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি' প্রণয়ন করেছেন। তাতে শিশুদের পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা, কাজের জায়গায় স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কোন মালিক আইন না মানলে শিশুদের পক্ষে যে কোন ব্যক্তি, পরিদর্শক বা পুলিশ অফিসার মামলা রুজু করতে পারেন।

এই আইন ও নিয়মাবলী থাকা সত্ত্বেও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগকারী মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। তার প্রধান কারণ পরিদর্শকের অতুলতা, আইনানুগভাবে মামলা দায়ের করার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, সচেতনতার অভাব, শিশুদের পরিবার-পরিজনের অনীহা ইত্যাদি। কিন্তু শাস্তি দিতে না পারলেও এই আইন থাকায় বহু মালিক শিশুদের বেপরোয়াভাবে নিয়োগ ও শোষণ থেকে বিরত থাকছেন। বহু রাজ্য সরকারও এগিয়ে এসেছেন আইন তৈরী করে তাদের কর্মক্ষেত্রে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা ও সচেতনতা বাড়লে যে ক্ষেত্রে আইন লঙ্ঘনের প্রবণতা কমতে থাকে এবং এর ফল শিশু শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে বাধ্য।

১৯৯৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে ভাষণদানে প্রধানমন্ত্রী লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেন ২০০০ সালের মধ্যে বিপজ্জনক শিল্প থেকে শিশু শ্রমিক প্রথার অবসান ঘটানো হবে। এজন্য ন্যাশনাল অথরিটি গড়ে তাদের মাধ্যমে তহবিল ঘোষণার ব্যবস্থা ও প্রকল্প পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই কমিটি গঠিত এবং এর শীর্ষে থাকবেন মাননীয়। অন্যান্যরা হলেন শিক্ষা প্রাবোয়ন, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন সচিব। এছাড়া থাকবেন যোজনা কমিশনের একজন সদস্য, আই এল ও ও ইউনিসেফ-এর একজন করে প্রতিনিধি ও শিশু শ্রমিকের উপর কাজ আছে এমন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। এই কর্তৃপক্ষ নিয়োগপত্তি, মালিক, বাজেট, ফেলার দান ইত্যাদির মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে কাজ চালাবেন।

বাজেটে এই কাজের জন্য মোট ৮৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে '৯৫-৯৬-এ ৮৫ কোটি, '৯৬-৯৭-এ ১৭০ কোটি, '৯৭-৯৮-এ ২৫৫ কোটি, '৯৮-৯৯-এ ২৫৫ কোটি ও '৯৯-২০০০ সালে ৮৫ কোটি। শিশু প্রতি বছরের হিসাব ধরে ধরা হয়েছে ৪২৫০ টাকা এর মধ্যে শিক্ষার জন্য ৩২ টাকা, স্বাস্থ্যের জন্য ৩২০ টাকা, সচেতনতার জন্য ৩২০ টাকা, কর্মী ও মূল্যায়নের জন্য ৩২০ টাকা ও বিবিধ খরচ ধরে ৮০ টাকা। এই টাকা খরচ করা হবে প্রধা বহির্ভূত স্কুল পরিচালনা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির জন্য ব্যবস্থা, শিশুর পিতামাতা, অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের আয় বৃদ্ধি ও এই কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শক্তিশালী ও যোগ্য করে তোলার জন্য।

এই কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে পরবর্তীকালে National Child Labour Policy-1987 তৈরী হয় যার মূল কথাগুলি ছিল যেখানে শিশু শ্রমিকের অবস্থান বেশি সেই এলাকায় National Child Labour Project তৈরী করে প্রোজেক্টের

মাধ্যমে কাজ করা। এই প্রোজেক্টের মূল কাজ বিভিন্ন বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রমিকের কবলমুক্ত করা, শিশু শ্রমিক আইন কার্যকর করা, প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা দেওয়া, বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়া, পরিবারের আয় ও চাকরি বৃদ্ধির পরিকল্পনা কার্যকর করা, বিশেষ ধরনের স্কুল পরিচালনা, জনসচেতনতা বৃদ্ধির কাজ ও সমীক্ষা ও মূল্যায়ন।

এই এন সি এল প্রোজেক্ট কার্যকরী করার জন্য জেলায় জেলায় জেলা সদরদপ্তরকে সভাপতি করে একটি সমিতি গড়া হয় সমিতি নিবন্ধন আইনে। উল্লিখিত কাজগুলি এই সমিতির মাধ্যমে করার জন্য ব্যাপক নিয়মাবলী প্রণীত হয়। এই কাজের অংশ হিসাবে জেলায় জেলায় স্পেশাল স্কুল গড়া হয়। এই প্রোজেক্টে একমাত্র উত্তর ২৪ পরগনাতেই ৩০টি স্পেশাল স্কুল গড়া হয়।

এই স্কুলগুলিতে যেসব শিশুকে নেওয়া হয়েছে তারা সত্যিকারের শিশু শ্রমিক কিনা এ নিয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। সাধারণ স্কুলের ছেলেরা যেখানে ১০০ টাকা অনুদান ও অন্যান্য সুবিধা পায় না, তাই সাধারণ স্কুলের ছেলেমেয়েরা স্কুল ছেড়ে স্পেশাল স্কুলে এসেছে অনেক ক্ষেত্রে। এর স্বার্থান্বেষী চক্রের কাজ ও যথাসময়ে কেন্দ্র থেকে অনুদানের টাকা না দেওয়ায় এই স্কুলগুলি উঠে যাবার পথে। এই প্রসঙ্গে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের অবতারণা করছি। খবরের শিরোনাম "সাহায্য বন্ধ, শিশু শ্রমিকদের ৩৯টি স্কুল তালা বর্ধমানে"। খবর হল — "কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার বর্ধমান জেলার শিশু শ্রমিকদের জন্য তৈরি ৩৯টি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। ওই স্কুলগুলিতে প্রায় ২০০০ শিশু শ্রমিককে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিশুরা এখানে বিনামূল্যে দুপুরে খাবার পেত। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসের শেষের এই স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই শিশু শ্রমিকদের পড়াশুনা শিকেয় উঠেছে। বর্ধমানের জেলাশাসক সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দিলে এই স্কুলগুলি আর চালানো সম্ভব নয়।" এটা শুধু বর্ধমানের চিত্র নয়, সারা দেশে এই একই অবস্থা। ২০০০ সাল তো আর কঠিন পত্র অপদার্থ, প্রধানমন্ত্রীর দেওকলস, রাজ্যসভা ও লোকসভার দেওয়া প্রতিশ্রুতির কি হবে।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশবলে সারা ভারতে বিপজ্জনক শিল্পে শিশু শ্রমিকের নিয়োগ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালানোর হয়। আদেশে ১০-৬-৯৭-এর মধ্যে সমীক্ষার কাজ শেষ করতে বলা হয়। প্রতিটি রাজ্যে এই সমীক্ষা চালানো হয়। কিন্তু এই সমীক্ষার রিপোর্ট যে তথ্য পাওয়া গেছে, তা আদৌ তথ্যের অন্তর্ভুক্তই নেই। এ সম্পর্কে স্টেটসম্যান পত্রিকার খবর যে ১৯৯৭-এর একটি খবরের উল্লেখ করেছি, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খবরটা এই — " Teams conducting a survey to identify children working in various factories in the industrial belt of Barrackpur in North 24 Parganas have found that most of the employees have given them leave and asked them to resume duty after the survey is over". ও ও "A senior official of the Labour Department said that the survey could not be conducted because of shortage of time. He said that the survey team has been asked to submit reports stating that few child labourers had been engaged in the hazardous factories in the State and situation was not alarming"

এ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার ১১ নভেম্বর ১৯৯৭-র একটি খবরের উল্লেখ করেছি। খবরের শিরোনাম "দেশের প্রায় অর্ধেক শিশু শ্রমিক উড়িষ্যায়"। খবর হচ্ছে — "সারা দেশে মোট শিশু শ্রমিকের প্রায় অর্ধেক উড়িষ্যাতেই কাজ করছে। এই রাজ্যে মোট শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার ২২২। অর্থাৎ সারা দেশের শিশু শ্রমিকের ৪০ শতাংশই এরাজ্যে নিযুক্ত। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকারের শ্রমদপ্তর রাজ্যে শিশু শ্রমিকদের সমীক্ষাকরণ ও সংখ্যা নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেছে"।

অথচ ভারত সরকারেরই এক রিপোর্ট জানা গেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র এই সাতটি রাজ্যে ভারতের মোট শিশু শ্রমিকের ৭০ শতাংশ কাজ করে। উড়িষ্যা এদের অন্তর্ভুক্তই নেই। সুতরাং কি সমীক্ষা হয়েছে তা এই তথ্যগুলি থেকেই প্রমাণিত। মোটা দেশে যে সমীক্ষার সময়ে শিশু শ্রমিকদের অভিভাবকের সম্মতি নিয়েছিলেন এটাই হচ্ছে চরম সত্য। সমীক্ষার পর তারা আবার কাজে যোগ দিয়েছে।

শিশু শ্রমিক প্রথা বিলুপ্তি বাঁচানোর লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার প্রোগ্রাম International Programme for Elimination of Child Labour সহযোগে I.P.E.C. ভারত তথা ১৯৯৩ সালে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক Memorandum of Understanding (MOU) স্বাক্ষরের পর। ২০ জানুয়ারি ১৯৯৩ ভারত পক্ষে ঐ চুক্তি স্বাক্ষর করেন শ্রম সচিব এ কে গোপালন। জার্মান সরকার ও আই এল ও-র এক চুক্তি বলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই প্রোগ্রাম চালু হয়। জার্মান সরকারই এর অর্থসাহায্য করেন। এই প্রোগ্রামের কাজ হল শিশু, তার পরিবার, সমাজ ও সরকার সর্বস্তরে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি, হিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজ, বিপজ্জনক কাজ থেকে শিশুদের রক্ষা, শিশুদের জন্য আইনী সুরক্ষার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ১৯৯৩-৯৬-এর মধ্যে ভারতে মোট ১১৮ প্রোগ্রাম এই সময়ে নেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে ৫৮টি ছিল IPEC অধিনে CLASP অর্থাৎ Child Labour Action And Support Project. মূলি প্রোগ্রামই আই এল ও ও ভারত সরকার গঠিত ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত, যার শীর্ষে আছেন ভারত সরকারের শ্রমসচিব। সারা পৃথিবীর ২০টি দেশে এই প্রোগ্রাম চলছে। এর মধ্যে পাকিস্তান ও জাম চলছে ভারতে। ভারতই হচ্ছে সর্বপ্রথম দেশ যে আই এল ও-র সাথে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ১৯৯৩-৯৭ সাল পর্যন্ত ভারতে এই প্রোগ্রাম খাতে ৫১ লক্ষ ২৬ হাজার ৩২৫ ডলার বরাদ্দ করা হয় যার মধ্যে খরচ হয়েছে ৪১ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪৫ ডলার। পি এ সময়ে ভারতস্থ জার্মান রাষ্ট্রদূতের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ভারত সরকারের সাথে তথাকথিত ব্রাজিলের কেন্দ্র আই এল ও ও জার্মান সরকারের সাথে মতবিরোধ ঘটে। ফলে ভারতে আই এল ও-র প্রোগ্রামগুলির অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে কেন্দ্র সরকারই এই প্রোগ্রামগুলি সুষ্ঠুভাবে চলার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে

সক্ষম হননি।

১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে আই এল ও ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করে ভারতে আই এল ও-র প্রকল্পগুলির কাজকর্ম মূল্যায়নের জন্য একটি মূল্যায়ন কমিটি গঠন করেন যার শীর্ষে ছিলেন এ পি ভার্মা, উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রধান সচিব। অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন — এই কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সরকারি আধিকারিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি। এই কমিটিকে ভারতে আই এল ও-র IPEC এবং CLASP প্রোগ্রামগুলি (Child Labour Action Support Programme) খতিয়ে দেখে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হয়। ঐ রিপোর্টের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম নির্ধারিত হবার কথা।

কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্ট ১৯৯৭ সালের মার্চ মাসে পেশ করেন। চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি। ভারতে আই এল ও / আই পি ই সি প্রোগ্রামগুলি এখন কার্যত বন্ধই আছে। এতদিন ধরে তৈরি সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির পরিকাঠামোগত উন্নতি ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী কাজে লাগানো আর সম্ভব হচ্ছে না। তবে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে তা কেউ বলতে পারছে না।

শিশু শ্রমিক প্রথার জন্য শিশু, শিশুর পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার এক হিসাব দিয়েছেন মিঃ এম পি বোসেফ, ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেটর, আই পি ই সি / আই এল ও প্রোগ্রাম ইন ইন্ডিয়া এবং গৌতম ঘোষ, শ্রমিক নেতা তাদের "Trade Union and Elimination of Child Labour" প্রবন্ধে। প্রতিটি কর্মরত শিশু শ্রমিকের জন্য একজন বয়স্কের চাকুরি হচ্ছে না। এরা বেতন কাঠামোকে হ্রাস করছে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অপরিসীম ক্ষতির কারণ এরা। একজন শিশু শ্রমিক শিশু শ্রমিক থাকা অবস্থায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সৃজনশীলতা, পরিবেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞান হতে বঞ্চিত হয়ে যে ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার জন্য তার কর্মক্ষমতা ও আয় কমার ফলে সে অন্ততঃ টাকার অঙ্কে ৮ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশের বর্তমান শিশু শ্রমিকের সংখ্যা সবচেয়ে কম ১ কোটি ৭০ লক্ষ ধরলে এরজন্য পরবর্তীকালে রাষ্ট্রকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে কম করে ১৬০০ কোটি টাকা। আর্থিক ক্ষতি ছাড়া সামাজিক ক্ষয়ক্ষতি আরও বেশি।

শিশু শোষণে মালিক শ্রেণী এবং মাফিয়ারা এত সংঘবদ্ধ যে সংগঠিতভাবে এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ছাড়া প্রতিরোধ সম্ভব নয়। শিশুদের পক্ষে প্রতিবাদ করা খুবই কঠিন। শিশুদের নিয়ে যারা ব্যবসা করে তারা যে কত নির্মম হতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'ইকবাল মাসী'। ১২ বছরের এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্রিস্টান শিশু শ্রমিককে ১৮-৪-৯৭ তারিখে ইসলামাবাদে গুলি করে মারে কার্পেট মাফিয়ারা। এর অপরাধ সে সুইডেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এক সম্মেলনে কার্পেট মাফিয়াদের দ্বারা শিশুদের শোষণের এক হৃদয়বিদারক বর্ণনা দেয়। বস্টনের এক বিশ্ববিদ্যালয়-এর জন্য তাকে স্কলারশিপ দেয়। U.S. Shoe Company তাকে 'Reebok Youth in Action Award'-এ ভূষিত করে যার অর্থমূল্য ১৫০০০ ডলার। এই টাকা সে শিশুদের শিক্ষার জন্য ব্যয়ের কথা ঘোষণা করে। শিশু শ্রমিকের স্বার্থে কথা বলতে গিয়ে এই শিশুটির নির্মম মৃত্যু বিশ্বের ইতিহাসে সভ্যতার মৃত্যু হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬-র শিশু শ্রমিক সংক্রান্ত মামলায় যে ঐতিহাসিক রায় দেন তাতে সরকারকে কতকগুলি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশগুলি হল :

(১) বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত সমস্ত শিশুদের কাজ থেকে সরিয়ে আনতে হবে (২) যে সমস্ত মালিক শিশু শ্রমিক (নিষিদ্ধকরণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইন- ১৯৮৬, লঙ্ঘন করে বিপজ্জনক কাজে শিশুদের নিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেক শিশুর জন্য ২০,০০০ টাকা করে 'শিশু শ্রমিক কল্যাণ ও পুনর্বাসন তহবিলে' জমা দিতে হবে : তারা ঐ কাজ থেকে শিশু শ্রমিকদের ছাড়িয়ে দিতে চাইলেও ঐ টাকা দিতে হবে। (৩) প্রতিটি শিশু শ্রমিকের পরিবারের একজন প্রাপ্তবয়স্ক রোজগেরে জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে, অন্যথায় প্রত্যেক শিশুর জন্য রাজ্য সরকারকে ঐ তহবিলে ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে (৪) উক্ত তহবিলে মোট ২০,০০০ বা ২৫,০০০ টাকা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ সুদসম্পন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যে সুদ পাওয়া যাবে তা ঐ সব শিশুর ভরণপোষণের জন্য তাদের অভিভাবকদের দিতে হবে (৫) ঐসব শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে রাজ্য সরকারকে, তবে শিশুরা অভিভাবকরা যদি শিশুকে পড়াশোনা করতে না পাঠান তবে এনং শর্ত বলবৎ হবে না (৬) অবিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত শিশু শ্রমিকদের কাজের সময় দিনে পাঁচ ঘন্টার বেশি হবে না এবং (৭) প্রত্যেক শিশু শ্রমিকের জন্য প্রতিদিন অন্তত দু'ঘন্টা করে পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে ; আর তার ব্যয় বহন করতে হবে ঐ মালিককেই। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর শিশু শ্রমিকদের ব্যাপারে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছেন। আগামিদিনে এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে কত শিশু শ্রমিক ও তার পরিবার উপকৃত হবেন এটা আমরা ধরে নিতে পারি।

পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শান্তি ঘটক শিশু শ্রমিক সমীক্ষার আবেদনে বলেছেন "যেসব হতভাগ্য শিশু শৈশবেই রুটি রোজগারের তাগিদে শ্রম বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, তারা অন্যান্য শিশুদের মত স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না। তারা মা-বাবার স্নেহ-মমতা, আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে হয় বঞ্চিত। তাদের অনেকেই মালিকের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার শিকার হয়। তারা বড় হয় অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে। তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ সম্যকভাবে হতে পারে না। তার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি দেশে সৃষ্টি হয় একশ্রেণীর স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, নীতিবোধহীন নাগরিক। সমাজ, দেশ ও জাতির উপর এর পরিণাম কি হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।"

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের অভিভাবক ও বর্তমান প্রজন্মের শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার রক্ষক ও বাহক। কিন্তু বর্তমানে শিশুরাই চরম উপেক্ষিত। শিশুদের আনন্দের খনি একান্নবর্তী পরিবার আজ ভেঙে চুরমার। পরিবার ছোট হচ্ছে। নিউক্লিয় শিশুরা বড়দের এক ভালবাসা শূন্যতায় ভুগবে। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিবার গড়ার চাইতে একসঙ্গে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। ফলে প্রকৃতির অবদান হিসাবে দেওয়া শিশুদের দায়িত্ব কে নেবে। বলা না যায়। এই শিশু অধিকারের

নিরাপত্তাহীন হয়ে সমাজের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না কে বলতে পারে। কলম্বিয়ায় এরকম ২৩টি শিশুকে হত্যার গুলি করে মারা হয়েছিল শুধু এই কারণে যে তারা ভবিষ্যতে চোর-গুণ্ডা-বদমাইশ হয়ে সুনাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে।

শিশু শ্রমিক নিয়ে কাজ করতে গিয়ে একটা উপলব্ধি হয়েছে, সমস্যার গভীরতা অনুযায়ী পরিকল্পনা, অর্থের যোগান ও কার্যকরী করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি তৈরী করতে না পারলে শুধুমাত্র আমলাতান্ত্রিক সরকারী কর্মচারী নিয়ে এ কাজ কোন দিনও সম্ভব হবে না। শিশু শ্রমিক উৎপত্তির মূল কারণগুলি মূলে কুঠারাঘাত করলে এর যোগান বন্ধ হতে বাধ্য। যোগান বন্ধ হওয়ার ব্যবস্থার সাথে সাথে বর্তমান ৬ থেকে ১৪ বছরের শিশু শ্রমিকদের দুঃখকষ্টের সমর্থ অনুযায়ী লাঘব করার চেষ্টা চালালে আগামী ৮ বছরের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য, কেননা ততদিনে বর্তমান শিশু শ্রমিকেরা বয়স্ক হয়ে যাবে। হয়ত এর জন্য একটা প্রজন্মকেই মূল্য দিতে হবে। শিশু শ্রমিকের নতুন যোগান বন্ধের জন্য পরিবারের কল্যাণ, আয় বৃদ্ধি শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার সাথে সাথে ৫ বছরের নিচের শিশুরা যাতে কাজে না গিয়ে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক স্কুলে যেতে পারে তার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন মধ্যকালীন পরিস্থিতিতে করতে হবে। তাহলে নতুন শিশু শ্রমিক যোগান বন্ধ হবে। বর্তমানে যারা স্কুলে আছে তারা যাতে ঝেড়ে না যায় এবং ঝেড়ে গেলেও তাদের জন্যে নতুন ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে ঘুরেফিরে তারাই শিশু শ্রমিক হতে বাধ্য।

দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত পরিবারই শিশু শ্রমিক যোগানের উৎসস্থল। অর্থ যাদের কাছে কাম্য সন্তান উৎপাদনের ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক নষ্ট হয়। শিশুদের কাজে লাগিয়ে তাদের পেটভাতের ব্যবস্থা বা কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হয়। ভোটের রাজনীতি ভাঙ্গ করে বিবাহ সংক্রান্ত আইন ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এদের জন্য কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। যদি আইন নাও থাকে তবে গণতন্ত্রবাদী চিন্তার পথ অবলম্বন করে পরিবার সীমিত করার ব্যবস্থা নিতেই হবে। এজন্য চাই নিবিড় পরিকল্পনা ও প্রয়োগের নিষ্ঠা।

কিন্তু কে করবে এই কাজ? বর্তমানে রাষ্ট্রনায়কেরা নিজের, নিজের পরিবারের, নিজের গোষ্ঠীর ও নিজের দলের ক্ষমতায় নিয়ে ব্যস্ত। অন্ন নেই, চাকরি নেই, অন্ন কে কত অন্ন পাবে, চাকরি পাবে তাই নিয়ে রাজনীতি করে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যে অপরিণত বার্থান্বেষী বাদনাদের দল তারা কি বুঝবে শিশু শ্রমিকের মর্মবেদনা। একটা আর্থিক যোজনার খরচে কত লক্ষ শিশুর জীবন ব্যর্থতার উপলম্ব ঘটতে পারে তা কি তাদের জানা আছে? দেশের সুরক্ষার নামে বর্তমান প্রজন্মের এই বলদল আগামী দিনে কালের সুরক্ষা দেবে, যারা বেঁচে থেকেও মৃত থাকবে তাদের জন্য?

কবি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা বারবার মনে পড়ে —

'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে
এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সব চেয়ে বেশি
আজ তারাই দেখে তারা।'

*

তিনবার রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত

ভোমরাপুর হাসপাতাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি লিমিটেড

ধনিয়াখালি ❐ হুগলি

পাকা রং, নিখুঁত কুনন, আধুনিক রুচিসম্মত ডিজাইনের শাড়ি ও ধুতি প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

অফিস ও শোরুম : ধনেখালি বি ডি ও অফিসের সামনে।

খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র : ধনেখালি রাসবাসী সিনেমাতলা (বাস স্টপেজ)

পথ নির্দেশ : হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে শিবাইচণ্ডী স্টেশন থেকে তিন কিমি পথ।

হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে চুঁচুড়া স্টেশন হইতে ১৭নং বাসে ধনেখালি সিনেমা স্টপেজ।
তারকেশ্বর হইতে ১৭নং বাসে ধনেখালি সিনেমাতলা স্টপেজ।

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : কৃষ্ণনগর, নদীয়া

ফোন নং ৫২৩৯৪, ৫২৬৮৩, ৫২৭৮৯

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫টি শাখা মারফতে

সমগ্র জেলায় পূর্ণ পরিষেবা

শেয়ার	২৭২.৪২ লক্ষ
রিজার্ভস্	৩০৬.২৩ লক্ষ
আমানত	৫৫০২.৯৮ লক্ষ
কার্যকরী মূলধন	৬৯৭৫.৫৮ লক্ষ
কৃষিতে লগ্নি	১৮৪৬.৮৯ লক্ষ
তন্তুবয়ে লগ্নি	৬৬৩.২৩ লক্ষ
অন্যান্য খাতে লগ্নি	১০৬৮.৭৮ লক্ষ

কৃষি ও তন্তুবায়ে বৃহত্তম লগ্নি ছাড়াও —

- ❑ চাকুরিজীবীদের সহজ শর্তে ব্যবহারিক ঋণ
- ❑ বন্ধকি ঋণের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ ট্রাক্টর, পাওয়ার ট্রিলার ও ট্রাক কেনায় ঋণ
- ❑ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেয়ে আমানতের উপর ০.২৫% থেকে ১% সুদ বেশি
- ❑ সেফ ডিপোজিট্ লকারের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ চেক, বিল, ড্রাফ্ট কালেকশানের বিশেষ ব্যবস্থা
- ❑ আমানত ভারত সরকারের বিমা প্রকল্পের অধীন

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

	Branches	*Phone No.*
1.	Memari	Mem.-430 &282
2.	Shankarpur	Mem.-533
3.	Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70368
4.	Bohar	Stag - 70246
5.	Madhyamgram	Stag-70388
6.	Matiswer	--------
7.	Burdwan.	Burd.--62245

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Cold-Storage	*SHANKARPUR.*
Capacity	*2 Lakh Mnds.*
Business of	*Banking ; Fertilizer; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ; Grocery ; Pesticides ; Pisciculture ; Agriculture : Dharmagola ; Ware-Housing.*
Pledging of	*Bronze utensile ; Potato Bonds.*
Service	*21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.*

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather and the money-lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important to village life.

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

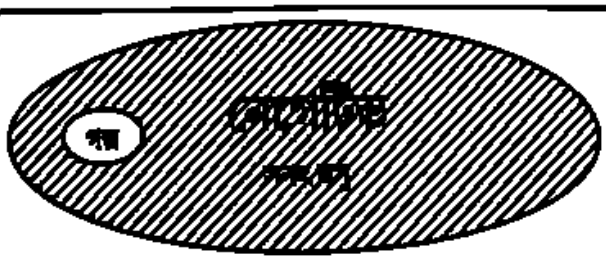

রেলাইনের ধার ধরে সাইকেলে বাড়ি ফিরছি। শেষ বিকেলের প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পর চরাচর এই মুহূর্তে রক্তাক্ত সৈনিকের মত নিঃসাড়, নিস্পন্দ।

রাত প্রায় সাড়ে দশ। সামনে জমা-অন্ধকার কয়লাখনি। নিঝুম। এতরাতে ঘুণাক্ষরেও কেউ এ পথ মাড়ায় না। ফিসফাঁস রাহাজানির ভয়। বহু যুগের আগে মোড়া লাল মিলেটিলি নিকলাল পেভমেন্ট নিচে।

ডাইনে মাথা-সমান উঁচু বুনো ঝোপ। তার পিছনে কয়লিপাদার চকচকে নিকানি নালা। নালার পশ্চিমপাড়ে লেভারি কলোনী। একটানা অনাহূত গানের পর প্রথম বর্ষার মাতাল শ্যামরঙে লেভারি কলোনীও যেন ঘুমে অসাড়।

একমাত্র লিফলের স্টেশন চত্বরে লেবেলদের কিছু আনাগোনা। তেল হিমের নিচে বসা হকারদের হাঁক-ডাক। অন্ধকারের সমুদ্রে যেন ছোট্ট এক প্রবালদ্বীপ-আলোক-দ্বীপ।

আমার খুব তাড়া। ওয়াকে বলেছি আটটার মধ্যে ফিরব। ও নিশ্চয়ই অনাহার নিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনটাই যা মার্জনা ও।

তপনকে কত করে বললাম, আজ থাক, আরেকদিন এসে তোর গল্প শুনব। কিছুতেই শুনল না। একটু বসে যা, বেশিক্ষণ লাগবে না। আর একটু দেরি হলেই বা ক্ষতি কী? ওকে বৌ-এর কাছে দায় ঝেড়ে বাঁ করে না।

তপনের মুখকে আমার ঘনায়মান ভয়। একবার শুরু করলে কোথায় গিয়ে থামবে ও নিজেই জানে না।

অগত্যা বসতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে চা তেলেভাজা আসে। তপন গল্প শুরু করে। কিন্তু এ যে গল্প নয়, ছোটখাটো উপন্যাস। শেষ আর হতে চায় না। আমাকে উসখুস করতে দেখে তপন গল্পের গতি বাড়ায়। গল্প শেষ হয় কাঁটায় কাঁটায় দশটায়।

আমরা চা। এবং তপনের পীড়াপীড়িতে গল্প সম্পর্কে আমার মতামত। তার ফলে আরো পনেরো মিনিট। এরপর 'চলি' বলে স্টান সাইকেলে উঠে পড়া এবং মাইলখানেক পথ ঠেঙিয়ে স্টেশনের লেভেল ক্রসিংয়ের কাছে নামা।

লেভেল ক্রসিং পেরোতেই বাঁ চোখে পড়ে। লাইন ধরে রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে কলোনীর ভিতর দিয়ে সাঁকোটা ঘুরি দিয়ে। কারণ বড় রাস্তা দিয়ে গেলে অনেক ঘুরতে হয়, মিনিট সাত আট বেশি লাগে।

জমা মানাই কথা। লাইন পেরিয়ে সাইকেল সোজা না নিয়ে বাঁদিকে ঘুরে যাই।

এবড়ো-খেবড়ো পথে চলা পথ, লাইন ধরার মতিমে যেন খানিকটা নিচে ডাইনে একটা কাঠের আলতাই পেরিয়ে কলোনীর ভিতর ঢুকছে।

বাঁকুনি খেতে খেতে সাবধানে এগোই। এমন অন্ধকার যে মৃতের মুখের মিনিশও দেখা যায় না।

স্টেশন পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ সামনের ঝোপের ভিতর থেকে ভেসে আসে যেন মৃদুতীব্র কণ্ঠ, 'ছেড়ে দেন — আমারে ছেড়ে দেন'।

পরমুহূর্তেই ধমকানোর শব্দ। উত্তেজিত পুরুষ কণ্ঠ, 'জাল করে ফেলে যা, একদম ভয়নি না' —

আর্তনাদ একদিক পুরুষ।

আমার শরীরে হাই-ভোল্টেজের বিদ্যুৎ শিহরণ। একটাই বাঁক না নিলে চোখ সর্বনাশ হয়ে যাবে মেয়েটার।

দু'পা এগিয়েও আমকে দাঁড়াই। ওরা নিশ্চয়ই নিরস্ত্র নয়। তবে কি টিফিনের বক্সে উঠব? টিফিন ওদের যদি মেরেধরে ছুটে আসে। কিন্তু তার আগেই তো ওরা আমার —

এবার ফুফরে কান্না। কাছের চুপি আমার চুলবুল শব্দ। তার মানে মেয়েটির সমস্ত প্রতিরোধ শেষ হয়ে আসছে।

আমার মাথা ঝিমঝিম করে। হাত পা কাঁপতে থাকে। জীবনে কোনদিন এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। উঃ। অন্ধকারের দেওয়ালটাকে যদি এই মুহূর্তে হামলো যেত।

হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলক। চুটির আলোটা ক্রমে বড় হতে থাকে।

আগ শতাব্দীর লোকালের চলমান আলোর আমার চোখে ভেসে ওঠে এক অভাবিত দৃশ্যপট।

নিজেকে সাইকেল রেখে ছুটে যাই। ডিমলক পুরুষের শক্তিশালী প্রধান ট্রেনের চাকার নিচে পড়ার থেকে বাঁচিয়ে আনে কেপ্রোরা মেয়েটিকে।

ট্রেন চলে যেতে আবার জমাট অন্ধকার।

— ধন্যবাদ, এত রাতে?

মেয়েটির গলা বড় চেনা মনে হয়।

— এই বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আটকে পড়েছিলাম। কিন্তু তোমাকে চিনি —

— আমি হিমাংশু। মৌচাক ব্লকের রাইট হ্যান্ড। সঙ্গে আপনার পড়ার অনেক। নিরালী সঙ্ঘের কর্মকর্তা।

— দু'জনকেই চিনতে পেরেছি।

আমরা বীরদিন ধরে জেলা ফুটবল কোয়ার্টারের সমস্ত খবর সূত্রে একরকম বিভিন্ন ক্লাব ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমার ভালই পরিচয়।

— কি আপনার বল তো? এ কে? কৌতূহল চাপতে না পেরে ওরা বলি।

— চিনি না। আমার খাওয়া মেয়ে ক্লাবের সিঁড়িতে দাঁড়ে এসে বসেছি, দেখি ছুটি কাঁদতে কাঁদতে লাইনের দিকে ছুটছে। সন্দেহ হওয়ায় চুপি চুপি পিছু নিলাম। দেখি দু'মস্তান ওকে লাইনের উপর টানটান শুয়ে পড়তে। আমরা ট্রেন না আসলে একটু আগের ভাটিন নৈহাটি লোকালেই কাটা পড়তেন। হিমাংশু স্থিত কণ্ঠে বলে।

মেয়েটাকে ভাল করে দেখবার জন্য মোবাইল জ্বালাই। আলো দেখে মেয়েটিও নতমুখ তুলে আমাদের দিকে তাকায়।

কয়েকের আলোতেই বাসনাকে চিনতে পেরে আমি চমকে উঠি। বছর দেড়েক আগে আমার বাড়ি ঠিকে কাজ করত। ছেলে হওয়ার পর কাজ ছেড়ে দিয়েছিল।

ওর স্বামীর নাম শঙ্কর। স্টেশন বাজারে আনাজ বিক্রি করে। ওনেছিলাম আমাদের পাড়াতেই খণ্ডন সরকারের বাড়িতে ভাড়া থাকে।

বাসনাও আমাকে চিনতে পেরেছে। পা জড়িয়ে কাঁদে। 'আমারে যেন বাঁচালেন দাদাবাবু, বড় ছাড়া গতি নেই আমার।'

— লজ্জা করে না মেয়ের বয়সী মেয়ে নিয়ে আসতে? আমি বলতে উঠি।

— কি করব! আমার যে ওরা বাঁচতে দেবে না। রাতদিন বলে টেনে গলা দেও। জলে ডুবে মরো ...

বাসনার কথা গলা।

কথা না বাড়িয়ে বাসনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমুখে নেমেই। আমাদের পালাপালি মুখে আঁচল চেপে কাঁদতে কাঁদতে চলে বাসনা।

কথায় কথায় জানা হয় বাসনার বাপের বাড়ি সুন্দরবন। গাঁয়ে আপন বলতে কেউ নেই। এক মুসলমান-সম্পর্কের মামা পাঁচশো টাকা গেঁজে তাকে শহরের সঙ্গে নিয়ে নিয়ে সেই যে ফেলেছে আর দেখা নেই।

শহর ওকে ভালবাসত। খেতে পরতে দিত। কিন্তু টেলিফোনের উপর নিয়ে ওভারটাইম হবে বলে পুলিশ রাস্তার বাজারটা তুলে দিল। পার্টি থেকে নতুন যে জায়গায় বাজার বসালে, সেখানে শহরের আসরা হল না।

বাধ্য হয়ে শহর আসরা নিল এক নম্বর প্লাটফর্মের কোণে। জায়গার জন্য রেল পুলিশের সঙ্গে দৈনিক পাঁচ টাকার চুক্তি। কিন্তু নতুন জায়গায় খোরেকের কম। তিনটি প্রাণীর পেট চালানোই দায় হল।

গোল বাঁধল এমন অনটনের দিনে শহরের মা নবীবালা ছোট ছেলে বিমলের গলগ্রহতা ঘেড়ে এ সংসারে এসে পড়ায়।

ছোট্টি এক টিনতে বস্তা। তিনজনের বেশি শোবার জায়গা হয় না। তাই নবীবালাকে বারান্দায় শুতে হয়। নবীবালার শুতে ঘোর আপত্তি। ছেলে জোয়ান বৌ নিয়ে ঘরে সোহাগ করবে, আর বুড়ি মা বাইরে বসে কী পাবে — এ কোন ধর্মে লেখা আছে?

খাওয়া নিয়েও অশান্তি। বৌ ভাত বেড়ে নিলে শাশুড়ির পেট ভরে না। আবার শাশুড়ি হাঁড়ি থেকে নিজে ভাত নিয়ে খাবে। বৌ-এর তা একদম না পসন্দ।

নবীবালা বৌ-এর বিরুদ্ধে নালিশ করে ছেলের কাছে। ছেলে চুপ করে থাকে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে বিমলের কানে পরিয়ে দেবার ভয় দেখায়।

নবীবালার সমস্ত রাগ তখন বাসনার উপর গিয়ে পড়ে। বাসনাকে জব্দ করার জন্য নানান ফন্দি আঁটে।

বাড়িওলার ছোট ছেলে কাঁদু খুব রসুড়ে। বাসনার ছেলে সোপালকে কাঁদু 'চিমা' বলে ডাকে। বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে 'চিমা' বলে ডাক পাড়লেই সোপাল ... ছ ছুটে নেমে আসে। এই 'চিমা' নামটা বাসনার একেবারেই পছন্দ নয়। কাঁদুর উপর তাই মুখিয়ে ওঠে। কাঁদু মজা পেয়ে বাসনার নাম দেয় 'জয়প্রভা'।

টিভির সৌজন্যে হিন্দি ছবির নায়িকার নাম বাসনার জানা। রোজ দুপুরে পাশের বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে 'চিত্রহার' ওয়া দেখা চাই। তাই কাঁদুর এযাবের দেওয়া নামটায় ও মুখ টিপে হাসে। বেকায় কাঁদু ভাতে প্রশ্রয় পেয়ে বাসনাদির মজা বাড়ায়।

এই কাঁদুকে নিয়েই মিথ্যে কাহিনী বেঁধে সন্ধ্যেবেলা শহরের কানে বিষ ঢালে নবীবালা। বাসনার চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করে। একদিন নিজের চোখে বাসনাকে কাঁদুর সঙ্গে হাসাহাসি করতে দেখে আবার খুন চেপে যায় শহরের। ঘরে ডেকে এনে চালকলার নিয়ে পেটায়।

এরপর প্রায়ই স্বামী-শাশুড়ির কিল-চড় লাথি খেতে হয় বাসনাকে। সঙ্গে অকথ্য গালাগালি।

পাড়ার মুখে শহরকে পাওয়া যায় খদ্দের সারকারের বাড়ির সামনে। নর্দমার ধারে বসে অন্ধকারে বিড়ি টানছিল।

অনেক দিন ধরে ধরে টেনে আনে লক্ষ্মণপুরের আসরার কাছে। হিমাংশু চুলের মুঠি ধরে। তীব্রে মারতে পারলেও জন্য বৈকিয়ে চায়।

— আমার বৌয়ে আমি যা খুশি করব, তোমাদের কি? তোমরা ওরে খাওয়াও, না পরাও? শহর ফুঁসে ওঠে।

— আমাদের কি? দাঁড়া, দেখাচ্ছি — বলে হিমাংশু ছুটে গিয়ে একটা বাঁশ হাতে তুলে নেয়।

আমি কোনরকমে হিমাংশুকে ঠেকাই। সেই ফাঁকে অন্ধকার সপাটে চড় হাকড়ায়। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে যায় শহরের গালে। ঠোঁটের কষা বেয়ে রক্ত গড়ায়। ঠোঁটের রক্ত মুহূর্তে মুহূর্তে শহর হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

ছেলের কান্না শুনে বাড়ির ভিতর থেকে গাল পাড়তে পাড়তে ছুটে আসে নবীবালা। দীর্ঘ কাঠামোর শরীর। কোটরাগত চোখ। পরনে শতছিন্ন মলিন আলা। কোমরের উপর থেকে সেন্ডের ব্লাউজ অংশ পরিত্যক্ত ডিভি ফেলে সামনে ঝুঁকে পড়েছে।

বাসনাকে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে দেখে মেজাজ সপ্তমে ওঠে নবীবালার।

— নিজির সোয়ামীরে লোক দিয়ে ঘর থাওয়াতি মুক কাঁপে না? আবাগীর আমারে দিকে ঘুরে চেঁচায়, পেরীজরে বাঁচারে এইনে খুব উপকার করিছে? ইবার এ রাক্ষুসী আমারে ঘরের বাড়ি পাঠালি কিতা বাঁচাবে তনি? শালি আমারে বলে কিনা রাস্তার ভিকে করিয়ে খা।

আঁচলে চোখের জল মুছে এবার বাসনাও ফুঁসিয়ে ওঠে, বেশ করেছি, করেছি, করেছি, আবার খেয়ারীর করে ফুলবরা খাও। তোর মরণ হয় না, কানীবুড়ি!

— কেনরে ছেনালমাগী, মরণ কেন? আমারে খেইয়ে তুই জন্য পুরুষের সঙ্গে রঙ্গ করতি চাস?

— মুখ সামলে কথা বলবি বুড়ি খানকি, জিভ খসে পড়বে তোর।

এগিয়ে গিয়ে ঘুষা মেরার আগেই দু'জনের চুলোচুলি বেঁধে যায়। সঙ্গে অশ্রাব্য খিস্তি, খাপলাপাড়।

অনেক কষ্টে দু'জনকে দু'দিকে সরাই। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য তিনজনকেই বকাবকি করি। আমার তিনজনের পক্ষ নিয়ে কথা বলি। তাতে আমার নিরপেক্ষতা নিয়ে ওদের মনে কোন সন্দেহ না থাকে।

এই চালে কাজ হয়। সবকিছু ঠান্ডা করে একটা রিলেশনের পরিবেশ তৈরি করতে খুব বেগ পেতে যায়।

এক বুক আশা নিয়ে সাইকেলটা টানতে টানতে বাড়ি ফিরে দেখি ওরা সবে ঘুম থেকে উঠেছে। মনে মনে শহরের বুদ্ধিকে কলকল জানিয়ে সেবা যাবদনে ঢুকে যাই।

(২)

গরমিন নিয়েছে। আজিল থেকে বাড়ি ফিরি।

পাড়ার ছেলেরা মুখে দেখি ছেলে কোলে বাসনা দাঁড়িয়ে। মাথা নেড়ে কুশল জানিয়ে সবে ঘুপা এগিয়েছি, পিছন থেকে বাসনার ডাক, 'আবাজান'।

আমাকে থামতে হয়।

বাসনা এগিয়ে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। কথা বলে না।

— কি ব্যাপার? তাড়াতাড়ি বল। আমাকে বাড়ি ফিরেই বেরোতে হবে।

— ওরা চলে গেছে। কমলার ঠোঁট দুটো কাঁপছে থরে থরে।

— ওরা যাবে। আমি কিছু না বুঝতে পেরে প্রশ্ন করি।

— সাতটি আছে ও।

এবার ব্যাপারটা বোধগম্য হওয়ায় আশ্চর্য হই।

— তোমার মেয়ে বলে জানি।

— না। কমলা মাথা নাড়ে। তোর রাতে আমি ঘুমিয়েছিলাম। এখন আমি কি করব বলতো? কমলার বিষণ্ণ কণ্ঠ। চার মাসের মধ্যে ভাড়া যায়নি। তুমি তোমাদের ডিসপেন্স, ছেলেটার মুখে কি যে দেব _

কমলার আতঙ্কিত চোখের দিকে তাকিয়ে আমি শিউরে উঠি। স্বামী পরিত্যক্তা এই যুবতী, প্রায় বন্ধুকে আমি কি করে বাঁচাব? আমার কিছু না করলে সমাজের পাকে ও অচিরেই হারিয়ে যাবে।

কুড়িটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বলি, 'পরে দেখা করিস'।

এরপর কমলা প্রায়ই আসে। সাহায্য চায়। কাজ চায়। ছেলেকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেবার জন্যে বলে।

ব্যস্ত হয়ে আমাকে পথে নামতে হয়। পরিচিত লোকজনের বাড়ি কমলার একটা কাজের জন্য। ওদের সরকারকে বলে আমি কমলাকে যেন জোর করে তুলে না দেওয়া হয়। আমার ক্লাসের ছেলেরাও চাঁদা তুলে পাঁচজনের টাকা জোগাড় করে দেয়।

এভাবেই কেটে যায়। হঠাৎ দেখলাম হয় কমলা আর যোগাযোগ রাখছে না তো। হয়ত ওর কোন ভিত্তি হয়েছে। নয়ত কারো পাল্লায় পড়ে সাইনে নেমেছে। নেব নেব করেও আর খোঁজ নেওয়া হয় না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ করেই আমাকে মাস দুয়েকের জন্য গৌহাটি যেতে হয় অফিসের কাজে।

(৩)

গৌহাটি থেকে ফিরেছি দু'সপ্তাহ হয়ে গেছে।

সেদিন অফিস ফেরতা মত বাজারে ঢুমুরের খোঁজে বেশ কয়েকবার চক্কর মারতে হয়। কোথাও না পেয়ে নিস্প্রাণ হয়ে ফিরে আসছি। হঠাৎ শঙ্করকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ি। ওদের মর্ডার্ন শঙ্কপাতা নিয়ে বসেছে ফুটপাথ উপর মালা করে। আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত ঢুমুর ওর কাছে রয়েছে দেখে এগিয়ে যাই।

হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত ডাক, 'দাদাবাবু'। ঘাড় ফেরাতেই দেখি কমলা। এক হাতে চায়ের গেলাস, অন্য হাতে ছেলেকে টানতে টানতে আসছে।

ঢুমুর দর করতে পারব না মেপেই আধ-কিলোর মত থলের মধ্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়। দাম নিতে গেলে হাত জোড় করে। 'আপনার থেকে পয়সা নিতে পারব না'। কমলাও স্বামীর সঙ্গে গলা মেলায়।

ওদের কথাতে খুশি হই। আজকাল ক'জনই বা উপকারীর উপকার মনে রাখে।

কমলার কাছে জানতে চাই, সাতটি একসঙ্গে আছে তো?

— ডিনি দেওরের কাছে থাকেন। কমলা একটু থেমে বলে।

— তাড়িয়ে দিয়েছে? মুখটি ছেলে কমলার মুখের দিকে তাকাই।

তাড়াব কেন? কমলা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। আই পোষাল না বলেই চলে _। আপনা গলা নামিয়ে বলে, তখনকার কোন আত্মীয়ে লাগবে দেওয়া। শুধু দু'বেলা দুমুঠো দেবার কথাবলে মানতে হবে।

— পারবে এই বয়সে?

— হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে। কমলা জোরের সঙ্গে বলে। আমরা গরিব মানুষরা দাদাবাবু অনেকের অন্ন-আনেয়ারানের মতন। যতদিন শরীরে আছে, ততদিনই খেলা। কথায় বলে তো আছু খেয়।

— এখন তোমার বাসা? আমি চলার পথটাই।

— কেন? এ সপ্তাহ খুঁজেই বাড়ি। তিন মাসের ভাড়া গোণ করেছি।

যাই হোক কমলা আর শঙ্করকে নিয়তে দেখে আমি খুশি। সেদিন কমলা আত্মহত্যা করলে এ দৃশ্য কোনদিনই দেখা হত না। আমাদের অনেক সময়ে কমলাকে সাময়িক দুঃখের মুখ থেকে বাঁচিয়ে আনতে আমরা সক্ষিয় ভূমিকা নিয়া। একটা গরিব পরিবারকে চরম বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা গেছে বলে মনে মনে শ্লাঘা বোধ করি। একটাই শুধু আপশোস, নদীমাতৃকে একসঙ্গে শ্লাঘা দেখা না।

দিন দশেক পর।

কাকভোরে কলিংবেলের আওয়াজে ঘুম ভাঙে।

দরজা খুলে দেখি ওদের সরকার।

— কি ব্যাপার? আমার বিরক্তি ভরা কণ্ঠ।

— একুনি আমার বাড়ি যেতে হবে। মুখের বিকৃতি হয়।

— কি হয়েছে?

— বাড়ি আসলে জানতে পারবেন। মুখ আর খুলল না।

মানুষের উপকার করার এই হল ছাপা। নিশ্চয়ই শঙ্কর আর কমলার মধ্যে আবার লেগেছে। এখন হয়ত কাজের মাসিকেই পোষাতে হবে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াই।

আবছা আলো আঁধার। ভর-পাশ ওলসান রাস্তা। পশ্চিম আকাশে উঁকি মারছে বাঁকা চাঁদ। রাস্তাসে ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে।

নিসুম প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে বিরক্তি ভাবটা কখন যে কেটে গেছে টের পাইনি।

ওদের সরকারের বাড়ির সামনে এসে কেমন খটকা লাগে। এই কাকভোরে উপেন্দ্রনিকের বিরাট দশের বাড়ির লোক গেটের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে ওদের সরকার 'আসেন' বলে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যান।

উঠোনের দক্ষিণ ঘরে একটা ভোগ। ভোগার পশ্চিম পাড় ঘেঁষে বিছানোর মোটা একটা মাদুর। চালাটা বেশ নীচু। ঘরের দাওয়ার কাছে মাটি খোড়ে পাহাড়ে কাঁদার এক ভৌতুল গাছ। তাই অন্ধকারের মোটামোটি।

আমি মনে মনে তৈরি। আর ছড়ন না ঘাটালেও। হয় অন্ধকারে থাকলে, নয় আলো পড়া থেকে। এটাই লাস্ট ওয়ার্নিং।

ওদেরকে কখন যে এগিয়ে গেছেন খেয়াল করিনি। ঘরের দাওয়ার নিচে দাঁড়িয়ে হাত তুলে আমাকে কি যেন দেখান। লক্ষ করি ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আরো কাছে যাই। দরজার ফাঁকা দেব বলে দাওয়ার পা রেখেছি। তখনই দৃষ্টি আটকে যায় বাঁ পাশের অন্ধকারে।

আবছা থেকে আর চার পাঁচ হাত তফাতে নদীমাতৃকার কুলত শরীর। মাটি থেকে ফুটখানেক উঁচুতে দুই পা।

মুখটা ভাল করে দেখার জন্য একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়াই। কয়েকটা মুহূর্ত।

হঠাৎই আবিষ্কার — চেনে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো ছাদের দৃশ্য নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে নদীমাতৃকা।

যেন বলতে চাইছে, কমলাকে বাঁচাতে আমার যাওনি তুই —তোর জন্যই আমি _

□

"আমার কাছে মনে হয়, এই কো-আপরেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র্য হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায়।"

—কবিগুরু

সহযোগিতা আর সহমর্মিতার আশ্বাস নিয়েই ৩৪ বৎসর
এলাকার মানুষের সেবায় নিয়োজিত —

সরশুনা কন্‌জিউমার্স কো-অপারেটিভ স্টোর্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড নং : ৩৮৭/ ২৪ পরগনা (দঃ) ১৯৬৪
২২৭/১, সরকার হাট লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০৬১
ফোন : ৪৪৭ ৪৫৭৮

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু'র নিকট হইতে ১৯৯২ সালে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নিকট হইতে ১৯৯৬ সালে ক্রেতা সমবায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্তীতা।

আমাদের লক্ষ্য —

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্য মূল্যে সঠিক ওজন, সঠিক মানের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা।
৩। সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন।

জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত
সভাপতি

শ্যামলকান্তি সরকার
সম্পাদক

পুরুলিয়া কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

রাঁচি রোড, পুরুলিয়া

শাখা : পুরুলিয়া সিবা
ঐ সান্ধ্য
বালদা
বলরামপুর
রঘুনাথপুর

(ক) দূরভাষ : (০৩২৫২) - ২২২০৪
(খ) ঐ : (০৩২৫২) - ২৫২৯৮
(গ) ফ্যাক্স : (০৩২৫২) - ২৫২৯৮

শীঘ্রই আরো দুটি শাখা খোলা হবে।

- ☆ জেলার কৃষি অর্থনীতির উন্নয়নে এই ব্যাঙ্কের সক্রিয় অংশগ্রহণ, জেলার চাষিভাইদের গর্বের বিষয়।
- ☆ মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী মানুষজনের, অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে, জেলার এই সমবায় ব্যাঙ্ক, সার্বিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে।
- ☆ জনগণের নিরাপত্তায়, স্বল্প টাকার বিনিময়ে, লকারের ব্যবস্থা।
- ☆ জনগণের সুবিধার্থে, ব্যাঙ্ক-এর সান্ধ্য শাখায় বিশেষ সুবিধা।
- ☆ সব আমানতের উপর, অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চাইতে বেশি সুদ দেওয়া হয়।
- ☆ জনসাধারণের এবং অন্যান্য সব ধরনের আমানত, আমানত বিমা দ্বারা সু-রক্ষিত।
- ☆ স্বল্প সুদে, জেলার চাষিভাইদের জন্যে, স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ঋণ দেবার ব্যবস্থা এই ব্যাঙ্ক প্রতিনিয়ত করে আসছে।
- ☆ মধ্যবিত্ত মানুষজনের জন্যে, কর্মচারী ঋণদান সমবায় সমিতির মাধ্যমে, গৃহ-নির্মাণ ঋণ ও ভোগ্যদ্রব্য কেনার জন্যে ঋণের ব্যবস্থা।

— পরিচালক পর্ষদ ও কর্মচারিবৃন্দ

With
Best
Compliments
From :

Katwa-Kalna Cooperative Agriculture
&
Rural Development Bank Ltd.

UDYOG BHAWAN

K. G. Bose Sarani
P.O.- Katwa
Dist. Burdwan
Phone - 55138; STD - 03453

Madan Choudhury
CHAIRMAN

প্রবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সমবায় সমিতি

অরুণোদয় সরকার

মেদিনীপুরে একটি গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি হল এই যে মেদিনীপুরের খড়গপুর থানার খেলাড় গ্রামে অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রথম সমবায় সমিতিটি স্থাপিত হয় ও সেটি রেজিস্ট্রিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কলকাতায় রেজিস্ট্রারের (Registrar of Co-operative Credit Societies. Bengal) কাছে পাঠান হয়। এর কিছু অতিরিক্ত পরেই খুলনা জেলার (অধুনা বাংলাদেশে) রাজুলি গ্রামে গঠিত সমিতিটির কাগজপত্র রেজিস্ট্রারের হাতে পৌঁছয়। কিন্তু রাজুলি গ্রাম প্রাতঃস্মরণীয় কবীর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মভূমি হওয়ায় এবং তাঁরা এই সমিতি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আচার্যদেবের প্রতি সম্মানার্থে রাজুলি সমিতিটির রেজিস্ট্রিকরণ নম্বর হয় ১ (এক) আর খেলাড় সমিতিটির রেজিস্ট্রিকরণ নম্বর ২ (দুই) দেওয়া হয়। অবশ্য নথিপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে খেলাড় সমিতির রেজিস্ট্রেশন নং ১ (নয়) আর ২২-৬-১৯০৫। কাজেই এই সমিতির আগে আরও আটটি সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হয়েছিল। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি সমিতি দেশভাগের ফলে বর্তমান বাংলাদেশে চলে গেছে আর পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত বাকি কয়েকটি সমিতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম সমিতিটি হচ্ছে এই খেলাড় সমিতি।

এই সমিতি, আর শুধু এই সমিতি কেন, মেদিনীপুর জেলায় সমবায় আন্দোলনের প্রবর্তক স্থাপয়িতা, প্রচারক এবং ধারক ও বাহক হিসাবে প্রাতঃস্মরণীয় আর যাঁদের নাম হল মধুসূদন মিত্র ও রতিনাথ বসু। প্রথমজন ছিলেন মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলাশাসক আর দ্বিতীয়জন ছিলেন খেলাড় নিবাসী মেদিনীপুর জেলা কালেক্টরির কর্মী (Record Keeper)।

১৯০৩ সালের ২৫ মার্চ তারিখে সমবায় আইনটি চালু হওয়ার পর ঐ বছরের ২৫ অক্টোবর মিঃ ভন্ হুর পৌরসেন, আই সি এস, কমপ্লেক্সের (বিহার ও উড়িষ্যা সব) রেজিস্ট্রার (Registrar of Co-operative Credit Societies. Bengal) হিসাবে কাজে যোগ দেন। তারপর তিনি জেলায় জেলায় ঘুরে জেলা কালেক্টর ও অন্যান্য রাজপুরুষদের সহায়তা নিয়ে তাদের নির্বাচিত স্থানে সমবায় কৃষিঋণ সমিতি স্থাপনের চেষ্টা শুরু করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তখন তাঁর বিভাগীয় সহকর্মী ছিল মাত্র দু'জন কর্মিক। মেদিনীপুরের তৎকালীন কালেক্টর কর্তৃক আমন্ত্রিত এবং সমবায়ের অন্তর্নিহিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সমবায় সমিতি সংগঠনে মনোনিবেশ করেন আর এই ব্রতের সহকর্মী হিসাবে বেছে নেন ঐ কালেক্টরির কর্মী তার ঘনিষ্ঠ পরিচিত আদর্শবাদী, কর্মঠ, পরিশ্রমী, তরিষ্ঠ কর্মী রতিনাথ বসু মহাশয়কে। তাই এলাকার জন্য প্রথম বেছে নেওয়া হয় খেলাড় এলাকাকে। এরা দুজন অক্লান্ত পরিশ্রম করে খেলাড় এলাকার বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে অল্পদিনের মধ্যেই বেশ কয়েকটি সমিতি গড়ে তোলেন। ১৯০৫ সালের মে-জুন মাসের মধ্যেই কল্যাণপুর, খেলাড় ইত্যাদি গ্রামে সমিতিগুলি রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে কাজ শুরু করে দেয়। মেদিনীপুর জেলার প্রথম সমিতি 'বলরামপুর গ্রামীণ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি' নামে রেজিস্ট্রিকৃত হয় ১৯০৫ সালের ২৮ মে তারিখে। এরপর ঐ সালের ৯ জুন কীকড়া ও রামানন্দ গ্রাম দুটিতে আরও দুটি সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হল। এই সমিতিগুলির বর্তমানে অস্তিত্ব নেই।

তারপর রতিনাথ বসুর নিজ গ্রাম খেলাড় ও পার্শ্ববর্তী ১১টি গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠল খেলাড় সমিতি।

সমিতির অফিসে ও মেদিনীপুর ১নং ব্লকের সমবায় সমিতিসমূহের সহকারী রেজিস্ট্রি অফিসে খেলাড় সমিতির রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্রথম উপবিধি ইত্যাদির ফাইল মেলেনি। অবে সমিতির অফিসে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি অতি পুরাতন উপবিধি পাওয়া গেছে। অবশ্য এটিতে রেজিস্ট্রিকরণ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারের সইসাবুদ নেই। উপবিধিখানির ওপর এক অস্পষ্ট পীলাছাপ থেকে বোঝা যায় ১৯০৫ সালের ৩০ মে তারিখে সমিতি রেজিস্ট্রিকরণের কাগজপত্রাদি দাখিল করা হয়েছিল। এটি পরিমার্জিত উপবিধির অফিসিয়াল নকল, প্রাপ্তি স্বীকৃতির নিদর্শন সহকে সমিতির অফিসে (অফিস কপি হিসাবে) রাখা আছে। তৎকালে সমিতি রেজিস্ট্রেশনের যাবতীয় কাগজপত্র জেলার কালেক্টরের অফিসে জমা দিতে হত। কালেক্টার সম্ভবতঃ সিল করে কাগজপত্রাদি কলকাতার রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠিয়ে দিলে তিনি সমিতির রেজিস্ট্রিকরণ করতেন।

উক্ত উপবিধিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা হল আট। হুক ফুলস্ক্যাপ সাইজের কাগজে সভ্যদের কর্তৃক ছাপান। বাঁ দিকের চার পৃষ্ঠায় ইংরাজি আর ডানদিকের চার পৃষ্ঠায় তার অনুবাদ বাংলায় ছাপান।

সমিতিটি স্থাপনের জন্য ৪৬ জন ঐ উপবিধিতে আবেদনকারী হিসাবে স্বাক্ষর করেন। এদের মধ্যে প্রথম থেকে পরপর কয়েক ব্যক্তির নাম দেওয়া হল :

শ্রী চৌধুরী নিরীহনাথ সংপথী
পিতা ৺চৌধুরী রজনীমোহন সংপথী।
শ্রী কমলমোহন মিত্র
পিতা ৺জয়কানাথ মিত্র।
শ্রী চৌধুরী যোগেন্দ্রনাথ সংপথী
পিতা ৺চৌধুরী বিনোদনাথ সংপথী।
শ্রী চৌধুরী আশুতোষ সংপথী
পিতা ৺চৌধুরী বিজয়নাথ সংপথী।
শ্রী চৌধুরী মণীন্দ্রনাথ সংপথী
পিতা ৺চৌধুরী কৈলাসনাথ সংপথী।

উক্ত উপবিধিতে প্রথম পঞ্চায়েত কমিটির (Committee of Management) সদস্যদের নাম হিসাবে যাঁদের নিচে দেওয়া ব্যক্তিগণের নাম :

শ্রী রতিনাথ বসু, পঞ্চায়েতের প্রধান ব্যক্তি।
শ্রী কৈলাসচন্দ্র সংপথী, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী চৌধুরী আশুতোষ সংপথী, পঞ্চায়েতের সভ্য।
শ্রী গোপালচন্দ্র মান্না, পঞ্চায়েতের সভ্য।

শ্রী ব্রজকিশোর দে, পঞ্চায়েতের সভ্য।

আর আছে তিনজন 'সুপার-ভাইসরের' (Supervisor) এর নাম :

শ্রী দীনবন্ধু পাত্রাদি, সুপারভাইসর।

শ্রী ঠাকুরদাস মিত্র (ছোট), সুপারভাইসর।

শ্রী চন্দ্রমোহন মিত্র, সুপারভাইসর।

উক্ত উপবিধির মন্যাটে লেখা হয়েছে —

Registered Name - Khelar Rural Co-operative Credit Society.

Vill. : Khelar

Post : Benapur

District : Midnapur

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯০৪ সালের প্রথম সমবায় আইনের বিধান অনুযায়ী সমস্ত সমিতিকে গ্রাম্য (Rural) বা শহরাঞ্চলীয় (Urban) এই দুভাগে ভাগ করা হত আর সমিতির নামের সঙ্গে এই শ্রেণীবিভাগ লিখে রাখা আবশ্যিক ছিল।

সমিতিটি গঠিত হবার সময় থেকেই এই অঞ্চলের গ্রামগুলিতে দারুণ উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের ছাড়াও চৌধুরী শ্রী গজেন্দ্রনাথ সংপর্কী ছিলেন এই সমিতি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক। এদের নেতৃত্বে ও অন্যান্য চেষ্টায় এলাকায় নিষ্ঠ কর্মীবাহিনী তৈরি হয়। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন সর্বশ্রী রাধাগোবিন্দ দাস, সৃষ্টিধর সংপর্কী, মধুসূদন আচার্য, প্রভাকর প্রহরাজ। ফলতঃ এই সমিতিকে কেন্দ্র করে সমবায়ের ঢেউ পার্শ্ববর্তী নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি ও খড়্গপুর থানায় ছড়িয়ে পড়ে। এদের ও বলরামপুরের উৎসাহী ব্যক্তিদের চেষ্টায় খড়্গপুরে 'খেলার-বলরামপুর ইউনিয়ন লিমিটেড' নামে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গদেশের প্রথম কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ১৯০৯ সালে।

স্থাপনকালে সমিতির উদ্দেশ্য ছিল সুদযুক্ত ঋণ (loan on interest) প্রদান এবং সুদযুক্ত আমানত (deposit on interest) গ্রহণ। অবশ্য উক্ত উপবিধিতে সরাসরি সমিতির উদ্দেশ্যের উল্লেখ নেই। সম্ভবত সমিতি আইনটির নাম (Co-operative Credit Societies Act) ও সমিতির নাম, কারা ঋণ পাবেন, কি উদ্দেশ্যে ঋণ পাবেন ইত্যাদিতে উদ্দেশ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত থাকাই এর কারণ। সমিতির সভ্য নন এমন ব্যক্তি ঋণ পাবেন না একথা স্পষ্টভাবে উপবিধিতে উল্লেখিত হয়েছে। সভ্য (member) হতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির (Committee of Management) কোন অধিবেশনে আবেদন করতে হত। তাকে কমিটির পরবর্তী সভানুষ্ঠানের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত কারণ সেখানেই তার আবেদনের ওপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হত। উল্লেখযোগ্য যে বিধি অনুযায়ী সভাগণের এক-চতুর্থাংশের বেশি স্ত্রী সভাগণ প্রার্থীর সভ্য হলভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে আপত্তি করলে তিনি সভ্য হলভুক্ত হতে পারবেন না। আবেদন মঞ্জুর হলে সভ্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এক টাকা ভর্তি কি জমা দিতে হত। অবশ্য শেয়ারের (share) বা অংশগত মূলধনের (share capital) ব্যবস্থা ছিল না।

সমিতিতে প্রথম বছরেই (৩১ মার্চ, ১৯০৬ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯০৫-০৬ সাল) ১৪৮ জন সভ্য হয়েছিল। এদের কাছ থেকে ১৪৮ টাকা ভর্তি কি বাবদ পাওয়া গিয়েছিল। কাজ চালানোর প্রয়োজনীয় মূলধন হিসাবে হ্যামিল্টন সাহেবের ভাণ্ড থেকে ৩০০ টাকা ঋণ পেয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গোড়ার দিকে কাজ চালাবার মূলধন সংগৃহীত হত স্থানীয়ভাবে সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা আমানত ও রেজিস্টার কর্তৃক নেওয়া ঋণ থেকে। রেজিস্টার সহদয় রাজা, জমিদার, ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে ঋণ বা আমানত হিসাবে টাকা সংগ্রহ করতেন আর তা থেকে সমিতিগুলিকে মূলধন জোগাতেন। স্যার জ্যামিসেন হ্যামিল্টন রেজিস্টারকে শতকরা ৬ টাকা সুদে দশ টাকা দিয়েছিলেন। মিঃ জি ডি পাইন, কৈশলসোরী ভাণ্ড, জোকপাড়া ওয়ার্ড এস্টেট, বেতিয়ার রাজা, সাজনা ওয়ার্ড এস্টেট, মিশন অফিস ইত্যাদি থেকেও রেজিস্টার অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। এছাড়া ১৯০৪ সালের ২৯ এপ্রিল তারিখের ভারত সরকারের এক সিদ্ধান্তমূলে (Resolution No. 1-63 ও Land Revenue, Paragraph 26) সরকার প্রত্যেক সমিতিকে তার সভ্যদের কাছ থেকে সংগৃহীত আমানতের সমপরিমাণ (সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা) টাকা বার্ষিক কিস্তিতে (সর্বোচ্চ ২০টি) পরিশোধযোগ্য ঋণ দিতেন। তিন বছর পর্যন্ত কোন সুদ দিতে হত না। তারপর থেকে শতকরা বার্ষিক ৪ (চার) টাকা হারে সুদ দিতে হত। অবশ্য কিস্তি খেলাপ করলে খেলাপি কিস্তির ওপর শতকরা ৬ (ছয়) টাকা হারে সুদ দিতে হত (Notification No. 2446 LR dated Calcutta the 29th August, 1905)। এবছরে (১৯০৪-০৬) জন্য সরকার এখাতে ৪৫,০০০ টাকা বরাদ্দ করেছিলেন।

বছর (১৯০৪-০৬) শেষ হবার পর সমিতি ৫০০ টাকা আমানত সংগ্রহ করতে সমর্থ হওয়ায় উপরিবর্ণিত সমপরিমাণ সরকারি ঋণ পেয়েছিল। এই টাকা থেকে সমিতি হ্যামিল্টন সাহেবের ভাণ্ড থেকে পাওয়া ঋণ শোধ করে দেয়।

সমিতি যাত্রা শুরু করে প্রথম বছরে (১৯০৪-০৬) ১১০টি ঋণ দিয়ে। ঋণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ছিল ৪ (চার) টাকা আর সর্বোচ্চ ১০০ টাকা। সব ঋণই দেওয়া হয়েছিল কৃষিকাজের জন্য। বছর শেষে (৩১-৩-১৯০৬ তারিখে) ৬৮টি ঋণ পাওনা ছিল। অবশ্য এর সবটাই ছিল হাল (current) ঋণ, কোন ঋণই খেলাপি (overdue) হয়নি। ঋণের সুদের হার ছিল শতকরা বার্ষিক সাড়ে বার টাকা। প্রথম বছর সমিতির লাভ হয় ২২ টাকা ৩ আনা ৪ পাই।

সমিতির প্রথম বছর (১৯০৫-০৬) শেষে ৩১ মার্চ তারিখে উদ্বর্ত পত্র (Balance Sheet) ছিল এরকম -

দায় (Liabilities)	টাকা	আনা	পাই	সম্পত্তি (Assets)	টাকা	আনা	পাই
রিজার্ভ ফাণ্ড	১৪৮	০	০	সভ্যের কাছে পাওনা ঋণ	৭৩১	০	০
সভ্যের আমানত	৩৫২	০	০	সভ্যের কাছে পাওনা সুদ	৭	১২	৪
ধার	৩০০	০	০	হাতে নগদ মজুত	১২৮	১৪	৬
মহাজনকে দেয় সুদ	১৫	৭	৬				
মোট	৮৪৫	৭	৬	মোট	৮৬৭	১০	১০
লাভ	২২	৩	৪				
সর্বমোট	৮৬৭	১০	১০				

সমিতির কাজ চালানোর জন্য নূন্যতম তিন জন কর্মনির্বাহক কমিটির ওপর। উপবিধি অনুযায়ী কমপক্ষে পাঁচ জন সদস্য নিয়ে উক্ত কমিটি গঠিত হত। অবশ্য এই সমিতিতে ৬ (ছয়) জনকে নিয়ে প্রথম কমিটি গঠিত হয়েছিল। এদের নাম পূর্বে দেওয়া হয়েছে। কমিটির সদস্যগণ প্রতি বছর অনুষ্ঠিত সাধারণ অধিবেশনে নির্বাচিত হতেন। কমিটির সভাপতি সাধারণ সভায় নির্বাচিত হতেন। প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হতেন। এদের কাজ ছিল নতুন সভ্য নির্বাচন করা, কর্জের দরখাস্ত বিবেচনা করা, সুপারভাইসর (Supervisor)-গণের রিপোর্ট গ্রহণ করা, আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করা ইত্যাদি। আর সুপারভাইসরদের কর্তব্য ছিল সময়ে সময়ে কার্যপরিচালক কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত হিসাব পরীক্ষা করে দেখা, প্রদত্ত কর্জের উপযুক্ত হয়েছে কিনা দেখা, কর্জ গ্রহীতাদলকে টাকা দেবার সময় উপস্থিত থাকা ইত্যাদি। (পাঁচ) টাকা পর্যন্ত কর্জের জন্য একজন জামিন আর এর বেশি হলে দুজন জামিনদার দিতে হবে।

সমিতির উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা, সদস্য ও গ্রামবাসীদের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা আর প্রতিষ্ঠাতাবন্ধুর ন্যায় সুযোগ্য, দূরদর্শী, অকপটিচিত্ত পরিচালকদলের নেতৃত্বে সমিতিটি কি নীতির দিক দিয়ে, কি কর্মধারার দিক দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রগতির অভিমুখে সবেগে এগিয়ে চলে। প্রায় দোড়গোড়েই (১৯০৬-০৭) এর কর্মধারা ও সাফল্যে আকৃষ্ট হয়ে বঙ্গদেশের রেজিস্ট্রার তার বার্ষিক বিবরণীতে সানন্দে লিখলেন যে খেলার সমিতিটি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সমিতি ("Khelar Society is the best society in the province")। পরের বছর (১৯০৭-০৮) তিনি আবার লিখলেন যে খেলার এলাকার সমিতিগুলি যে কোন দেশের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সমকক্ষ ("these societies would bear comparison with similar institutions in any country)। ১৯০৯-১০ সালের বিবরণীতে তিনি পুনরায় সানন্দে উল্লেখ করলেন যে সমগ্র বঙ্গদেশে খেলার এলাকাটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এখানকার সমিতিগুলির কার্যধারা ইউরোপের সমিতিগুলির সমকক্ষ। ১৯১০-১১ সালের রেজিস্ট্রারীতে তিনি আবার খেলার সমিতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমিতি ঘোষণা করে লিখলেন যে এই সমিতি এখনও প্রথম স্থানটি নিজের দখলে রেখেছে ("Khelar society still holds the first place in the province")।

ধীরে ধীরে সমিতির কর্মধারা বহুমুখী বিস্তার লাভ করে। সস্তাসরি কৃষিকাজের খরচ যেমন বীজ কেনা, সার, লাঙল ইত্যাদির খরচ মৌসুমে ছাড়াও বলদ খরিদ, জমির উন্নয়ন, বিয়ে ও ছাত্রবৃত্তির ন্যায় সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, ঘর-বাড়ি মেরামত, অগ্নিদগ্ধজন ইত্যাদি ব্যাপারেও ঋণ দেওয়া হত। এছাড়া চড়া সুদে নেওয়া মহাজনের ঋণ শোধ করার জন্যও সমিতি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া হত। ভারত সরকার এক নীতিগত সিদ্ধান্তে জানিয়েছিলেন যে মূলত মহাজনের কবল থেকে গরিব চাষিদের বাঁচানোর জন্য সমবায় ঋণ ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়েছে। তাই চাষীর সবরকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য ঋণ না দিলে চাষী আবার মহাজনের কাছে বাধ্য হয়ে চলে আসে আর তার ফলে সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে। সস্তাসরি ঋণ দেওয়া ছাড়াও সমিতি সদস্য ও গ্রামবাসীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য ৩ (তিন) টি গোলাদারী দোকান খুলেছিল। অনেক সময় নানা কারণে দূর্ণিক্ষের সময়ের অবশ্যদারী টাকা ছাড় দেওয়া হত। দণ্ড সুদ (penal interest) ঋণ করে দেওয়া হয়। সুদের হার ১৯০৪-০৫ সালে কমিয়ে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা ১৫ আনা করা হয়। ১৯৪১-৪২ সালে আরও কমিয়ে সুদের হার ধার্য হয় ৯ টাকা ৬ আনা। এছাড়াও কিস্তি খেলাপের সময়মত ঋণ শোধ করলে শতকরা ১ টাকা ১৫ আনা হারে ছাড় (rebate) দিয়ে সাড়ে সাত টাকা হারে সুদ নেওয়া হত। অবশ্য জনহিতকর কাজেও সমিতি হাত বাড়িয়েছিল। যেমন গ্রামের ডাকঘরের লিখনের ঘর সমিতি জোগাত। গ্রামের মধ্যে ইত্যাদি স্কুলকে মাসিক ১০ টাকা করে সাহায্য দিত। পরে সেটা বাড়িয়ে মাসিক ২৫ টাকা করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকদলের পানীয় জল সরবরাহের জন্য সমিতি ঋণ দিয়ে স্কুলে নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করে দেয়। একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্রও চালাত সমিতি। গ্রামবাসীদের সমিতির ওপর এমন দৃঢ় আস্থা এসে যায় যে তারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ মকদ্দমার জন্য আদালতের দ্বারস্থ না হয়ে সমিতির কাছে আসত আর সমিতির পঞ্চায়েতদের মীমাংসার সূত্র সানন্দে মেনে নিত। এতে যেমন দুপক্ষের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হত না তেমনি আদালতের প্রভূত খরচানির হাত থেকে রেহাই পেত।

ধীরে ধীরে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মধারার বিস্তার ঘটায় সমিতির নিজস্ব অফিস ঘরের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। তখন গ্রামের বাসশীতলায় সমিতির অফিসঘরটি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কমিটির মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাব দিং বাংলা ১৩২৪ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৯১৮ সালের মে মাসে) রেজিস্ট্রি দলিলমূলে সমিতিকে জমির মালিকানা হস্তান্তরিত করে দেন। সেখানে একটা আটচালা ও একটা ছোট টিনের ঘর বানিয়ে সমিতির অফিস নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত ১৯৪২ সালের প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে অফিসঘরটিই সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে হয়ে যায়। বর্তমান দোতলা অফিস ও দোকানঘর এবং গুদামটি ৩২,০০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় ১৯৬৫ সাল নাগাদ। জায়গাটি দেন সমিতির চেয়ারম্যান ও সমিতির প্রতিষ্ঠাতা এবং খেলার সমবায় আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রবিনাথ বসুর বংশোদ্ভূত অজিতকুমার বসু আর সরকার দিয়েছিল ১০,০০০ টাকা, তার মধ্যে ৭,৫০০ টাকা ঋণ আর বাকিটা অনুদান।

১৯১২ সালে নতুন সমবায় আইন (Co-operative Societies Act, 1912) চালু হবার পর সমিতির উপবিধি সম্পূর্ণ সংশোধিত হয় ১৩-১১-১৯১৩ তারিখে। এই সময় সমিতির নাম কিছুটা বদল করে করা হয় "খেলার গ্রাম্য সমিতি"। আর উপবিধির শুরুতে বলা হয় "সমবেতভাবে কার্য করিয়া এবং স্বাবলম্বন ও মিতব্যয়িতার উপায় দিয়া সভ্যদিগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা এই সমাজের উদ্দেশ্য"। সমিতির এলাকার ১১টি কলনে চতুঃপার্শ্ববর্তী ১৮টি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১-৪-১৯৬৩ সালে সমিতি আবারও নাম পরিবর্তন করে বর্তমান নাম "খেলার গ্রাম্য সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি লিমিটেড" গ্রহণ করে। ১৯১৩ সালের সংশোধিত উপবিধিতে বলা হয় যে কার্যনির্বাহক কমিটি (পঞ্চায়েত) অন্যূন ৫ এবং অনধিক ৯ জন সভ্য নিয়ে গঠিত হবে। বর্তমানে ঐ কমিটিতে সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত মাত্র জন, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের এক জন প্রতিনিধি ও পঞ্চায়েতের একজন প্রতিনিধি রয়েছেন। সমিতির কার্যনির্বাহের একটি সমিতি তৈরি করা হয়

বছর	সদস্য সংখ্যা	অংশগত মূলধন (টাকা)	কার্যকরী মূলধন (টাকা)	সঞ্চয়ের নিকট পাওনা (টাকা)	অনাদায়ী ঋণ (টাকা)	লাভ (+) ক্ষতি (-) (টাকা)
১৯৩৫-৩৬	২৭৯		৩০,৪০৭			+ ৪৭৫
১৯৩৬-৩৭	২৬৭		৩১,৭১৮			+ ১,০১১
১৯৩৭-৩৮	২৫৮		৩২,৬৬৮			+ ১০১৮
১৯৩৮-৩৯	২৫৯					+ ৬২২
১৯৪৪-৪৫	২২০	২,৯১৪ ..	৩৪,১৮৬	৩৫,৫০৯	১৪৪	+ ১,০১৬
১৯৫৫-৫৬	২২২	২,৯৫০	৩০,৪৬৮	৩২,৭৪০	১৪৪	+ ১,৯৫০
১৯৫৬-৫৭	২৩০	৩,১৭১	২৯,৫৪৮	৩৩,০১৮	১৪৪	+ ১,৫৬৮

ব্যক্তির জীবনের ন্যায় সমবায় বা প্রতিষ্ঠানের সুদীর্ঘ জীবনেও উত্থান-পতন আছে।

গৃহবিবাদ, অন্তর্কলহ, মকদ্দমা প্রতিহিংসা ইত্যাদি বলে ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে থেকে চল্লিশের দশকের শেষভাগ অবধি সমিতিকে যথেষ্ট দুঃসময় ভিত্রে যেতে হয়। অবশ্যই পুনরায় অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে।

বাংলা ১৩২৬ সালের ১২ আষাঢ় (ইং ১৯১৭ সালের জুন মাসে) অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে একজন সভ্যকে ১,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হবে, অবশ্য স্থানীয় জমিদারবাবুকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া বর্তমানে সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে ১৫,০০০ টাকা মধ্যমেয়াদি ঋণ দান করা হয়ে থাকে।

বেণু কিস্কুকিন আগে সমিতির অফিসে চাকরি (৭২ বছরের) সদস্য আন্তনের দাস বলেন যে তার বাবা মারা যাওয়ার পর মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি বাবার নোমিনি (nominee) হিসাবে সমিতির সদস্যভুক্ত হন। তিনি বলেন যে সমিতিতে গোড়ার দিকে ঋণ দেওয়া হত ৫ টাকা করে, অবশ্য যাদের বেশি জমি আছে তারা হয়ত আরও ঋণ পেতেন। তখন ঋণের জন্য জমি বন্ধক দিতে হত না। ১৯৪০-৪১ সাল নাগাদ জমি বন্ধক দেওয়া শুরু হয়। সাধারণত আষাঢ় অর্থাৎ ফসলই ঋণে কৃষির পর ঋণ দেওয়া হত। আদায়ের সময়ে একসঙ্গে সমস্ত সদস্যকে ঋণ দেওয়া হত ৮ মাস ঋণ শোধ করে দিতে হবে। প্রায় সকলেই সময়মত ঋণ শোধ দিয়ে দিত। তিনি আরও বলেন যে ১৯৬৯-৭০ সাল থেকে ঋণ আদায় কমতে থাকে। ধীরে ধীরে অনাদায়ী ঋণের বোঝা বাড়তে শুরু করে। আর এর ফলশ্রুতিতে সভ্যদের কাছে পাওনা ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে সমিতির দেনার মধ্যে ফারাক (imbalance) বাড়তে থাকে। ৩১-১২-৮১ তারিখে সদস্যদের কাছে আসল বাবদ পাওনা ছিল ৩,৫৬,০৮৮ টাকা আর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কাছে আসল বাবদ দেনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ৭,১৬,০০০ টাকা। অবশেষে ১৯৯০ সালে এল কেন্দ্রীয় সমবায়ের ঋণ মকুব প্রকল্প। বকেয়া অনাদায়ী ঋণ মকুব হল ২,৭০,৮১২ টাকা। ঐ টাকা দিয়ে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের দেনা শোধ (adjust) করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ঐ টাকা থেকে আগে তার পাওনা সম্পূর্ণ সুদ কেটে নিয়ে অবিষ্ট সমিতির দেনার আসলে ওরাদিল দেয়।

সমিতির এলাকায় জনসংখ্যা ১১,০১৮ জন। এর মধ্যে কৃষক পরিবারের সংখ্যা ১০১৯ জন। আরও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবার ৫৮৩টি, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক পরিবার ২২৩টি, অন্যান্য কৃষক পরিবার ৫২টি আর অকৃষক পরিবারের সংখ্যা হল ১৫৮। ৩১-৩-১৬ তারিখে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০১৯। অর্থাৎ এলাকার প্রত্যেক পরিবারই সমিতির সদস্য।

সমিতির কাজ চলবার প্রয়োজনীয় মূলধন সংগৃহীত হয় শেয়ার, আমানত ও ঋণ নিয়ে। স্থাপনাকালে সমিতিতে শেয়ার বা অংশগত মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল না। কৃষির দশকের শুরুর দিকে থেকে শেয়ার প্রথা চালু হয়। ৩১-৩-১৯৯৫ তারিখে সমিতির মোট অংশগত মূলধন (share capital) ৮২,৪৮০ টাকায় মধ্যে সদস্যদের দেওয়া শেয়ারের পরিমাণ ছিল ২৯,০০০ টাকা। বিগত কয়েক বছরের আমানতের চিত্র নীচে দেওয়া হল :

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বছর	বছরশেষে আমানতের পরিমাণ		মোট	আমানত কার্যকরী মূলধনের কত শতাংশ
	সভ্যদের কাছ থেকে	সভ্য নন এমন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে		
১৯৮৬-৮৭	৯.৩	১৫.৪	২৪.৭	৩
১৯৮৭-৮৮	৯.৮	১৪.৩	২৪.১	৩
১৯৮৮-৮৯	৬.১	১২.৩	১৮.৪	২
১৯৮৯-৯০	১২.৬	১২.১	২৪.৭	৩
১৯৯০-৯১	৫.৭	১৮.৬	২৪.৩	৩
১৯৯১-৯২	৫.৬	১৭.১	২২.৭	৩
১৯৯২-৯৩	৮.২	১৫.৬	২৩.৮	৩
১৯৯৩-৯৪	★	★	১৫১.৭	১৭
১৯৯৪-৯৫	★	★	২৪৬.০	২২
১৯৯৫-৯৬		★	৩৬৬.৪	২৯

★ আলাদাভাবে হিসাব রাখা হয়নি

আগের সমীক্ষা থেকে এটা প্রকট যে আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে সমিতির দৈনন্দিন ও কৈশোরের গৌরবময় ঐতিহ্য অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ফলে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমানত বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৯০ সালের ১৫ আগস্ট থেকে তিনি স্কীমের চালু করেছে। আর এতে বেশ ফলিতও সূচনাও হয়েছে। তবু এখনও কার্যকরী মূলধনের প্রায় তিন-চতুর্থাংশই আসছে ঋণের মাধ্যমে। সমিতিকে তাই বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ওপর মারাত্মকভাবে নির্ভর করতে হচ্ছে। এ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচে দেওয়া হল।

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বছর	ঋণ গ্রহণ (টাকা)	ঋণ পরিশোধ (টাকা)	বছরান্তে বকেয়া (টাকা)	বছরান্তে বকেয়ার মধ্যে খেলাপি (টাকা)	খেলাপির হার (%)
১৯৮৬-৮৭	১৭৬.০	১০৭.৩	৭২৮.৮	৫৫২.০	৭৫
১৯৮৭-৮৮	১৩৪.৬	১৩১.৮	৭৩১.৬	৫৯২.০	৮৯
১৯৮৮-৮৯	১৩৬.৭	১১১.০	৭৪৭.৩	৬২০.০	৮২
১৯৮৯-৯০	৫০.০	—	৮০৭.৩	৭৫৭.৩	৯৪
১৯৯০-৯১	—	১৭০.০	৬৩৭.৩	৬৩৭.৩	১০০
১৯৯১-৯২	—	৮.০	৬২৯.৩	৬২৯.৩	১০০
১৯৯২-৯৩	১৫৬.৩	১০৬.২	৬৪৯.৪	৪৮২.০	৭৪
১৯৯৩-৯৪	২০১.৪	২৪৬.০	৬০৪.৮	২৫৭.৪	৩৩
১৯৯৪-৯৫	৪৭৪.০	৩২৭.৮	৭৫১.০	২৬৬.০	৩৫
১৯৯৫-৯৬	৭২২.০	৫১৭.৯	৯৫৫.১	২৩৩.০	২৪

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের ঋণ বেড়ের নৈরাশ্যজনক চিত্রের কারণ হল, ঋণী সদস্যদের কাছ থেকে ঠিকমত আদায় না হওয়া। এ বিষয়ের চিত্র নিচে দেওয়া হল।

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বছর	বছরশেষে ঋণ দাবী (টাকা)	ঋণ আদায়ের দাবি (Demand) (টাকা)	আদায় (collection) (টাকা)	বছরান্তে বকেয়া (Balance) (টাকা)	আদায়ের হার (%)
১৯৮৬-৮৭	১৬৬.০০	৪০২.৭০	১৭৭.৮০	৩৯১.২০	৪৪
১৯৮৭-৮৮	১৩২.০০	৫২০.২০	১৭৭.৫০	৩৪৫.৭০	৩৩
১৯৮৮-৮৯	১৩৪.৫০	৪৮০.২০	১৬৬.১০	৩০৪.১০	৩৫
১৯৮৯-৯০	৫০.০০	৩৮৪.১০	৯.৮০	৩৭৪.০০	৩
১৯৯০-৯১	—	৩৭৪.০০	১৫৮.৬০	২১৫.৭০	৪৫
১৯৯১-৯২	—	২১৫.৭০	৮৯.১০	১২৫.৮০	৪৬
১৯৯২-৯৩	১৩৬.৫০	২৬২.৩০	১৬৪.১০	৯৮.২০	৬৪
১৯৯৩-৯৪	২০০.৯০	২৯৯.১০	২৭০.৫০	২৮.৬০	৯০
১৯৯৪-৯৫	৪৭৬.১০	৫০৪.৭০	৩৫৬.৭০	১৪৮.০০	৭১
১৯৯৫-৯৬	৭২২.১০	৮৭০.১০	৫৪৪.০০	৩২৬.১০	৬৩

আদায়ের চূড়ান্ত অবনতি ঘটল ১৯৮৯-৯০ সালে। এই নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান এখনে নিষ্প্রয়োজন। এটা অবশ্যই সর্বজনবিদিত সমস্যা। কেন্দ্রীয় সমবায়ের ঋণ মকুব প্রকল্প এর সামান্য কিছু করে। তবু ঋণ সময়মত শোধ করার প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য তো সদস্যদেরই। ফলে বেশ কিছুটা উন্নতি দেখা যাচ্ছে। অবস্থার আরও উন্নতি ঘটানোর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে সদস্যদের।

সমিতির ঋণী সদস্যদের কাছ থেকে পঞ্চমী ও ব্যাংকের কাছে দেনার মধ্যে ফারাক ৩১-৩-৯৫ তারিখে ছিল ৬,১২,৬৯০ টাকা। এটা নিশ্চিতই এক বিপজ্জনক অবস্থা। শতবর্ষের ঐতিহ্যের উপনীত মহান ঐতিহ্যবাহী এই সমিতিকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য সমিতি সব পক্ষেরই বিশেষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। বিদ্যাসাগর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক কি এই ফারাকের সবটা না হলেও কিছু অংশ মকুব করে দিতে পারেন না? রাজ্য সমবায় ব্যাংক কি এই সমিতিকে বাঁচানোর জন্য বিশেষ সাহায্য হিসাবে বাকি টাকা দিতে পারেন না? রাজ্য সরকারও অবশ্য একটি বিশেষ এবং মহৎ উদ্দেশ্যমূলক ক্ষেত্র হিসাবে বিশেষ সাহায্য মঞ্জুর করতে পারেন না এই ফারাক মিটিয়ে দেওয়ার জন্য!

ঋণ ব্যবস্থা ছাড়াও সমিতি অন্যান্য অনেক কাজকর্মও করে। এই কাজের একটা সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেওয়া হল।

পূর্ণাঙ্গরূপ না হলেও একথা উল্লেখ রাখা প্রয়োজন যে বাস্তবক্ষেত্রে সমিতির ঘরে এক বিরাট অঙ্কের পুঞ্জিভূত লোকসানের বোঝা চেপে রয়েছে।

সমিতির পাঁচজনের কর্মীবাহিনী সমিতির কাজে সততা সহকারে। এদের নেতৃত্বে আছেন অভিজ্ঞ ও কর্মঠ সচিবেজনা ঘোষবিহারী দাস।

সমিতিটি বর্তমানে চূড়ান্তই বহুর পদার্পণ করেছে। তবু পরিসরে এই সুদীর্ঘ জীবনের পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। আশা করি সমিতি সহজেই শতবর্ষ উদ্‌যাপন করবে। একটি সমিতির জীবনে এটা মহাগৌরবের ও শ্লাঘার বিষয়, একটি দুর্লভ সম্মান। পরিচালকগণ, কর্মীগণ, সদস্যগণ এবং

(টাকার অঙ্ক হাজারে)

বছর	সদস্য জমা (লক্ষ টাকা)	সদস্য বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	মোকদ্দমা বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	অন্যান্য জব্য বিক্রয় (লক্ষ টাকা)	মোট বিক্রয় (লক্ষ টাকা)
১৯৯০-৯১	—	—	২.৬০	—	২.৬০
১৯৯১-৯২	৬.২৭	৬.০৬	২.৪৬	—	৮.৮২
১৯৯২-৯৩	৩.৭৮	৩.৮১	৩.৩৭	—	৭.১৮
১৯৯৩-৯৪	১.৬৯	১.৩৩	৪.৮২	—	৫.১৫
১৯৯৪-৯৫	১৫.০৮	১৫.০৮	৩.৫৭	০.৩২	১৯.২৭
১৯৯৫-৯৬	৮.২১	৮.৫৪	৪.০৩	০.৯৬	১৩.৫৩

এলাকার সমস্ত গ্রামবাসী তথা সমবায়ের প্রতিষ্ঠান, এজেন্সির ও সমস্ত জনগণের অনন্য সৌজন্যে এবং এই সমিতিকে জন, উৎসাহ, পৃষ্ঠপোষকতা ও সমিতি কর্মপ্রচেষ্টায় তাদের আন্তরিক সহযোগিতা দিয়ে বিনিময়ে নিয়ে আসেন, পূর্ব মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এই আশা রাখি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

(১) বিবেকানন্দ মুখ ও সোসাইটির সদস্য - সমবায়ের ক্ষেত্রে সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির

(২) অনিমেষ চৌধুরী, বিশ্বজিৎকুমার আইচ ও অর্ণবকুমার বসু, সমবায় রেজিস্ট্রার অফিস এর ক্ষেত্রে সমবায় বিভাগ অফিসবৃন্দকে।

(৩) ৩০ মার্চ, ১৯৫৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সমিতির সাধারণসভার বিবরণের পুস্তিকা।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগার (The National Library)।

(৫) Annual Report on the working of Co-operative Societies in Bengal for the years from 1904-05 to 1911-12.

(৬) West Bengal State Archives.

□

সারণীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছায়

কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সমবায়ী ব্যাঙ্কিং সমবায়

কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি নং - ১৩

গ্রাম ও পোঃ - বুধীয়া

ইংরেজবাজার ব্লক

মালদা

আব্দুল সত্তার	সহ সম্পাদক	জমিরুদ্দিন আহমেদ
সভাপতি		সম্পাদক

গোপগন্তার ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

পোঃ - গোপগন্তার ★ জেলা - বর্ধমান

রেজিঃ নং - ৪০ ★ তাং - ১২/২/১৯৪৯

পিছিয়ে পড়া মানুষদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্ত করতে দৃঢ় পদক্ষেপে
এগিয়ে চলেছে আমাদের সমবায়।

জনসাধারণের জন্য আমাদের প্রকল্পসমূহ -

গো স্বল্প সুদে সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষি ও ঋণ দেওয়া হয়।

প সকল প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ও খইল বিক্রয় করা হয়।

গ সকল প্রকার বস্ত্র, কন্ট্রোল, নন্-কন্ট্রোল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।

ন্তা সমিতির নিজস্ব ট্রাক্টর দিয়ে কম খরচে চাষিদের জমি কর্ষণ করা হয়।

র সমিতির এলাকায় বিভিন্ন মৌজায় ৩২টি মিনি ডিপ-টিউবওয়েল সেচের কাজে নিয়োজিত।

ইউ পিতল কাঁসার দ্রব্য অল্প সুদে বন্ধক নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

সি **আমানত প্রকল্প**

এ সেভিংস - টাইম-ডিপোজিট — ফিক্সড-ডিপোজিট — রেকারিং-ডিপোজিট।

সি আমাদের সমিতিতে সুদের হার অন্য যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি।

এস *ওরে নিপীড়িত ওরে ভয়ে ভীত*

লিঃ *শিখে যা আয়রে আয়।*

দুঃখ জয়ের নীবন মন্ত্র সমবায় — সমবায়।

নিমাইচরণ দে	তারকনাথ দত্ত	ভবানীপ্রসাদ ঘোষ
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন ঃ

Burdwan Co-operative Agriculture & Rural Developement Bank Ltd.

Old Court Compound
P.O. & Dist.-Burdwan

বর্ধমান জেলার কৃষকভাইদের সেবায় সতত নিয়োজিত
একমাত্র প্রাচীনতম সমবায় দীর্ঘমেয়াদি সমবায় প্রতিষ্ঠান

বর্ধমান কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

শাখা অফিস ঃ ১) সেহারাবাজার, বর্ধমান
২) ১নং এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (ব্রিতল), দুর্গাপুর, বর্ধমান

অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি কিস্তিতে কৃষি, অকৃষি, গৃহনির্মাণ ও সেবামূলক উদ্যোগে ঋণ দানের একমাত্র সমবায় প্রতিষ্ঠান।

এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য জাতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে সঞ্চয়ী আমানত, স্থায়ী আমানত, স্বল্পমেয়াদি জমা প্রকল্প চালু আছে।
তাই এই ব্যাঙ্ক প্রকল্পগুলিকে মজবুত করতে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি।

বিশদ বিবরণের জন্য হেড অফিস, শাখা অফিসগুলি ও ব্লক সুপারভাইজারদের সহিত সত্বরই যোগাযোগ করুন।

বিঃ দ্রঃ – ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা আছে।

সুকুমার সিন্হা
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

গণাধর পাল
সভাপতি

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি-৭১২ ১০১
(দূরালাপন ঃ ৫০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক-হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সমবায় শাখা সংখ্যা	অংশমূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	নিট লাভ/ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৬	৪৫১	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৩৩.৪৮	(-) ০.৪১
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০৩		১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(+) ২০-৩০
৩১-৩-৯৭	১০৯১	১১৭	১৪	২৫৮.০২	৬৭০২.২৫	৩৯০৪.৫৯	(-) ১০৬.৮০

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর, হরিপাল, সিংগুর ও চণ্ডীতলা শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহনির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। এছাড়া, এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের প্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মৃণালকান্তি ঘোষ
সহ-সভাপতি

মণীন্দ্রনাথ জানা
সভাপতি

With Best Compliments Of :

THE SHIPPING CORPORATION CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"SHIPPING HOUSE"

13, STRAND ROAD, CALCUTTA - 700 001

ENJOY OUR HOLIDAY HOME AT PURI, DARJEELING

তমলুক কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

পোঃ তমলুক

জেলা ঃ মেদিনীপুর

ফোন নং ৬৬৪৯৮, ৬৬০১১

শাখা অফিস ঃ

পাঁশকুড়া, নন্দীগ্রাম, মহনা

আমাদের যে কোনটিতে আপনার হিসাবটি খুলুন এবং এলাকার সেবা নিন

- যে কোন কৃষিক্ষেত্রে পানচাষ, ফুলচাষ, মাছচাষ ও পাওয়ার টিলার / ট্রাক্টর ও কৃষিজাত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ঋণ দেওয়া হয়।
- মালবাহী ট্রাক, ট্রেকার, প্রাইভেট ট্যাক্সি ও কৃষিশিল্পে ঋণ দেওয়া হইতেছে।
- গৃহনির্মাণ ও পুরাতন গৃহসংস্কার প্রকল্পে ঋণদান করা হইবে।

বিকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
সি ই ও

যোগেশচন্দ্র মাইতি
চেয়ারম্যান

"আশ্বিনে বেণু বাজিল ওপারে বনের ছায়ে"

পুজো তো এসে গেল। কী ভাবছেন ? বাইরে বেড়াতে যাবেন ? কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার দূরপাল্লা রুটের সার্ভিসে আসুন ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন। আমাদের বাসে গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে পুজোর ছুটি কাটিয়ে আসুন।

দিঘা, বিষ্ণুপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, মুকুটমণিপুর (ত্রৈমাসিকালীন সার্ভিস), তারাপীঠ, পলাশি, বহরমপুর, কলাচা, উদয়নারায়ণ, পুরুলিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, কাঁকড়াঝোর, মায়াপুর, কাকদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, রামকৃষ্ণমিশন, বাসন্তী, রামসুন্দরহাট, হাজারদুয়ারী, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরী, শান্তিপুর, কুলিয়া, রাজবাড়ীর, দিঘা (ত্রৈমাসিকালীন সার্ভিস), বাঁকুড়া, খাতড়া, মাচাপুর, শিলিগুড়ি, পূর্ণিয়া, মালদা, রায়গঞ্জ, কালুরঘাট, বীরসিংহে, বিলিবিলি (বাঁকুড়া), রাধানগর (হাবলী), চন্দনেশ্বর (উড়িষ্যা)।

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার বাস সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান :
দূরপাল্লার বাস স্টেশন :
এসপ্লানেড কোন নং - ২৪৮-১৯১৬
দিঘা বুকিং অফিস
কোন নং - ৬৬-২১৭

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা

৪৫, গণেশচন্দ্র এভিনিউ
কলিকাতা - ৭০০ ০১৩

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

STATE GOVERNMENT EMPLOYEES' CONSUMERS CO-OPERATIVE STORES LTD.

OFFICE STATIONERY & GENERAL ORDER SUPPLIER

COURT COMPOUND :: BURDWAN
REGISTRATION NO - 111 OF 73/74
PHONE : 63331

With

Best

Compliments from

THE SANTRAGACHI CO-OPERATIVE BANK LTD.

REGISTERED UNDER ACT. 11 OF 1912

ESTD-1931

KONA ROAD, SASTITALA, SANTRAGACHI, HOWRAH - 711 104

A FULL LICENSED URBAN BANK BY RESERVE BANK OF INDIA

Branch at Buxarah (opposite Buxarah High School)

SAILIENT FEATURES

- Deposits are covered by deposit Insurance Scheme
- Attractive Deposit Scheme with higher rate of interest than Commercial and Nationalised Banks.
- One of the leading Co-operative Banks in Howrah District.
- Safe Deposit Locker facility is available.
- Holiday Home at Puri & Digha

'চর্মজ'

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট লেদার ইণ্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি সংস্থা)

নিজতলা (পঞ্চমতল)

২ এবং ৩, ব্লাক বার্ণ লেন

কলিকাতা - ৭০০ ০১২

'চর্মজ'র জিনিস বানানোর কারিগরী দক্ষতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সুলভে ও ওপযুক্তমানে চামড়ার জুতো, ব্যাগ এবং অন্যান্য বস্তুসামগ্রী পাওয়া যায় 'চর্মজ'তে।

চাকুরিয়ার দক্ষিণাপণ, গড়িয়াহাট মার্কেটের জিতল, কলেজ স্ট্রিট (প্রেস সিনেমার পাশে), হাওড়া সাবওয়ে এবং শ্যামনগর স্টেশনের পাশে আছে 'চর্মজ'-র নিজস্ব শো-রুম

'চর্মজ' তার অসংখ্য ওপগ্রাহী ক্রেতা পৃষ্ঠপোষকদের জন্য বাজারে হাজির করেছে বৈচিত্র্যময় বিভিন্ন বস্তু সম্ভার।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ

দি সম-হিতিকা সমবায় বিপণি লিমিটেড

রেজি নং ১ ৪- এইচ বি /১৯৬৯
১২, শরৎচন্দ্র রোড, আলমবাজার
কলিকাতা, পিন - ৭১২ ২০২

গ্রাহকদের সেবায় - রেশন, ভোগ্যপণ্য, বস্ত্র, দুগ্ধ ও কেরোসিন তৈল বিপণন।

Space Donated by

HASAMPURIA TRADING COMPANY
12 No Lock Gate Road
Sodaghar Patty, Calcutta - 2

Wholesellers and Retailers of Cattle feed)

Phone No.: 557 - 8312 (0)
244 - 3872 (0)
246 - 0422 (R)

With Best Compliments from

B. S. ENTERPRISES

Calcutta

Space Donated by

United Engineers' Co-operative Society Ltd.
Regn. No. 30 of Dec. 71
Kadamtala, Jalpaiguri

CPWD, PWD & I & WD Contractors

ভ্রমণ

মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ

নবকুমার ঘোষাল

শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করলেন। সমুদ্র সমস্ত দ্বারকাপুরী গ্রাস করে ফেলল। যুক্ত পৌত্র উষার শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে চলে গেলেন হিমালয়ের নারায়ণ তীর্থে। সেখানে শান্তি পেলেন। তাই নারায়ণ তীর্থ শান্তির নীড়। গয়োয়ালের ঘাঁটীনাথ এইরকম এক নারায়ণ তীর্থ। আর এক নারায়ণ তীর্থ হল নেপালের মুক্তিনাথ।

মুক্তি পর্বতের মরকাঞ্চনে ব্রহ্মা অনেক উপর আকাশকে ভেদ করে যোর তপস্যা শুরু করলেন। সেই আকাশে হোম করলেন চার শিখা করে। যদিও জল আর আকাশের মধ্যে নিকটসম্পর্ক, তবুও সেদিন থেকে জল সেখানে এক দেহে লীন হয়ে আছে। বিমল আকাশ জল, আর কমলের মূর্তি আকাশ — একই আকাশের দু'জনকে আহ্বান জানিয়ে যি নেপালো ঘীর শিখা হোম করলেন ব্রহ্মা। এই যজ্ঞানুষ্ঠানে জল, কর্ম ও উপাসনা — এই তিন রকম অনুষ্ঠানই স্বীকৃতি পায়। জগতের সর্বপ্রকারের মুক্তির জন্য ব্রহ্মা এই যজ্ঞ করেন ; তাই পুণ্যভূমির নাম হল মুক্তিক্ষেত্র। এখানেই শঙ্কর আহ্বান আকাশরূপে, বিষ্ণু জলের আকারে অবৃত হয়ে আর ব্রহ্মা আছেন হোমরূপে। মুক্তিকামী মানুষ তাই ছুটে যায় এই মুক্তিনাথে।

এই মুক্তিক্ষেত্র বা মুক্তিনাথ নেপালের উত্তর সীমান্তে। বিষ্ণুতীর্থের অন্যতম তীর্থ। কিন্তু পথ বড় দুর্গম। খুব কম যাত্রীই এই তীর্থে পৌঁছতে পারে। প্রচণ্ড মনোবল আর পাহাড়ে চড়ার অদম্য উৎসাহ থাকলে আপনিও পৌঁছতে পারেন মুক্তিনাথে।

ভারত-নেপাল সীমান্ত সোনৌলি। সেখান থেকে বাসে চেপে সিদ্ধার্থ রাজমার্গ ধরে পোখরা পৌঁছলাম। ১৮০ কিলোমিটারের লম্বা এই রাজপথটি ভারত ও নেপাল সরকারের সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে। পথটি খুব সুন্দর। নবডাঙ্গা থেকে মহাপুন্ডুরে ও অন্নপূর্ণা গিরিশিখর হাতছানি দেয়। তারপর ত্রিশুলের গিরেই পোখরার উপত্যকাভূমি শুরু হয়েছে। পথে পড়ল কেওরা হ্রদ। নেপালের বৃহত্তম হ্রদ। বিদেশি পর্যটকরা এর খুব প্রশংসা করেছেন। এখানে ট্রাউট মাছের চাষ হয়। পর্যটকরা নৌবিহার করেন।

পোখরা এয়ার স্ট্রিপের কাছে এসে বাস থেমে গেল। তখন সকাল দশটা। বেশ রোদ উঠেছে। সামনেই দেখা দেল মহাপুন্ডুরের উন্নতি শিখর (২৩,০০০ ফুট) ; যা পথে আসতে আসতে দেখেছি। এখন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। তার পাশে অন্নপূর্ণা গিরিশিখর কখনও ঢেঁকা ঢেঁকা মেঘের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছে, আবার কখনও মেঘের আড়াল সরিয়ে হাসিতে মেতে পড়ছে। বাস থেকে নেমেই এই নান্দনিক দৃশ্য দেখে মনকে শীতলতার কথা। আমরাও কিছুক্ষণ মনকে শীতিয়েছিলাম।

পোখরার সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কোনও এক বিদেশি পর্যটকের একটা কথা মনে পড়ছিল। " Pokhara in the West possibly the most dramatically sited air strip in the world — with the 23,000 feet fishtail mountain called Macha Puchare towering over the rutted landing ground." পোখরার এই নিসর্গ সৌন্দর্যের জন্যে একে বলা হয়েছে The Switzerland of the East.

এয়ার স্ট্রিপ থেকে দু'মাইল দূরে মহেন্দ্রপুল। পৌঁছতে আরও কিছু সময় লাগল। মহেন্দ্রপুল পোখরা শহরের প্রাণকেন্দ্র। পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ফেউতানদী। হোটেল, রেস্তোরাঁ, দোকান, ব্যাঙ্কসমূহ, সেনানিবাস — সবই এখান থেকে শুরু হয়েছে। এখানকার কয়লাগিরি হোটেলে আমাদের থাকার জায়গা হল। ফ্রিশিনপর ফ্রেশ হওয়া ও ফুলি খেয়ে ক্লান্তি দূর করতে আরও ঘণ্টা তিন পোখরার রোডে গেলাম। তৃতীয় দিন সকালে মুক্তিনাথের পথে যাত্রা শুরু হল। আজকে কলমল, পরিষ্কার সকাল। পোখরা শহর যেন জেগে উঠেছে। দোকানপাট সব খুলে গেছে। সার বেঁধে আমরা হাঁটতে লাগলাম। ফুলি ও গাইড চলল পেছন পেছন। পোখরা শহর পেরিয়ে গেলাম। গ্রাম এসে পড়ল। গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ। গ্রাম শেষ হতে পড়ল বিস্তীর্ণ চষা জমি। এ জমির যেন আর শেষ নেই। কোথাও আবার ফ্রেঞ্চ আলো করে আছে সোনালি ফসল। তার ভেতর দিয়ে সরু পায়ে চলা পথ। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের সারি। বিদেশি অভিযাত্রীদের পথে দেখা গেল। তারা জোমসোম পর্যন্ত যাবে। তাদের মুক্তিনাথ যাবার অনুমতি নেই।

● মুক্তিনাথ অন্নপূর্ণা গিরিশ্রেণী আলোকচিত্র : লেখক

সমতল পথ শেষ হয়ে গেল। একটু সামনে পড়ল একটা পাহাড়ি নদী। নদী পেরিয়ে ওপারে গেলাম। এর আগে পোখরার ফেউতানদী পার হয়ে এসেছি। নদী পার হতেই চড়াই শুরু হল। সামনিনে প্রায় ১৩ কিমি পথ হাঁটা হয়েছে। এখনও ৩ কিমি চড়াই ভাঙতে হবে। আজকের পথচলার এটাই প্রথম চড়াই। সঙ্গীসাথীরা সব এক এক করে এসে পড়ল। চড়াই ভেঙে সন্ধের একটু আগে পৌঁছলাম নৌনদা। এখানে আমাদের রাত্রিবাস হবে। আগেই বলা রয়েছে, মুক্তিনাথ পথযাত্রার প্রত্যেকটি পাদটিতে হোটেল, রেস্তোরাঁ আছে। গৃহস্থদের বাড়িতেও থাকা খাওয়ার

যায়। সঙ্গে টাকা পয়সা আর নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জিনিস থাকলেই হবে। বিছানাপত্র নেবার দরকার নেই। তবে ব্লিচিংপাউডার থাকলে ভাল হয়। এইসব জিনিস বইবার জন্যে দলে একজন কিংবা দুজন মুটে থাকলেই যথেষ্ট। শীতের শেষের সময়ে তারতীয় টাকার বিনিময়ে নেপালি টাকা নেওয়া একদম বন্ধ করি; নইলে নেপালের গ্রামাঞ্চলে বিশেষ অসুবিধের পড়তে হয়।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বোধ হল। ৪,০০০ ফিট উপরে উঠে এসেছি। তার উপর আউটারমের মাঝামাঝি সময়। শীতবোধ হওয়া স্বাভাবিক। তাছাড়া নেপালের এদিকটায় ঠাণ্ডা একটু বেশি। বাই হোক জিনিসপত্র গোছগাছ করে সাতটার মধ্যে বেরিয়ে পড়া গেল। বাইরে তখন আলোর কণা ফুটেছে। মন্দাকুড়ের আর অন্নপূর্ণা সিরিশিখর কত পরিষ্কার দেখাচ্ছে এখান থেকে। আজ ছিল, ঐ দুটি শিখরকে বিদায় বাবার দেখা আর নৌলগিরি থেকে। এখন তা সত্য হয়ে উঠল।

যেতে যেতে উপর থেকে পোখরার ফেওয়া হ্রদ চোখে পড়ল। ছবির মত সুন্দর। উপর থেকে সব কিছুই সুন্দর দেখায়। ঘরবাড়ি, ক্ষেতখামার, গাছপালা সব কিছুরই কেমন একটা আশ্চর্য মহিমা প্রকাশ পায়। বিশেষ করে নেপালের এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না। সারাপথই সৌন্দর্যসম্ভারে ভোড়া। একটানা পথ চলে চন্দ্রকোট পৌঁছলাম। চন্দ্রকোটের ক্লান্তিকর উতরাই পথ পেরিয়ে কালিকি নদীর উপকূল ধরে চলা শুরু হল। বেশ সুন্দর আবহাওয়া। চারপাশের সুন্দর দৃশ্য। নদীর উপর কুলর পুল পেরিয়ে ওপারে যীরেখাটি গ্রাম। এখানে বিশ্রামের জন্য থামা হল।

ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে আবার চলা আরম্ভ হল। যেতে যেতে সন্ধে হয়ে গেল। উসেরির আগে ডিরকেদুঙ্গা পৌঁছতে সকলে হিমসিম খেয়ে গেল। পথে একটা চড়াই ছিল। দিনের বেলা চড়াই ভাঙতে যে কি কষ্ট, মুক্তিনাথের পথে বেরিয়ে তা ভালভাবে বুঝেছি। যাই হোক, ডিরকেদুঙ্গার রাত কাটিয়ে সকালে উসেরির সেই বিখ্যাত চড়াই-এ উঠতে লাগলাম। এমন প্রথমশ্রেণীর চড়াই জীবনে কখনও দেখিনি। দু'মাইল চড়াই ভাঙতে হাঁপ ধরে গেল। আমরা ঘন্টায় হাঁটু টন্‌টন্ করতে লাগল। সর্দীসাথীদেরও সেই অবস্থা। চার ঘণ্টা ধরে হাঁটার পর চড়াই পথ শেষ হল। বেলা এগারোটায় পৌঁছলাম উসেরি। তখন কারো শরীরে আর এতটুকু শক্তি ছিল না। মালপত্র রেখে যে যার বিশ্রাম করতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করা গেল না। সন্ধের মধ্যে ঘোরেপানি পৌঁছতে হবে। তাই দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে বনের পথ দিয়ে আবার হাঁটা শুরু হল। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে রোডোডেনড্রনের ঝোপ। সেখানে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। কেমন ঝিমে ঝিমে আবহাওয়া। পথ ধীরে ধীরে উপরে উঠেছে। কষ্ট থাকলেও উসেরির মত কষ্ট নয়। এই অরণ্যপথে একটি মার্কিন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। সে মোরোক্কো থেকে ফিরছে। তার হাতে একটা স্টাফ। তা নিয়ে সে প্রজাপতি ধরছিল। সারাপথই সে নানি প্রজাপতি ধরেছে। প্রজাপতি ধরা ও পালন করা তার নাকি শখ। এই কথা বলে ভাল ঝোরেতে ঝোরেতে সে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। আমরাও চলতে লাগলাম। দেখতে দেখতে বনের পথ শেষ হল। পাহাড়ের বাঁক নিয়ে একটুখানি সমতল জায়গা দেখা গেল। এটাই ঘোরেপানি। আমাদের রাতের আস্তানা। তখনও সূর্য অস্ত যায়নি। ঘোরেপানির আকাশের গায়ে পালা দেয়া ঘোরেপানি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে।

ঘোরেপানি থেকে নিম্বা পর্যন্ত পথটি ভারি সুন্দর। পথ চলার কোন ক্লান্তি নেই। কখনও বাঁদিকে, আবার কখনও ডানদিকে। দূরের গিরিশিখরের এমন চোখ ধাঁধানো রূপ নেপালের এই অঞ্চলে না এলে বোঝানো যায় না। কালাগিরি নামের সঙ্গেও কেমন মিল আছে। গিরিশ্রেণীর চারদিকে কেবল সাদা ধবধবে তুষার ; যেন ঢেউ খেলে খেলে এগিয়ে আসছে। আর পথের ডানদিকে ওক, পাইন, ঝুনিপার ও সাইপ্রেসের ছড়াছড়ি। সমুদ্রের ঝাঁকে ঝাঁকে তুষার শিখরের হাতছানি। সে এক অদ্ভুত কালার কম্বিনেশন। মুক্তিনাথের পথে কালাগিরির এই রূপ ভোলার নয়।

নিম্বা পেরিয়ে তাতপানির পথটি নিচে নেমে গেছে। একেবারে নদীর কূলে। পুল পার হয়ে ওপারে যেতে পড়ল কালীগণ্ডকী। এ অঞ্চলের প্রধান নদী। মানোসের কুণ্ড থেকে নেমে আসছে। এর উৎসমূলে যা গর্ভে শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায়। এখন থেকে কাগবেণী পর্যন্ত কালীগণ্ডকী পথের সঙ্গী। পথ নেমেছে নিচে যাবে। এই নদীর তীরে তাতপানি গ্রাম। এখানে এক রাত থাকা হল। উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে শরীরের ক্লান্তি দূর হল। হাঁটুর ব্যথা কমল। উষ্ণ প্রস্রবণে শরীর ডুবিয়ে গা-হাত-পায় ব্যথা কমানোর জন্যেই যাত্রীরা এখানে এক রাত কাটায়। তাছাড়া এখানে খাওয়া-দাওয়ারও বেশ মজা আছে। তাতপানির মজা লুটে নিয়ে আবার মুক্তিনাথের পথে যাত্রা শুরু হয়। এরপর কালীগণ্ডকীর সেই ভয়ঙ্কর রূপ আর নেই। তার রূপ হয়েছে ভয়ঙ্কর। ফুঁসতে নিম্নের মত গর্জন করতে করতে কেন সে এগিয়ে আসছে। তাই বা তীর ধরে সরু পায়ে চলা পথ। একটু অসাবধানতার মুহূর্তের মধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বাস পর্যন্ত এ রকম উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটেছে। তবে সমুদ্র পথের ঝোড়া পাইন আর বাগাসেরাই মন ভরিয়ে রেখেছে।

জলল পর যেতে। পথ মারাত্মক না হলেও একেবারে সহজ নয়। যেতেতে ঢুকতেই টুকুচে পর্বতশিখর ঘোমটা খুলে তার অপরূপ রূপরাশি আমাদের সামনে মেলে ধরল। তার একদিকে নীলগিরি শিখর, অন্যদিকে মানাপতি। এ নীলগিরি কিন্তু ভারতের গাড়োয়াল হিমালয়ের নীলগিরি নয়। যেতে থেকে টুকুচে পর্যন্ত কেবল নদীর উপর দিয়ে পথ। জল শুকিয়ে গেছে। রাশি রাশি পাথর পড়ে আছে। তাই উপর দিয়ে কোনরকমে হেঁটে যেতে হয়। মাঝে মাঝে জলেও নামতে হয়েছে। টুকুচে পৌঁছে মনে হল অন্য জগতে এসে পড়েছি। আবহাওয়া তিব্বতের মত। চারদিকে ধূসর বৈরাগি পাহাড়। তার নিচে কিছু পাইন, সাইপ্রেস, ঝুনিপার ও অন্যান্য গাছপালা। ঝাকালি লোকজনই বেশি। তাদের আদের বিচিত্র বেশভূষা পথে ঘোরাফেরা করছে। নেপালি ভাষা বদলে গেছে। বদলে গেছে লোকসংস্কৃতি।

ধবলগিরি ও অন্নপূর্ণা পর্বতের মাঝখান দিয়ে নেমে আসছে কালীগণ্ডকী। তারই বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে টুকুচে অবস্থান। এখান থেকে দুই পর্বত শিখরেই অভিযান করা যায়। ১৯৫০ সালে ফরাসী অভিযাত্রীদল এই টুকুচে থেকে অন্নপূর্ণা সিরিশিখরে অভিযান করেছিলেন। তাঁদের ডাক্তারের ছিলেন মরিস হারজোগ। পর্বত অভিযান শেষ করে দেশের পথে

হিমানী সন্তানদের সামনে পড়ে তিনি ক্রস্ট বাইটে আক্রান্ত হন। হাতের ও পায়ের আঙুল কেটে বাঁকে বাঁকে বাদ দিতে হয়। টুকুচের একটি দোতলা বাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় তিনি কিছুক্ষণ ছিলেন। সেই থেকে মরিস হার্জোগের নাম টুকুচ গ্রামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

● মুক্তিনাথ মন্দির আলোকচিত্র : লেখক

টুকুচে ছেড়ে কালীগণ্ডকীর ধার ধরে এগিয়ে চলা। মাইলখানেক আসে কোন লোকবসতি চোখে পড়ল না। চারদিকে কেবল রিক্ত প্রকৃতি আর ঠাণ্ডা ঝকঝকে হাওয়া। এরপর থেকে মুক্তিনাথ পর্যন্ত আর সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। মাইলখানেক পৌঁছে কিছুটা গ্রামের সন্ধান পাওয়া গেল। পথচারী তখন ফসল কাটার সময়। ছেলে পুরুষ সকলে খেতের কাজে ব্যস্ত। তাদের হাসি, ঠাট্টায়, গল্পগুজবে মাঠ মুখর হয়ে উঠেছে। ফসল কাটা হচ্ছে ; আবার কোথাও বা ফসল ঝাড়াই চলছে। দেখতে দেখতে মাইলখানেক সীমানা শেষ হয়ে গেল। এসে পড়লাম জোমোসোমে। বেশ বড় জায়গা। অনেক ঘরবাড়ি। এখানে না থেমে কাকবেণীর দিকে এগিয়ে চললাম।

জোমোসোম থেকে কাকবেণী কয়েক ঘণ্টার পথ। কিন্তু এই পথটুকুতে কষ্ট সবচেয়ে বেশি। ঠাণ্ডা ঝকঝকে হাওয়া সূঁচের মত গায়ে এসে বিঁধছে। ঝোঁটা ঝোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। ছোট-বড় পাথর ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কোনরকমে এগোতে হচ্ছে। তার উপর পথের কোন সঠিক নির্দেশ নেই। খাম্পা অধিবাসীদের সাহায্য ছাড়া এ পথে চলা খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে প্রকৃতি একেবারে বিরূপ হয় না। মাঝে মাঝে দু-একজন খাম্পাকে পথে দেখা যায়। তারাই পথের ঠিক ঠিক হদিস দিয়ে দেয়। তাদেরই কথামত পথ চলে সন্ধের সময়ে ক্লান্ত শরীরে কাকবেণী পৌঁছলাম। টৈরচে নামে এক খাম্পা মুহুকের ঘরে সেদিন রাত্রিবাস হল। সে-ই থাকা-খাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিল। পরদিন সকালে চা জলখাবার খেয়ে আবার পদযাত্রা শুরু হল। যাত্রার আগে টৈরচের পাতলা-গলা সব মিটিয়ে দেওয়া হল।

অবশেষে মুক্তিনাথ পৌঁছই। একটানা আঠেরোদিনের পদযাত্রার আজ শেষ হবে, এই ভেবে দলের সকলে নতুন উদ্যমে পাহাড়ে উঠতে লাগল। দুপুর নাগাদ পড়ল কাকবেণী গ্রাম। মুক্তিনাথের পথে এটাই শেষ গ্রাম। এখানেও খিমতী খাম্পাদের বসবাস। গ্রামে ঢোকার মুখে মণিমালীর, ছেরেন্স ও প্রার্থনা পতাকা দেখা গেল। এই গ্রামের মতনয় দিয়ে জোমসোমের ঘরে মালপত্র রেখে তাড়াতাড়ি মুক্তিনাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললাম। মাইল দেড়েক চড়াই উতরাই করে পৌঁছলাম মুক্তিনাথ টীর্থে। বেলা তখন তিনটে।

মুক্তিতীর্থ মুক্তিনাথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ১২,৫০০ ফিট। চারদিকেই উঁচুন পাহাড়। তার মাঝখানে বার্চ গাছে ঘেরা খানিকটা মালভূমির মত জায়গা। আকাশ এখানে সব সময়ে মেঘ ও কুয়াশায় ঢাকা থাকে। কখনও সখনও সূর্যের আলো দেখা যায়। এখানে পৌঁছে বেশ শীত শীত বোধ হল। হাত পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। মনে হল, ঠাণ্ডায় বুঝি জমে যাব। মন্দিরের দিকে এগিয়ে যেতে পুরোহিতের সঙ্গে দেখা হল। তিনি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন। মিনিট দশেক হাঁটার পর মুক্তিনাথের মন্দির দেখা গেল। একটি প্যাগোডা ধরনের মন্দির। এরকম মন্দির নেপালে আকছার দেখা যায়। পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন — 'ভিতর আইয়ে, দরশন কিজিয়ে।'

মন্দিরের ভেতরে ভগবান বিষ্ণুর মূর্তি। সামনে রয়েছে তাঁর বাহন গরুড়। বালুর তৈরি মূর্তিটি ভারি সুন্দর। মুখে যেন হাসিটি লেগে আছে। এরকম জীবন্ত মূর্তি আর কোথাও বিশেষ দেখিনি। আশ্চর্যের ব্যাপার মন্দিরে ঢুকে বিষ্ণু দর্শন করার পরে মনে যেন নতুন বল ফিরে এল। পথ চলার ক্লান্তি ও অবসাদ যেন দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ ধরে মূর্তি নারায়ণের অপরূপ মূর্তি দেখতে লাগলাম। এতদিনের পরিশ্রম, পথ চলার কষ্ট, মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগ — সবই যেন সার্থকতার ফুল হয়ে ঝরে পড়ল দেবতার পাদপীঠে।

প্রায় সুশো বছর আগে মুক্তিনাথের এই মন্দিরটিতৈরি হয়েছে। নেপাল সরকার এই মন্দিরের দিকে একেবারে নজর দেন না। এটি একটি অবহেলিত মন্দির। পশুপতিনাথ মন্দিরের মত পুজোর আড়ম্বর এখানে নেই। কেবলমাত্র ফুল ও তুলসীপাতা দেবতার চরণে নিবেদন করা হয়। এখানে যাত্রীও আসে কম। এই মন্দিরের সামনে রয়েছে রামমন্দির। এটি অবশ্য পাথরের তৈরি। গায়ে রামলীলার মূর্তি খোদাই করা আছে। এর পূজারি এক ভারতীয় ব্রাহ্মণ। ভারতের বিভিন্ন তীর্থ ঘুরে শেষে তিনি এসেছেন মুক্তিনাথে। রামমন্দিরের পুরোহিত হয়ে এখানেই থেকে গেছেন। তাঁর কিছু জমিজমা আছে। একটা চালাঘরও আছে। কোনরকমে দিন কেটে যায়। যাত্রীরা এলে মুক্তিনাথ মন্দিরের নেপালি পুরোহিতের মত তিনিও কিছু প্রণামী পান।

ঠাণ্ডা ক্রমশ বাড়ছে। বার্চ গাছের পাতাগুলি ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে মাটিতে। অক্টোবরের শেষ। আর কিছুদিনের মধ্যে গাছগুলি সম্পূর্ণ নিরাভরণ হয়ে উঠবে। তারপর বরফে ঢাকা পড়ে যাবে এদের শরীরের অবশিষ্ট অংশ। তখন এখানে কেউ থাকবে না। পুরোহিত পুজো করে নিচে নেমে যাবেন। প্রহরীর মত জেগে থাকবে শুধু গাঙ্গেলার হিমালের তুষারশিরিশ্রেণী।

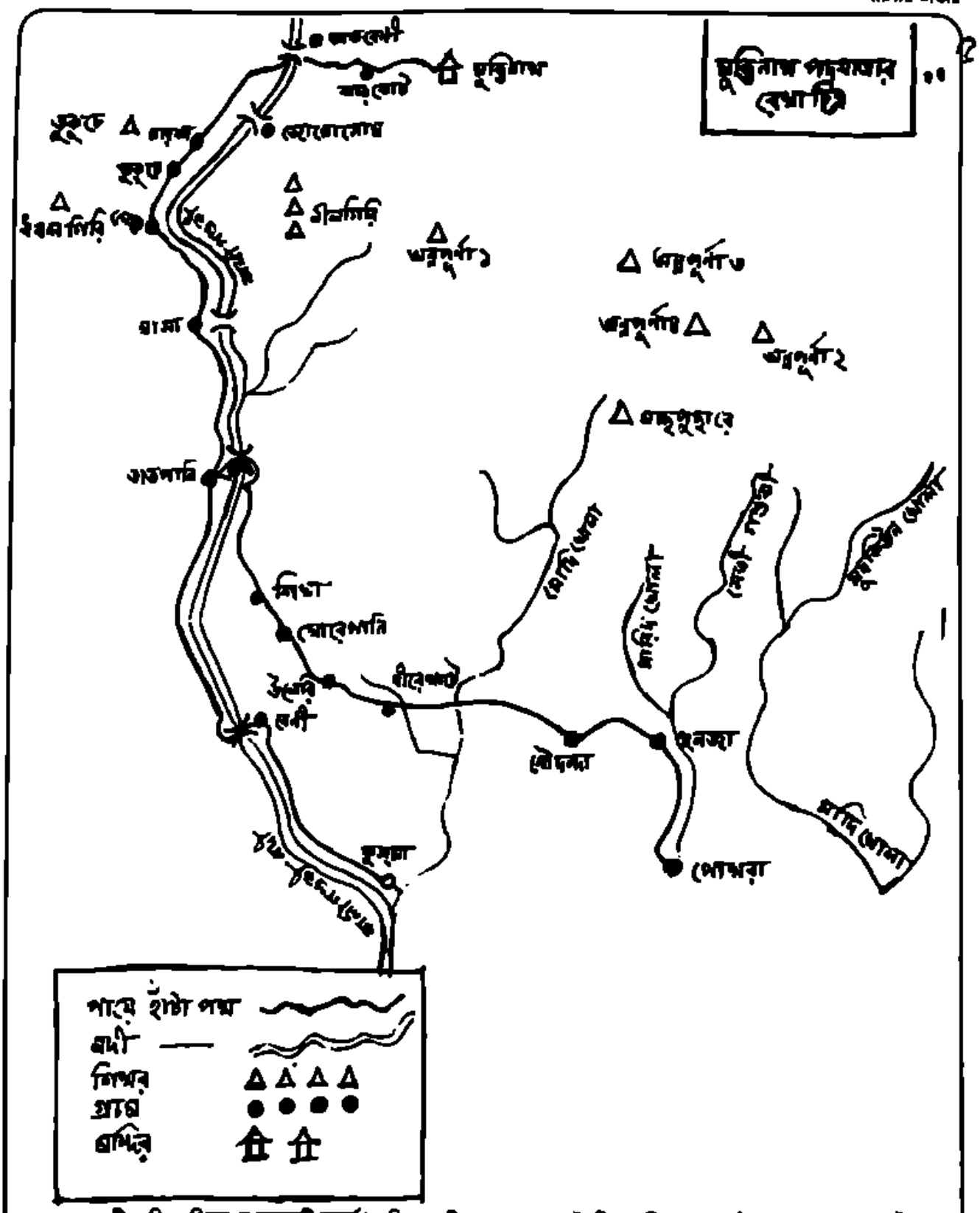
মুক্তিনাথ পদযাত্রার রেখাচিত্র
মুক্তিনাথ
জমসম
মুকুট
মুকুট
থোরোংলা
থোরোংলা পিক
থোরোং খোলা
গ্রামা
থোরোং পেদি
থোরোং পেদি
ঘাটকালি
সিখা
থোরোং পাতি
থোরোং পাতি
ঘাটকালি
মুক্তিনাথ
মুক্তিনাথ
মুক্তিনাথ

করেন। স্বামী এলে মন্দির খুলে তিনি সব কিছু বেরিয়ে দেন। তাঁকেও কিছু প্রণামী দিতে হয়।

মুক্তিনাথ মন্দিরের পেছনদিকে একটা পাহাড়ে ঢালা পথ উপরে উঠে গেছে। মন্দির দেখা শেষ করে অনেকে সেই পথ ধরে উপরে উঠতে লাগল। এই পথ ধরে দিন চারেক হেঁটে গেলে অধিক মানবের কূটে পৌঁছনো যায়। তবে এখন সে যাওয়ার সময় নয়। ভীষণ ঠাণ্ডা। পথও দুর্গম। তার জন্যও বিশেষ প্রস্তুতির দরকার। ১৪,০০০ ফিটের মত উঠে সকলে এক এক করে নীচে নেমে এল। তখন ঠাণ্ডা বেশ কাবু করেছে। হাত পা অসে যাচ্ছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে রোদের আলো এসে পড়ছে। পাহাড়ের হিমবাহের বিরাট গিরিশ্রেণী বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করলাম সে অপূর্ব দৃশ্য। মনে হল এই বিরাট, মহান, সুন্দর গিরিশ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে আমরাও তার একটা অংশ হয়ে গেছি। আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই বিরাটত্বের কাছে।

আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হয়ে আসছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে নীচে নামতে লাগলাম। সন্ধের একটু আগে পৌঁছলাম ঘারপাকে। এখানে বিমল মোহনের দোকানে জিনিসপত্র রেখে যাওয়া হয়েছিল। রাত্রিবাস এখানেই হবে ঠিক ছিল। পরদিন সকালে আবার ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করা। ঘারপাকে থেকে ঘোড়েসোয়ার হয়ে সেই একইপথে দিনের পর দিন হেঁটে জরুপানি ; তারপর সমতলপথে বেণী ও কুণ্ডা হয়ে নওলয়া। এখান থেকে নেপাল সীমানার বাসে নেপাল-ভারত সীমান্ত সোনৌলি। সোনৌলি থেকে উত্তরপ্রদেশ সীমানার বাসে চড়ে গোরখপুর। এরপর ঘাওয়া।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কিভাবে যাবেন : হাওড়া থেকে গোরখপুর এক্সপ্রেসে (৫০৫১ আপ) গোরখপুর। এখান থেকে গোরখপুর ট্রেনে বা বাসে নওলয়া। এখানে ভারত সীমানার চেক পোস্ট আছে। কিছু জিজ্ঞাসাবাদ হয়। নওলয়া থেকে বাসে ভারত-নেপাল সীমান্ত সোনৌলি। এখানে নেপাল চেক পোস্টে জিনিসপত্রের প্রাথমিক চেকিং। ভারতীয় টাকার বদলে নেপালি টাকা করে নিতে হয় এখানে। তারপর নেপালের বাসে চেপে ভৈরহা-মুটওয়াল হয়ে পোখরা। পৌঁছতে মোটামুটি বেড়দিন লাগে। পথে অসুখ বা অন্য কারণে কোন জায়গায় এক রাত থাকতে হয়। পোখরায় দু'একদিন থেকে সবকিছু গোছগাছ করে পথযাত্রা শুরু করা দরকার।

কাঠমাণ্ডুটা থেকেও বাসে চড়ে পোখরা পৌঁছতে পারেন। প্রথমে কলকাতা থেকে ট্রেনে শিলিগুড়িপৌঁছে সেখান থেকে বাসে পানিট্যাঙ্কি হয়ে কাঠমাণ্ডু। কাঠমাণ্ডুতে একদিন থেকে বাসের সিট রিজার্ভ করে পরদিন পোখরার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পারেন। এপথে পোখরা পৌঁছন অনেক সহজ। তবে দীর্ঘ বাসযাত্রার ধকল সইতে হয়।

প্রথম দিন	পোখরা - নৌলদা (১৪৫৮) মি
দ্বিতীয় দিন	নৌলদা - তিরকেদুলা (১৪০৯)
তৃতীয় দিন	তিরকেদুলা - ঘোরেপানি (২৮০৫)
চতুর্থ দিন	ঘোরেপানি - জরুপানি (১১৮৯)
পঞ্চম দিন	জরুপানি - ঘারপা (২০১২)
ষষ্ঠ দিন	ঘারপা - মেথে (২৪০৮)
সপ্তম দিন	মেথে - চুকুচে (২৫১০)
অষ্টম দিন	চুকুচে - জারকোটী (১৭০০)
নবম দিন	জারকোটী - মুক্তিনাথ (৩৭১৫)

পোখরা থেকে আরেকটি পথে জরুপানি পর্যন্ত বাসে গিয়ে সেখান থেকে হাঁটাপথে বেণী, টিপলিক হয়ে জরুপানি। তারপর একদিনের পথ ধরে মুক্তিনাথ।

কখন যাবেন : শরৎকালই মুক্তিনাথ পদযাত্রার উপযুক্ত সময়। এ সময়ে উঁচু এলাকাগুলিতে বরফ থাকে না। সেপ্টেম্বরের শেষে কিংবা অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রা শুরু করা দরকার। নভেম্বরের মধ্যেই ফিরে আসতে হবে। কারণ নভেম্বর থেকেই নেপালের উঁচু জায়গাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। তখন অনেক জায়গায় পথের কোন চিহ্ন থাকে না।

খোথায় খোথায় থাকবেন : পদযাত্রার প্রত্যেকটি পাহাড়ে হোটেল, রেস্তোরাঁ আছে। উনুন জ্বালিয়ে রান্না ও খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া কিছু কম খরচে গ্রামের বাড়িতেও থাকা যায়।

কি কি সঙ্গে নেবেন : ভারি ভারি পদার্থের পোশাক। শুকনো খাবার-দাবার, সাধারণ অসুখবিসুখের জন্য ওষুধপত্র, ক্যামেরা, জলের বোতল। ট্রেকিং স্টাফ থাকলে ভাল হয়।

কি কি দেখবেন : সারা পথই নিসর্গ সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। অসংখ্য ঝোরা (পাহাড়ী নদী) পেরোবেন। দেখবেন অন্নপূর্ণা, ধবলগিরি, চুকুচে, নীলগিরি, মানাপাসি ও ঘারপের হিমবাহের তুষারশোভা। নেপালি, থাকালি ও তিব্বতি জনগণের সঙ্গে পরিচিত হবেন। তাদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি আপনাকে বিস্মিত করবে। বিশেষ করেকটি নামকরা গিরিশিখর যে নেপালের এটাদেখেই পড়ে। যেমন, মানাপুহার (২৩,০০০ ফিট), অন্নপূর্ণা (২৬,৫০৪ ফিট), ধবলগিরি (২৬,৮১০ ফিট), চুকুচে (২২,৭৮০ ফিট)। □

কর্মজীবনের ব্যস্ততাক্লিষ্টতা থেকে সাময়িক মুক্তি পেতে কলকাতার সন্নিকটে আমাদের মু-বাসভূমি পুরীর হরিতে হোমে আপনার সপরিবার অবসর বিনোদন কামনা করি।

যোগাযোগ করুন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রাজবাটী : বর্ধমান - ৭১৩১০৪

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

DARJEELING DISTRICT CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD.

(Regd. No. 2 of 1959)

Head Office :
Rishi Road, Kalimpong,
P.O. Kalimpong, Dist. Darjeeling
Phone No. : 55372 ; Fax No. 03552-55372

A leading Bank in the service of Common man through the following Branches :

1. Kalimpong - 55372
2. Darjeeling - 52487
3. Kurseong - 03554, 44486
4. Sukhiapokhari - 64263
5. Bijanbari - 60258
6. Pedong -
7. Gorubathan - 64030
8. Rimbick -

- ☆ We provide Agril./Allied, Farm/Non-Farm and M. T. Non-Agril. (Salary Earners) Sectors through various Co-op. Societies.
- ☆ Quick, Prompt & Cordial service is our motto.
- ☆ Deposits are covered by Deposit Insurance Scheme.
- ☆ Attractive Deposit Scheme, with higher rate of interest than Commercial Banks.

With
Best
Compliments
From :

The Stewarts Lloyds Indian Tube Employees'
Co-operative Credit Society Limited

41, CHOWRINGHEE ROAD,
CALCUTTA - 700 071

শুভেচ্ছা সহ ঃ

ছাত্রবন্ধু স্টোর্স

৬, শিবচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট
বেলুড় বাজার
হাওড়া

সকল প্রকার স্টেশনারি এবং উপহার সামগ্রী, ইমিটেশন গহণাদি
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Space
Donated
By

Raju, Rana, Mousona

MONDAL MINI MARKET
BALLY, HOWRAH

With
Best
Compliments
From :

DUKE & CO.

BALLY, HOWRAH

PIN - 711 201

With Best Compliments From :

M/S. MONDAL STORES

RAJCHANDRAPUR, DEWANCHAK
HOWRAH

Prop. - Bidhan Mondal

পুরীর সমুদ্র সৈকতে মনোরম পরিবেশে
আমাদের হলিডে হোম ব্যবহার করুন

যোগাযোগ ঃ

বালি মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৩৮৪, জি টি রোড, বালি, হাওড়া
দূরভাষ : ৬৫৪-২২৩৬

নীলমণি ঘোষ
সভাপতি

চিত্তরঞ্জন সরকার
সম্পাদক

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

E. & N. F. RAILWAY CO-OPERATIVE BANK LTD.

34 A&B, Sashi Bhusan Dey Street, Calcutta-12
Telephone Enercept. Phone : 225-2906/27-4733

+ A premier Railway Co-operative Bank functioning under Banking Regulation Act.
+ Provides banking facilities for members and public also.
+ All Deposits covered under Deposit Insurance Act.
+ Our Branch at E. Rly. Sealdah main station 1st. floor near reservation counter & KPA Rly. Workshop.
+ We have Camp Offices at Maligaon, Alipurduar Jan., Katihar, Tinsukia & Lumding of N. F. Rly. Zone.
+ We have holiday home at Puri, Darjeeling and Digha.

Rate of Interest :

Savings Bank	5%
F. D. Interest 46 days	6.25%
6 months	6.25%
1 Year	9%
2 Years	10.5%
3 Years	11.25%
4 Years	12.25%
Double benefit deposit scheme 66 months	13%

Recurring Deposit for One Year	8%
for Two Years	10%
for Four & Five Years	11.50%

N. K. GANGULY
Chief Executive

বিজয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন

ডহরকুণ্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ - ডহরকুণ্ডু * ব্লক - আরামবাগ
জেলা হুগলি * রেজিঃ নং - ২২ * তাং - ২২-৩-৫৩

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প, হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত)

সদস্যদের স্বল্পমেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, ভোগ্যঋণ, চাষের সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং আমানত ব্যবসার মাধ্যমে সদস্যদের স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহী করার প্রয়াসে নিয়োজিত।

শম্ভুনাথ বেরা	চণ্ডী সামন্ত	নিতাই ভৌমিক
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

ঢাকুরিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

৬৮, তনুশ্রীকুর রোড, কলিকাতা - ৭০০ ০৩১, দূরভাষ - ৪১৪৮৫৭৫/৪০৫৫
কলিকাতার একমাত্র কম্পিউটার চালিত সমবায় ব্যাঙ্ক

সঞ্চয় প্রকল্প ঃ সেভিংস ব্যাঙ্ক, মাসিক ইনকাম প্লান, রেকারিং ডিপোজিট, ক্যাশ সার্টিফিকেট, ফিক্সড ডিপোজিট, মেচিউরাল ডিপোজিট, ফ্লাকচুয়েটিং ডিপোজিট সার্টিফিকেট।

ঋণ প্রকল্প ঃ

স্বল্পমেয়াদি ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ, মধ্যমেয়াদি ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ, গৃহনির্মাণ, জমি ক্রয় ও ব্যবসায়ের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ, জাতীয় সঞ্চয়, কিষাণ বিকাশ পত্র, জীবনবিমা প্রভৃতি বন্ধকি ঋণ, স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকি ঋণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রসার ঋণ, যানবাহন ক্রয় ঋণ, ডি সি আর, ডি সি পি, ওয়ার্কিং মেশিন, ক্রিয়া, টিভি, ফার্নিচার প্রভৃতি ক্রয় ঋণ, মেয়াদি আমানত জমা ঋণ

অন্যান্য সুবিধা ঃ

এসেসিয়েট মেম্বারশিপ, সঞ্চয় প্রকল্পে নমিনেশন, কারেন্ট একাউন্ট, সেফ ডিপোজিট লকার, লিফট চেক

সেভিংস ব্যাঙ্ক ও মেয়াদি আমানত প্রকল্পে জাতীয় ব্যাঙ্ক থেকে সুদের হার অর্ধ শতাংশ বেশি
সমস্ত সঞ্চয় ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের আওতায় সুরক্ষিত।

সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোস্তু তে।।

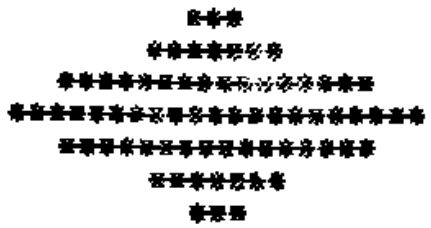

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক

কলিকাতা প্রধান শাখা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৯৪ সালে বিশেষ উৎসাহবর্ধক দ্বিতীয় পুরস্কারের প্রাপক

এই অঞ্চলের মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অঙ্গীকার।

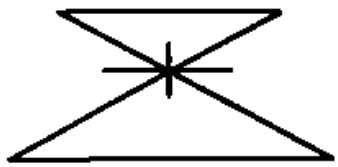

[illegible]রতলা মহিলা ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেড

"মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সংগ্রামের নিরলস সৈনিক"

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

পশ্চিমবাংলার মহিলা সমবায়ের একমাত্র শীর্ষ শিল্প সমবায়

আমাদের তিনটি বিক্রয় কেন্দ্র

সমবায়িকা মানিকতলা সিভিক সেন্টার।

হেমন্ত ভবন, ১২ বি বা দি বাগ কলিকাতা - ৭০০ ০০১।

"এ ই" মার্কেট, বিধাননগর, সল্ট নং - ৭১।

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমবায় মহাসংঘ লিমিটেড

১২, বি বা দি বাগ, ৪র্থ তলা, হেমন্ত ভবন, কলিকাতা - ৭০০ ০০১

রেজিস্টার্ড নং ১/সিডি, তারিখ - ২৯.৩.১৯৮৯

ফোন ঃ ২১০-৪৩৬৩

আরতি ভট্টাচার্য
চেয়ারপার্সন

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

THE NABAPALLI CO-OPERATIVE BANK LTD.

P.O. : NABAPALLI, BARASAT,
NORTH 24 PARGANAS,
PIN-743 203, TELEPHONE : 552-3376

(All types of Banking transactions as permitted to Urban Co-operative Bank with lockers facilities are undertaken)

Interest Deposit : from 01.01.98

Fixed Deposit : 91 days to 180 days	6.75%
181 days to less than 1 year	7.25%
1 year but less than 2 years	10.25%
2 years but less than 3 years	11%
3 years but less than 5 years	12%
5 years and above	12.75%
Kalpataru Prakalpa.....5.6 years	Double
Recurring Deposit	10.25% to 12.25%
Savings Bank Deposit	5% P.A.

৩০ হাজার সদস্য
৮০ হাজার আমানতকারী
এবং
ব্যাঙ্কের অগণিত শুভানুধ্যায়ীদের
পক্ষ থেকে জানাই
শারদীয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা
ও
সংগ্রামী সমবায়ী অভিনন্দন

দি ব্যাঁটরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

দূরভাষ ঃ ৬৬৭-৪১৭৫, ৬৬৭-১২৭০, ৬৬৭-২৭৫৮

বর্ধমান শহরে মহিলাদের স্বনির্ভর করার জন্য প্রথম মহিলা সমবায় সমিতি

বর্ধমান মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ১/৯৪ তারিখ - ১০/৩/৯৪
হেড অফিস ঃ ৩৩, পার্কাস রোড, বর্ধমান - ১
ব্রাঞ্চ অফিস ঃ গুসকরা, গলসি, ফোন - ৬৫৪৬২

মহিলাদের স্বাবলম্বী করার জন্য অল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে সহজ কিস্তিতে ঋণ দাদনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য জাতীয় ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সুদে বিভিন্ন ধরনের আমানত প্রকল্প চালু আছে।

আমানত প্রকল্পগুলিকে মজবুত করতে সকলের সহযোগিতা কাম্য। বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত মহিলাদের সহিত যোগাযোগ করুন।

বকুল মুখার্জি
চেয়ারপার্সন

আশা বড়ুয়া
সেক্রেটারি

মঞ্জুশ্রী রায়
ম্যানেজার

বিঃদ্রঃ - অল্প সুদে মেয়াদি ভিত্তিতে ঋণের মাধ্যমে বহু দুস্থ বেকার মহিলা উপকৃত।

প্রবন্ধ

ভারতীয় প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন

অমিয় মজুমদার

প্রায় শতবর্ষ উত্তীর্ণ হতে চলেছে। পরাধীন ভারতে সূচনায় সমবায় সংগঠনে উৎসাহী হয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই গ্রামীণ নিরক্ষর কৃষকের জর্জরিত কৃষিজীবী মানুষের জটিল আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপশমের তাগিদে। ঋণনির্ভর এই দুরবস্থার মাঝারে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই সাংগঠনিক শক্তিকে গড়ে তোলার জন্য সেদিন প্রশাসনিক প্রয়োজনেই সমবায় উদ্যোগের জন্ম। পরাধীন ভারতে নিজ সংস্থাপত্তিতে ধীরে ধীরে বিকশিত হলেও স্বাধীনতার পরই অগ্রাধিকারের শক্তিরূপে আজ ভারতীয় অর্থনীতিতে চিহ্নিত হয়েছে। দেশের প্রস্তাত অর্থনীতিবিদরা এ আন্দোলনকে গ্রামীণই নয়, দেশের সর্বব্যাপী আর্থ-সামাজিক জীবনধারার উদ্যোগী হতে প্রেরণা দিয়েছেন। উৎপাদন, বিপণন, ভোগপণ্য সরবরাহ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে এ আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে। বাসস্থান সমস্যা সমাধানেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কর্মসংস্থান ক্ষেত্রের সমবায়ের ভূমিকা প্রত্যাশা রহিত নয়। দেশের প্রায় শতে শতাংশ গ্রামের ৬৫% পরিবার আজ কোনও না কোনভাবে আন্দোলনে সামিল। প্রায় ২০০০ মিলিয়ন সদস্য এ আন্দোলনে জড়িত। নবম পরিকল্পনায় প্রেক্ষাপটে আশা করা হয়েছে, বাড়তে ৮/৯ মিলিয়ন কর্মসংস্থানে সাহায্য করবে সমবায় উদ্যোগ। অবশ্য এ কারণে গ্রামীণ এলাকায় এ পর্যন্ত অব্যবহৃত সম্পদকে সুসংহত করতে হবে। সুসমন্বিত সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোত অর্থনৈতিক সংগঠন রূপে সাফল্য অর্জন করলেই হবে না, সমবায় নীতি-নির্ভর সার্থক প্রয়াস দ্বারা সমগ্র সমাজজীবনকে প্রভাবিত করাই হবে এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য। এজন্য তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে বহুধা ব্যাপ্তি (diversified) প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে সমবায় আন্দোলনের বর্তমান চিত্র পরিসংখ্যান মাধ্যমে উপস্থাপন প্রয়োজন। ১৯৯৫ সালের পরিসংখ্যান মত দেশের ৯৯.৫% গ্রাম তখন সমবায় আন্দোলনের আওতায়। দেশের সর্বমোট কৃষিঋণ সমবায়ের অবদান ৫৮.৯৭%, রাসায়নিক সার বন্টনের ৩০.৫%, চিনি উৎপাদনের ৫৯.১%, গম সংগ্রহের ৩৬%, তুলো উৎপাদন মূল্যের বিপণী সমবায় ১৭%, তাঁত শিল্পের ৫৫%, উৎপাদনের উৎপাদনের ২১%, মৎস্যজীবীদের সমবায় মুক্তি ২১%, গ্রামীণ পশুসম্পদ অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবোপরি সুযোগ ৬১%। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণনির্ভর কর্মোদ্যোগে সমবায় আজ কর্মসংস্থানে সক্ষম ১২.৫ মিলিয়ন মানুষ।

সমবায় আন্দোলনের শতবর্ষের নিরিখে সর্বভারতীয় উদ্যোগ প্রশংসোদ্রেককারী অগ্রগতি অর্জন করেছে। কৃষি সমবায় সংগঠন সেই ১৯০৪ সালে তার প্রাথমিক উদ্যোগের পর আজ যে ব্যাপ্তি লাভ করেছে তা নিঃসন্দেহে চোখার। প্রায় প্রতিটি গ্রাম এখন এর আওতায়। এর মধ্যে ৬১.৪% গ্রামীণ সমবায় বহুমুখী করা চলে। আজ এদের সদস্য সংখ্যা ৯০.৬ মিলিয়ন যাদের ২৭.৬% স্বল্পজোতের কৃষক, ৪২.৫৪% প্রান্তিক চাষী। এদের কাছ সরবরাহ করা হয়েছে ১,০৭,৯৪৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ মধ্যে ৮৮.১% স্বল্পমেয়াদি, ১১.৮% মধ্যমেয়াদি। কিন্তু অনাদায়ের হিসাবটাও কম নয়। আদায়যোগ্য স্বল্পমেয়াদি ঋণের ৩১.৪% ও মধ্যমেয়াদি ঋণের ৪৯.০% অনাদায়ী। আর কর্মসংস্থানে প্রাথমিক কৃষিঋণ সমিতির কৃতিত্ব কম নয়। ১২৫৭৫৮ জন বেতনভোগী কর্মী সুযোগ পেয়েছে।

আজ সারা দেশে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৩৬১ যাদের মোট আদায়কৃত মূলধনের পরিমাণ ১৪,৩৪৪.৫ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ মোট আদায়কৃত মূলধনের ১৮.৯%। এসব ব্যাঙ্ক থেকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৩৩৪৭০০.৮ মিলিয়ন টাকা যার এক-তৃতীয়াংশের বেশি পরিমাণ স্বল্পমেয়াদি ঋণ; অবশ্য এর মধ্যে অনাদায় মোট আদায়যোগ্য ঋণের ৩১.৫২%। এইসব ব্যাঙ্কে নানাভাবে কর্মরত ১০৩৪৯২ জন।

সারা দেশে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮টি, যার শাখা সংখ্যা ৭৪২, আদায়কৃত মূলধন ৩৬৪০.৫ মিলিয়ন টাকা, মূল্য ১০.৪% সরকারি বিনিয়োগ। এসব ব্যাঙ্ক কৃষিঋণ সংস্থানে যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে 'নাবার্ড' থেকে যথাযথ্রোজনীয় অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ। ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের ৭৮.৭৬% নাবার্ড থেকে পাওয়া। আলোচ্যবর্ষ শেষে এই ব্যাঙ্কগুলি থেকে প্রদত্ত ঋণ ২২১৪৫০.৭ মিলিয়ন টাকা। স্বল্প-মধ্য কৃষি-অকৃষি খাতে মোট প্রদত্ত ঋণের ১০.৭৩% অনাদায়ী ছিল।

দেশে ভূমি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলির মাধ্যমে দীর্ঘ-মধ্যমেয়াদি ঋণ দানের প্রসার ঘটায় সম্পদ-সৃষ্টি সহায়ক কাজে গ্রামীণ মানুষ অনুপ্রাণিত বোধ করছে। দেশে ১৯টি ব্যাঙ্ক তাদের ১০৪৮টি কার্যকর শাখার মাধ্যমে ব্যবসায়ে নিযুক্ত। অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৪১৮৩.৪৩ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি বিনিয়োগ ১৯%। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ১৫৯৩৯.৭২ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে গ্রামীণ কৃষি-সহায়ক প্রবৃত্তি সংক্রান্ত কারণে প্রদত্ত ৮৬%। এদের সূত্রে গ্রামীণ গৃহনির্মাণেও ঋণ প্রদান শুরু হয়েছে ১.৮%।

সারা দেশে প্রাথমিক ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সংখ্যা ৭৩২। অবশ্য অনাদায়ের পরিমাণ যথেষ্ট উদ্বেগময়, রাজ্যস্তরের ব্যাঙ্কসমূহের ক্ষেত্রে ৩৭.৭%, প্রাথমিক স্তরে ৫৭.৪%।

শহরাঞ্চলে সংগঠিত সমবায় ব্যাঙ্কের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে এজন্য যে এক্ষেত্রে সরকারি অংশীদারিত্ব নামমাত্র। ১৭১৫টি ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ৫৬১১.৫ মিলিয়ন টাকার মধ্যে মাত্র ০.৫%। মোট সদস্যের কার্যকরী সংখ্যা ৪৫.৬%। সর্বাধিক উন্নত চিত্র শহরাঞ্চলীয় অকৃষি ঋণদান সমিতি ক্ষেত্রে। দেশে ৪০,৫৮৫টি সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৯.৮৮ মিলিয়ন। অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১২৩৫৮.৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে সরকারি অংশের পরিমাণ মাত্র ০.৫%। ঋণ প্রদত্ত হয়েছে ৩৯৪৩০.৪ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে অনাদায়ের পরিমাণ ৩.৬%। সমবায় সমগ্রিক আন্দোলনে এই ক্ষেত্রে সরকারি প্রভাব যৎসামান্য। নিজ যৌথ শক্তিতে এবং সাংগঠনিক কৃতিত্বে এ আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে।

কৃষি বিপণন সমবায় অবশ্য সারা দেশে সরকারি পোষকতার প্রসার লাভ করেছে। এই বিপণন সমবায় মাধ্যমে কৃষি উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৯৫,০৩৮.৪ মিলিয়ন টাকা। কৃষি প্রযুক্তি ও উৎপাদন সহায়ক কারণে ও গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের প্রয়োজনে বিস্তৃতির অর্থের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। প্রাথমিক স্তরের বিপণন সমবায়ের সংখ্যা ছিল ৮৮০৬, যার সঙ্গে সদস্যরূপে যুক্ত ৫.৩৯ মিলিয়ন মানুষ। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ২৩১৩.৪ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি বিনিয়োগ ৬৫.৫%। এসব সমিতির ব্যবসায়িক লেনদেনের পরিমাণ ছিল ৫৭১৪৫.৯ মিলিয়ন টাকা। গুদামঘরের সংখ্যা ৮৬২২ যাদের সঞ্চয়ন ক্ষমতা ছিল ৩৩৯৮৬৩ হাজার টন। ক্ষেত্রজ ফসল বিক্রয় ১৮৩২৮.২৩ মিলিয়ন টাকা, কৃষি প্রয়োজনীয় সামগ্রী ৮২৩৪৯৪৯ মিলিয়ন টাকা, ভোগ্যপণ্য ১১৭৭৭.৭৮ মিলিয়ন টাকা। রাজ্যস্তরের শীর্ষ সমিতির সংখ্যা ২৯ এবং জেলাসহ কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা ৪৪৫। অংশগত মূলধন ৬৩৪৮.৬ মিলিয়ন টাকা যাদের ৮৮% সরকারি বিনিয়োগ।

ভোক্তা সমবায় সমিতির সংখ্যা ২৩৭৩৭ তৎসমেত শাখা ও বিভাগীয় বিপণী মিলে রয়েছে ৯২৮৭। অন্তর্ভুক্ত উচিত মূল্যের দোকান ২০.০৭৯ এবং তাদের সদস্য সংখ্যা ৯১৮৮ মিলিয়ন। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৫৫৪.২ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি অংশ ১৭.৫%। মোট বিক্রয়ের আর্থিক পরিমাণ ৯৩৩৩৩১ মিলিয়ন টাকা। বিক্রিত সামগ্রীর মধ্যে কন্ট্রোল সামগ্রী ৫৩.৬% অন্যান্য ৪৫.৪%। রাজ্যস্তরে ভোক্তা সমবায় সংঘ ২৯ যার বিভাগীয় বিপণী ১৭৬, খুচরো দোকান ৭৭৯ এবং শাখা সংখ্যা ২৪০। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ৭১৯.৮৯ মিলিয়ন টাকা যার সরকারি অংশ ৭৪.৭%। এই সব শীর্ষ সংঘের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত পাইকারি সমিতি (হোলসেল সোসাইটি) ৬৬৬।

প্রক্রিয়াকরণ (প্রসেসিং) উদ্যোগে সমবায়ের ভূমিকা প্রসঙ্গের যোগ্য বিশেষ করে চিনি উৎপাদনে। সমবায় চিনি কলের সংখ্যা ২৪৪টি যার মধ্যে নিয়মিত চালু সমিতির সংখ্যা ২৩১টি। এই সব সমিতির ইক্ষু উৎপাদক সদস্যের অনুপাত ১৩.২%। সারা ভারতে মোট আখ মাড়াই পরিমাণের ৫৬.৯২% সমবায়ের মাধ্যমে হচ্ছে এবং চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ৬,৯৬৬ মিলিয়ন টন। দেশের মোট চিনি উৎপাদনের ৬০.২% সমবায় চিনি কলে।

বুনন উৎপাদন ক্ষেত্রে সমবায় উদ্যোগের ক্রমবর্ধমান প্রসার ঘটছে। ৭২৭৪৪টি বুনন সমবায়ের সদস্য সংখ্যা ৯০১৪ মিলিয়ন, অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১২৪৫.৪ মিলিয়ন টাকা, টার্ন ওভার ৪১৭০৬.০ মিলিয়ন টাকা। সমবায় মাধ্যমে প্রতিদিন ৯৯৩১ হাজার মিটার বুনন সম্ভারহচ্ছে। স্পেন্ট্রো ভারেরির সংখ্যাও বাড়ছে। শহরে সংখ্যা ৭২৫ এবং গ্রামীণ ১৯১৮।

মৎস্য চাষে দেশে সমবায় সমিতি সংখ্যা ১০৩৬৩ যার ২০% সামুদ্রিক মৎস্য সম্ভারহে নিযুক্ত। মোট ১১২২ মিলিয়ন মৎস্যজীবীদের মধ্যে ৪৫% সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে যুক্ত এবং এদের মাধ্যমে প্রায় ষষ্ঠি হাজার টন মাছ ধরা হয়েছে (১৯৯০ হিসাব মত)

শিল্প ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাঁত শিল্প সমবায় ১৮৩৯ টির মধ্যে হস্তচালিত সূতা বস্ত্র উৎপাদনে রত ৪৯৪০। প্রায় ১৮৯৪ মিলিয়ন সদস্য এদের সঙ্গে যুক্ত। অংশগত মূলধনের পরিমাণ ১০৮৬.১ মিলিয়ন টাকা যার ৪৩.৪% সরকারি। বিক্রিত সামগ্রীর পরিমাণ ৪৭৪৬.০ মিলিয়ন টাকা।

সূতাকল সমবায় সংখ্যা ৩১৩ যাদের ১০৭টি তুলাচাষীদের ৬৭৭টি তাঁতশিল্পী নিয়ে। স্পিনিং মিলগুলি ১০৭টি উৎপাদনেরত, সদস্য সংখ্যা ০.৫৫১ মিলিয়ন, তুলাচাষী ৬৮.১%, তাঁতশিল্পী ৬.৩% পাওয়ারলুম তাঁতি ৪.০% মোট অংশগত মূলধন ৩৮৭৭.১ মিলিয়ন টাকা যার ৮৬.১% সরকারি।

গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রেও এ আন্দোলন দ্রুত প্রসারিত। দেশে ২৫টি শীর্ষ আবাসন সমবায় সংঘের থেকে প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে ঋণ প্রদত্ত হয়। সমবায় মাধ্যমে ১৯৭৯৫২০টি গৃহ নির্মিত হয়েছে এবং ১৯৫.৩৮৩টি নির্মীয়মান। শীর্ষ সমবায়ের অংশগত মূলধনের পরিমাণ ২৬২২.২৩ মিলিয়ন টাকা যার ৩০.০% শেয়ার সরকারি। শীর্ষ আবাসনের অর্থসংস্থান সূত্র মূলত জীবনবিমা কর্পোরেশন ৬৬.৭% হাডকো ১০.৯% রাজ্য সরকার ৪.১% অর্থকারী ঋণ ৮.৬%।

ধীরে ধীরে সংগঠিত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন-মুরগি পালন, শ্রমিক সমবায়, অন্যান্য শ্রমিক সমবায়, বিদ্যুৎ বণ্টন সমবায় প্রভৃতি (পরিসংখ্যান সূত্র : Indian Co-operative Movement : A profile-Natural Resource Centre of NCUI)

সমবায় আন্দোলনের উজ্জ্বল চিত্র পরিবেশিত পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। প্রায় শতবর্ষের সমবায় আন্দোলন আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসারিত। সরকারি অংশীদারিত্ব এ প্রসারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে সরকারি পোষকতা অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করেছে। স্বাধীনতার পর জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তনে সরকার সজাগ। বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্য থেকে সপ্তম পরিকল্পনা কাল পর্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু অষ্টম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই প্রস্তাবনা হঠাৎই যেন থমকে যায়। ইতিমধ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে দীর্ঘদিনের নীতিগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন ঘটেছে। মনমোহন সিং যখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রী তখনই প্রথম জাতীয় অর্থনীতিতে উদারীকরণের উদ্যোগ ঘোষিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে সরকার পরিবর্তন হলেও এই উদারনীতির রূপ প্রায় অপরিবর্তিত। স্বাভাবিক কারণে সমবায় আন্দোলনের প্রসারে এর নিশ্চিত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম পরিকল্পনার সমবায় কর্মসূচি বিষয়ক কোন পৃথক অধ্যায় সৃষ্টিত না হওয়ায় এই আন্দোলনে যুক্ত সর্বজনমানসে ক্ষোভের প্রতিফলন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সমবায় আন্দোলন যেন নিজশক্তিতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে না পারলে বিকল্প পথ প্রায় রুদ্ধ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বাজার অর্থনীতিতে এই আন্দোলনের আশানুরূপ প্রসার সম্ভবপর নিয়ে উদ্বেগের কারণ ঘটেছে। গত ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ সর্বভারতীয় সমবায় সম্মেলন (13th National Cooperative Congress. 21-22 January '97) এই উদারনীতিই আলোচ্য সূচিতে সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এই সম্মেলনের প্রেক্ষিতে যে সুচিন্তিত প্রকাশ করে তাতে ঐ ইউনিয়ন সভাপতি বি এস বিশ্বনাথন তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে উল্লেখ করেন,

"To day Cooperative movement has become more conseous of its role as a system for ensuring integrate

development of Community rather than funtioning merely as an economic organisation. The Cooperatives aim at inculcation of cooperative values and attitudes that strengthen the social base of the country and also undertake diversified activities for socio-economic development of the people belonging to those sectors of the community which have been bypassed by the process of economic and social development'.

মূল কথা হল সুসমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে সমবায় নীতি নির্ভর পদ্ধতির বিকাশ পথে সার্বিক সমাজ উন্নয়নে সচেষ্ট হতে হবে। আর এজন্য সমবায়কে তার উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার বহুতর কর্মসূচি গ্রহণ ভিন্ন দুর্বল শ্রেণীর মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে প্রায় শতবর্ষের এই আন্দোলনের বিকাশপথ কি পুরই মসৃণ ও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত? এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একদা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সমবায় ও নিত্য দ্রব্য সরবরাহ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সমাজ সচেতন, সমবায় সংগঠনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্নমন্ত্রী মোহন ধারিয়া। ঐ সূত্রেনিয়েই অন্যত্র প্রবন্ধে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করেছেন এভাবে, Though Co-operative Movement has made considerable mark in several area. it has to be conceded that glaring defects have developed in the movement which virtually defeat the very objectives of the noble movement. Powerful societies like Sugar Cooperatives, Spining Cooperatives or Banking Cooperatives have unfortunately fallen prey to political parties or leaders and this politicisation has taken a heavy toll of the system."

তাঁর কথায় এ আন্দোলনে প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব যাঁরা সমবায়ের সামগ্রিক স্বার্থে নিজেদের নিয়োজিত করবেন। শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশ আজ অনেক অগ্রগতি করলেও দেশের ৫০% মানুষ আজও দরিদ্র অথবা দরিদ্রসীমার নীচে। আজও মোট কৃষিসজ্জন জমির অর্ধেক হয় উষর অথবা পতিত। ভোক্তা সমবায় এদেশে যথেষ্ট সম্ভাবনাময় হলেও এ পর্যন্ত যথাপ্রয়োজনীয় প্রসারে সক্ষম হয়নি। এখনও উৎপাদকরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর উপযুক্ত (remunaration) মূল্য পায় না। অন্যদিকে ভোক্তা সাধারণ উচিৎ দামে তাদের ভোগ্যপণ্য সংগ্রহে বঞ্চিত হচ্ছে। এজন্য সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে সমবায় সংগঠনমুখী করে তোলার অবকাশ আছে।

তিনি আক্ষেপের সঙ্গে বলেছেন, দেশ আজ প্রতিরোধহীনভাবে মুক্ত বাজার অর্থনীতিকে গ্রহণ করেছে। ভারতের পক্ষে বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তন ও প্রভাব থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা সম্ভব না হলেও পুরোপুরি এই বাজার অর্থনীতির সামিল হওয়া বিপজ্জনক।

I must state with all emphasis at my comand that free entry to multinational without any discrimination shall destroy the very fibre of the socio-economic structure of the country and may endanger our freedom itself. "

প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রকের প্রতি কটাক্ষ করে বলেছেন, অষ্টম পরিকল্পনার সমবায় উদ্যোগ বিষয়ে কোন ইতিবাচক উল্লেখই ছিল না। " The 8th Five Year Plan document does not even mention the name of the cooperative structure which has taken deep roots in many areas like credit, distribution, lift-irrigation, processing, marketing etc."

ডা: আর সি দিবেদীও মুক্ত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছেন, সমবায়ের চরিত্র ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা আর সম্ভব হবে কি না? উত্তরে নিজেই বলেছেন এই স্বাতন্ত্র্য বলতে তিনি কি বোঝেন?

It is an organisation of persons, autonomus and independent, controlled democratically by members themselves based on values guided by a set of cooperative principles..... It is with these characteresties and identity that a cooperative becomes cooperative. If these features do not exit a cooperative ceases to exist in its real, genuine form. "

তাঁর মতে আজ এ আন্দোলন এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ব্যর্থ, সমবায় আন্দোলন স্বশাসিতও নয়, স্বাধীনও নয়, They are highly bureaucratised officialised and politicalised .... the value base of cooperation in extremely weak. Govt. intervention and interference is all pervasive."

এতৎসত্ত্বেও তাঁর বিশ্বাস নতুন অর্থনীতির পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম যদি সুদূরহত প্রচেষ্টায় সব ধরনের অনুপ্রবিষ্ট দুর্বলতা দূর করতে পারি। তাঁর প্রধান শর্ত হল বিশ্বাসযোগ্যতা। গুণগত বিচারে, সার্থক পরিষেবার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সংগঠিত করা গেলে এই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অস্বীকার করার বোধহয় কোন সঙ্গত কারণ নেই যে সরকারি হস্তক্ষেপ সর্বভারতীয় সমবায় আন্দোলনে সদা পরিলক্ষ্যমান। প্রতি রাজ্য সমবায় আইনেই প্রশাসক নিয়োগের ক্ষমতা সরকার অথবা সমবায় নিবন্ধককে দেওয়া হয়েছে সমবায় সমিতির আভ্যন্তরিক পরিচালন পর্ষদ ভাঙ্গিলে, অব্যবস্থাপনা, বিধি বহির্ভূত ত্রুটি বিচ্যুতি যখন সদস্য সাধারণের সমূহ বিপদের কারণ বলে অনুমিত হয় তখন এই প্রশাসক নিয়োগ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য রাজনৈতিক প্রভুত্বের ছত্রছায়ও প্রত্যক্ষ করা যায়। এই অভিযোগের অভ্যাস প্রমাণের জন্যই প্রয়োজন প্রশাসন নিয়োগের অব্যবহিত পর থেকে সমিতির সমিতির পরিচালনা ও আভ্যন্তরিক ব্যবস্থাপনার বস্তুনিষ্ঠ সঠিক মূল্যায়ন। যদি দেখা যায়।

প্রশাসকের কার্যকালে সংষ্টিষ্ট সমিতির ব্যবস্থাপনায় আরও অবনতি ঘটেছে বা তাদের মনোনীত ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সমিতির ব্যবসায়িক ক্ষতির পরিমাণ অনেকক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে বা পরিচালনার স্বচ্ছতার পরিবর্তে অধিকতর জটিলতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে তবে সেই প্রশাসকদের শুধু অপসারণই না অবশ্যই সহ উপযুক্ত শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা বর্তমান আইনে প্রায় নেই বললেই চলে।

সমবায় আন্দোলনে সরকারি পোষকতা অবশ্যই বাঞ্ছিত। তবে শুধু এ কারণেই অকারণ খবরদারী স্বাভাবিক প্রশাসনিক দক্ষতাকে খর্ব করে, স্বাধীন বুদ্ধি বা বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতের বিবেচনা সম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জড়তা আনে। সেজন্যই এক্ষেত্রে সরকারি ভূমিকা রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত অথচ সৃজনশীলক ধরণ হলে ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন-পরিচালনা ক্ষেত্রে যথা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে। অকারণ হস্তক্ষেপ বা তার আসন্ন আশঙ্কার পরিবর্তে গঠনমূলক, সংশোধনমূলক পরামর্শ সমবায় আন্দোলনের ওপরও প্রভাব সহায়ক হবে।

এই অর্থে প্রয়োজন বিভিন্ন স্তরের সমিতির কার্যকলাপ নিয়মিত মূল্যায়ন ও তার ভিত্তিতে যথা প্রয়োজনীয় উন্নয়নমুখী কার্যকর পরামর্শ ও action programmes গ্রহণের সহায়ক।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমাদের রাজ্যে কর্মরত কলকাতা সমবায়ের অসামান্য অগ্রগতি। কিন্তু নগর জীবনে সমবায় আন্দোলনের উদ্যোগে শহরাঞ্চলীয় কলকাতা সমিতির বিকাশ তেমন ঘটেনি। নিশ্চিত কয়েকটি কারণ ছিল। কলকাতা বা তার উপকণ্ঠে এর আশানুরূপ প্রসার ঘটানো সম্ভব করা যায়নি। সাম্প্রতিককালে সমবায় দপ্তরের ও রাজ্য সমবায় মহলের পরামর্শে ও প্রচেষ্টায় বছর পাঁচ-ছয় পূর্বে কলকাতা শহরের সকল এলাকায় যেন কয়েকটি শহরাঞ্চলীয় কলকাতা সমিতি সংগঠিত করছে যার মধ্যে শুধুমাত্র মহিলা সদস্য সংগঠিত সমবায়ও আছে। এ দুটিই অনেকের কাছে কারণ পশ্চিম ও দক্ষিণ কলকাতার প্রথম শহরতলিতে এ ধরনের সমিতি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। আমাদের রাজ্যেও এমন না হওয়ার কারণ নেই। মনে হয়, এই কয় বছরে সংগঠিত সমিতিগুলির ব্যবস্থাপনা, পরিচালনকোশলতা, অর্থ সংগ্রহ ও লগ্নি, সদস্য সাক্ষরতার পৃষ্ঠপোষকতা, ঋণ গ্রহীতাদের শ্রেণী বিন্যাস ও গৃহীত ঋণ পরিশোধের স্বাভাবিকতা প্রভৃতি নিয়ে একটি সহায়ক সমীক্ষার প্রয়োজন, কারণ কোন কোন দুর্বল সমিতির সংগঠনের প্রথম অবস্থায় যদি সংশোধনমূলক পরামর্শ দেওয়া যায় তবে শুধু ভবিষ্যতে অধিকতর জটিলতার সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে। প্রয়োজন সমবায়ের মুখপাত্র, পুস্তিকা ও প্রদর্শনমূলক অনুসন্ধান নয়। ইতিবাচক পরামর্শই সদ্য গঠিত অথচ অনুপ্রবিষ্ট সামাজিক দুর্বলতা প্রতিহত করে তাদের ব্যবসায়িক সাফল্যে উত্তীর্ণ হবে সহায়ক করবে। এমনি উদ্যোগ বিভিন্ন স্তরের সমবায় ক্ষেত্রেই সমবায় দপ্তর বা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেষ্টায় নিতে পারলে আন্দোলন শক্তিশালী হবে।

সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে সমবায় আন্দোলন আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে নিজ শক্তিতেই তা প্রদায়িত হয়েই। মুক্ত অর্থনীতির কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনগত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অবশ্যানুযায়ী পরিবর্তন আনতে হতে পারে। পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সরকারি আনুকূল্য নির্ভর না হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায় উদ্যোগেও সামিল হতে হবে। তাই বলে আন্দোলনকে কখনই বন্ধুত্ব বলে অভিযুক্ত করার অবকাশ নেই। আন্দোলনের উষাকালে যে সরকারি পোষকতার এর জন্ম তা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত অব্যাহত এবং তা বন্ধ হওয়ার কারণ থাকতেই পারে না। আজ মুক্ত অর্থনীতির কারণে এ আন্দোলন বিরাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। সেজন্যই সাংগঠনিক পরিকাঠামো, ব্যবস্থাপনাগত ও পরিচালন সংক্রান্ত যে সব পরিবর্তন সময়োপযোগী ও আন্দোলন প্রসার সহায়ক বলে মনে হবে তা গ্রহণে দ্বিধার কারণ দেখি না। সেই সঙ্গে এ পরিবর্তন যাতে দ্রুত কার্যকর হয় তার নিশ্চিত সুষ্ঠি সমাজভিত্তিক নিশ্চিত প্রস্তুতি ও রূপায়ণের দিকে আন্দোলনের প্রবক্তা ও নেতৃত্বের মুক্ত মন ও স্বচ্ছ দৃষ্টি সমৃদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ☐

আমার এক বন্ধু তাঁর প্রথম কবিতার বই 'বিস্মরিত' প্রকাশ করেছেন। আমাকে বইটির একটি কপি উপহার দিয়ে বিনিময়ে চেয়েছেন কবিতাগুলির সার্বিক মূল্যায়নের মত নিয়ে আমার ভালো লাগার একটি ছোট্ট পত্রকপত্র। যে চিঠিটি লিখেছি তা আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি। কবিতার বইটি আপনাদের কাছে হাজির করতে না পারলেও সাধারণভাবে কবি ও কবিতা পরস্পরের মুখোমুখি এসে কোন্ প্রশ্নে পরিণত হয় তা জানবার চেষ্টা করেছি চিঠিটিতে।

প্রিয় সুধীর,

তোমার 'বিস্মরিত' পড়লাম। তোমার সৃষ্টির আনন্দ-ভাগ নিলাম। কবিতা ভালোবাসি কিন্তু নানা কারণে কবিতা পড়ার অভ্যাস আমার নেই। তবুও তোমার কবিতা নিয়ে দু-এক কথা বলতে গিয়ে কতটা ভুল হবে সে ভয় আমার থাকলো।

কবি যখন অভিমান করেন তখন আমার প্রত্যয়ের অবধি থাকে না ; আমার আমি আমাকে ফেরে ফিরি।

কবি যখন তাঁর কথা বলেন তখন আমি বিভোল হই ; কারণ তাঁর কথা সহজ-সরল মনি। আমি খুঁজে পাই আমার হারানো সুর।

কবি যখন প্রণয়ী হন আমার 'মৃদু হাসি' উপহার দিয়ে তাঁকে সমাদর করি।

কবি যখন অন্যের সঙ্গিনী হন তখন আমি তাঁকে দেখি অন্যের দিশারী।

কবি যখন উত্তর হন তখন বুক দুরু দুরু করে, অজানাকে আমিই আপন করে নিয়েছিলাম বলে।

কবি যখন ভোজ্যপুরুষ জন্য তাঁর করে আয়োজন করেন তখন আমি নিজু নয়ন ভুল সত্যের করে আনি।

তোমার কবি জীবনে উত্তরণ, অনুভূতি ও প্রতিভাতির নিবিড় মিলনে, সার্থক হোক।

ইতি —
বিনয়

নবদ্বীপ থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ

পরিচালিত

নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাটে

আধুনিক ডিজাইনের সর্বপ্রকার তাঁতের ও ছাপা শাড়ি, নবদ্বীপ শাড়ি, লুঙ্গি,
গামছা ও রেডিমেড পোশাক সস্তা দরে পাওয়া যায়।

প্রতি বৃহস্পতি, শুক্র ও রবিবার হাট বসে।

স্থান :

তাঁত কাপড় হাট ভবন

উত্তরার্ণ রোড, নবদ্বীপ

ফোন : (০৩৪৭২) ৪০৬৪৮

For the Interest of Co-operative Movement

Space Donated By

BURDWAN C. M. S. HIGH SCHOOL EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

B.C. Road
Burdwan
Phone : 66210

With Best Compliments From

CHINSURAH WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

Pearabagan Road
P.O. & Dist. : Hooghly
STD CODE NO. 033
Phone : 80-2433 / 80-2537

Nripen Chatterjee
Vice-Chairman

Ramsundar Ramani
Chairman

রামপুরহাট সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ

রামপুরহাট ● বীরভূম

ফোন : ৫৫-১৮৪

শাখা অফিস : কোটাসুর ব্রাঞ্চ (মহম্মদবাজার)

সাব-অফিস : নলহাটী, মুরারই

"আমরা কাজ করি ক্ষেতে-খামারে, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পে,
গৃহে এবং মানুষের প্রয়োজন মেটাতে"

এছাড়াও আমরা চালু করেছি ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

গৌরাঙ্গ মণ্ডল
সহ-সভাপতি

দুর্গাদাস ঘোষ
সভাপতি

With Best

Compliments From

PHILIPS EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

7, Justice Chandra Madhab Road
Calcutta - 700 020

তুমি শোষকের ত্রাস, মহাজনের ফাঁস
তুমি সমবায়, তুমি সমবায়।

❁ ❁ ❁ ❁

এ্যাসোসিয়েশন অব হুগলি ডিস্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ ইঞ্জিনিয়ার্স

হুগলি ইউনিট, সেকো

❁ ❁ ❁ ❁

রবীন্দ্রনগর সুপার মার্কেট (দ্বিতীয় তল)
পো:-রবীন্দ্রনগর, হুগলি

With Best Compliments From

KULTI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITY LTD.

P.O. : Gram-Kulti (Burdwan)

শারদীয়ার অভিনন্দন গ্রহণ করুন —

[redacted]

রেজিঃ নং ৬৮০/৮১(হাওড়া)

প্রধান কার্যালয়

এল এম সি সরণি

পোঃ-বাকসাড়া, হাওড়া - ৭১১ ৩০৬

ফোন নং : ৬৫৮-৬৩৮২

জগাছা এক্সটেনশন কাউন্টার

জগাছা হসপিটাল রোড,

পোঃ- জি আই পি কলোনি

হাওড়া - ৭১১ ৩২১, ফোন নং ৬৫৩-৩৬৯০

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

তুমি হতাশার ভাষা, বেকারের ত্রাতা
তুমি সমবায়, তুমি সমবায়

বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

বর্ধমান ইউনিট, সেকো

সমন্বয় ভবন
৩৮, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩ ১০১
দূরভাষ ৬৬৬৩০

যেদিন শিউলি বকুলের পবিত্র পরশ
গায়ে মেখে চিৎকার করে বলবো
বন্ধু সমবায়ই মুক্তি, সমবায়ের জয়ডঙ্কা বাজাও
সেইদিন শান্তি

মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ এ্যাসোসিয়েশন

মুর্শিদাবাদ ইউনিট, সেকো

অন্বয়
২০/৪, চিত্তরঞ্জন দাস রোড
বহরমপুর - ৭৪২ ১০১

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন —

গুড়াপ তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৮ এইচ জি তং ১৫-২-৭৩

গ্রাম ও পোঃ - গুড়াপ, জেলা - হুগলি

(ভারত সরকারের হস্তশিল্প বিকাশ কেন্দ্র ও উন্নত রন্ধনশালা প্রকল্পে সাহায্যপ্রাপ্ত)

★ ধনিয়াখালি তাঁত শাড়ি, ধুতি উৎপাদন ও বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
★ নিজস্ব রং কারখানায় সুতায় উপর উজ্জ্বল ও পাকা রং করা হয়।

অফিস ও গোডাউন ঃ গুড়াপ, নাগপাড়া
বিক্রয় কেন্দ্র ঃ গুড়াপ, সিনেমাতলা

পথনির্দেশ ঃ ট্রেনে — হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে গুড়াপ স্টেশনে নেমে। বাসে - চুঁচুড়া-পাণ্ডুয়া ২৩ নং ও কালনা-গুড়াপ ১১ নং বাসে গুড়াপ বেলতলা স্টপেজে নেমে যাওয়া যায়।

তারকনাথ দত্ত
সম্পাদক

অশোককুমার ওঝা
সম্পাদক

কৃষি ও কৃষকের সেবায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগম লিঃ

(সরকারি সংস্থা)

উন্নত মানের ও জাতের সার্টিফায়েড ধান, পাট, গম, আলু, ডালশস্য, তৈলবীজ, সবজির জাতের বীজাকণি (ট্রিন এক্সপ্রেস, মেরাকলা) টমাটো (কেশর হাইব্রিড-১) ও শাকসব্জি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের নির্ভরযোগ্য সরকারি প্রতিষ্ঠান

রাজ্য বীজ নিগমের বীজই বাজারের সেরা বীজ
উত্তম বীজ ☆ অধিক ফলন ☆ বাড়তি লাভ

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বীজ নিগমের জেলা দপ্তর ঃ

কোচবিহার ঃ রাজবাড়ি স্টিট, সুভাষ পল্লী। উত্তর দিনাজপুর ঃ উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ। মালদা ঃ আঁইরামপুর, মকদমপুর।
মুর্শিদাবাদ ঃ পঞ্চানন্দতলা, বহরমপুর। নদীয়া ঃ কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন। বর্ধমান ঃ শ্রীপল্লী, কলাইনাট্, সাল। বহরমপুর ঃ বড়মরান, সিউড়ি।
বাঁকুড়া ঃ টামনারিতলা। মেদিনীপুর ঃ কাঁসাইতলা আবাস। উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ২১ কে এন সি রোড, বারাসত।
পুরুলিয়া ঃ অশিনিতলা কে সি সেন, মুরলি নদিয়া। হুগলি ঃ বিবেকানন্দ রোড, সিপুলপাটি। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ নিউ টাউন, ভরশুডাঙ্গা।

সদর দপ্তর ঃ ৪, ভবানীদাদু সেন (বাইলেন), কলিকাতা - ৭০০ ০১২
ফোন ঃ ২২৫-৯০১১, ২৭-৪৩৫৯ , ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২৭৪৫৯১

ছোট গল্প

শেষ সংবাদ

নীলকণ্ঠ সরকার

সকাল থেকেই আকাশটা কেমন থেন ভারছে। থোকাখরে ঘুমে নিলে থেমন হয়। কুয়াশা-কুয়াশা, থোলাটে-থোলাটে ভাব। সূর্যদেব যে উঠেছে থোঝাই যাচ্ছে না। তবে কি মেঘ নামবে, ঝড়-বৃষ্টি হবে। আকাশ থেমন মুখ ভার করে বসে আছে, বলা যায় না। মানুষটা আজও সাত-সকালেই শহরের হাসপাতালে গেছে। তার কী যে হয়েছে, থোঝাই যাচ্ছে না। দিন-কে-দিন শুকিয়ে একেবারে নাড়াকাঠি হয়ে যাচ্ছে। এত যে খাচ্ছে-দাচ্ছে, তা মোটেই গায়ে লাগছে না। সারাটা দিন শুয়ে কিংবেয়, কাশে, হাঁপায়। শরীরটাও দুর্বল। সুধীর ডাক্তার এতদিন চিকিৎসা করেও কিছুই হল না। তাই শঙ্করানন্দকে সঙ্গে করে শহরে গেছে। ফিরে আসতে আসতে সে-ই সন্ধ্যা। চিকিৎসা করালে, ডাক্তার দেখালে, ওষুধ থেলে — এসব কি কম ঝক্কি? লাইন, লাইন লম্বা লাইন। শরীর খারাপ হলে যে তাড়াতাড়ি হবে — তা তো হবার নয়। পৃথিবীতে যে কতরকম লোক আছে, কত রকমের যে রোগ, হাসপাতালে না গেলে তা থোঝাই যায় না।

সেবার পালাল হবার সময় নিয়েই বুঝেছে এই যাত্রাটা — যে, হাসপাতাল তো নয়, যেন নরকগুলজার। ধুন্ধুমার-কিয়াকাণ্ড পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। ওখানে গেলে অসুখ সারবে কি, আরও বাড়বে। আর মানুষ মারবে। যে একবার ভর্তি হবে সে আর ফিরে আসবে না।

যমুনা নদীর ঘাটে বাসন মাজতে-মাজতে বলা কথাই তাবছিল রাধা। কে যে এই নাম রেখেছিল, তাকে এখন পেলে দেখাতো মজা। রাধার কি এত দুঃখ ছিল? রাতদিন সংসারের ঘানি ঘোরাও। একটুও বিশ্রাম নেই। বিছানা থেকে উঠেই কাজ আর কাজ। কাজের যেন আর শেষ নেই। একটার পর একটা লেগেই আছে, লাইন দিয়ে — উঠোন ঝাঁট দাও, গোবর-জল ছিটাও, ঘরের চারপাশ লেপো। বসি কাপড় ছাড়ো, রান্নাঘরে ঢোকো, সকালের খাবার তৈরি করো — এইসব করতে করতেই দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যায়। কোনমতে সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে নিয়ে একমুঠো খেলা। তারপরে ছেলেটা কাঁদবে, বড়টা টেঁচাবে। এই খাও, সেই খাও। এই করো, সেই করো। — নাঃ আর ভাল লাগে না। এই সংসার থেকে মুক্তি পেলে বাঁচি। কিন্তু মুক্তি কি অত সহজেই মেলে? ছেলেটার কথা ভেবে কোথাও তার যাওয়া হয় না। কি করেই বা যাবে? সংসারের টান বড় টান। মায়া — এ-সবই মায়া। মায়াতেই সব শেষ করে দিল। শরীর থেকে এই মায়া ত্যাগ করতে না পারলে তার আর মুক্তি নেই। মানুষটার নাম আসলে হরিগোপাল। সে-ই হরি, সে-ই কৃষ্ণ। রাধার সঙ্গে শুধু এই নামেই মিল। গোপবধূকে প্রেম নেই। সারাটা দিন শুধু কাঁদি কাঁদছে — এটা হয়নি কেন? ওটা হয়নি কেন? এটা কি করলে? বাপের বাড়িতে কোন কাজই শেখনি, করওনি। এইভাবে কেউ সারাদিন খোঁটার তোপে রাখে? ছি ছি, এই পাঁচজন শুনতে পায় না কি?

— "বেশ তো, তা ফেলে দিতে গেলে কেন? আর ভাল না লাগলে করবে না। খিচ খিচ করবে না। আমি যা পেরেছি, তাই করেছি।"

— " কি বললি বজ্জাত মাগি? বড় বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। কালনাগিনী ফোঁস করে ওঠে। সেবা একদিন বিবাগীও হেয়েছে।

— "তাহলেই হল।" রাধা ঘুরে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে চিমটি খায়। হরিগোপাল ইঁদুরের মতো গর্তে ঢুকে যায় যেন। রাধা তখন হেসে ফেলে। লোকটাকে কি বলবে। কলিজার মতো লোকটা। ওকে দেখলে মায়া হয় রাধার। দুঃ দিলে উড়ে যাবে। বিয়ের সময় যা ছিল, ছেলে-মেয়ে এখন আরও খারাপ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। আগে যারা দেখেছি, তারা এখন দেখলে আর তাকে চিনতেই পারবে না। মানুষটাকে এখন কালচেরে করেছে। এ যাত্রায় সারবার নয়।

ডাক্তার শঙ্করানন্দ কিন্তু অন্য কথা বলে। নিয়মতো চিকিৎসা করলে আবার রোগ সারে না, এ হয় না কি? সুধীর ডাক্তার আসলে রোগই ধরতে পারেনি। কি ওষুধ খেয়ে? আজকাল মেডিসিনপ্রধিতে হবে না। আয়োপ্যাথ দেখাতে হবে। হাসপাতালে যাবে না। ঘুষ চায়। হাসপাতালে দেখালে বলি ভর্তি করে নেয়। আর যদি কোনদিন বাড়িতে না ফেরে। ওঃ, মৃত্যুকে কি ভয়। মৃত্যু তো একদিন আসবেই। কারো একদিন আগে, কারো বা একদিন পরে। মানুষ তো এই সংসারে চিরকাল বাঁচতে আসেনি। শঙ্করানন্দ আবার এই তথ্যটা দিয়ে। যা কাজ-কারবার দুজনে মিলেই করে। কেন মনে হবে একই মায়ের গর্ভে দুজনে জন্মেছে। ওদের দুজনের এত মিল, সহজে কোথাও অন্য কারো মধ্যে চোখে পড়ে না। দুজনকে দেখতেও প্রায় একই রকম। পটলচেরা চোখ, টিকালো নাক, আলুকেতের মতো চওড়া কপাল। বেঁটে-খাটো। চেহারায় যে এত মিল হতে পারে, সহজে ভাবা যায় না। অনেকেই বলে যমজ ভাই। কিন্তু কথা বলতে শুরু করলে ধরা পড়ে যায়। অনেকটা অমিল আছে। শিবনিকে নাড়াকারীর মতো হলে কি হবে, শরীরে কোন রোগ নেই আজও শঙ্করানন্দের।। হরিগোপাল লেখাপড়া জানে। হাইস্কুল পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পরীক্ষা দেয়নি। সেই সময় বাড়িতে কি একটা যেন অঘটন ঘটেছিল। সেকথা রাধাকে বলেওছিল একবার, কিন্তু সেকথা এখন আর রাধার মনে নেই। মাতব্বর না থাকলে ওকে আর শহরে নিয়ে যেতে পারত না। যা অসুখ। দিনে-রাতে বত্রিশ বত্রিশ বিড়ি খায়। একটা বিড়ি ধরাতেই আবার একটা। কিন্তু কলজেই ভাঙা কাঁসির মতো বেরিয়ে ওঠে। বলে —

— "তোর বাপের কি? আমি কিভাবে টানুম, কিভাবে বিড়ি ধরামু তাতে তোর কি? তুই কি বিড়ি খাস? বিড়ি নিয়ে মেয়েছেলে কথা বলবে কেন? দুনিয়া উল্টে গেল নাকি?"

— "খুব সহজে কথা বলো। মেয়েছেলে হয়েছি বলে মুখে যা আসে তা-ই বলবে নাকি? তুমি কি পেত্নেছো কি? তাক্তার কি বলে জানো? আজকাল মেয়েছেলে আর পোঁয়াছেলের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সবাই সমান অধিকার।"

— "কালি আইল দেখাবে না। আমার কাছে ওসব আইন দেখিয়ে কথা কইবে না।"

— "কি করবে শুনি। মারবে নাকি আমাকে? গায়ে হাত তুলে দেখো একবার। দেখাচ্ছি মজা।" বলেই রাধা উঠে দাঁড়াল।

হরিগোপাল চুপ হয়ে গেল। রাধা মানে একবার ধরে নিয়ে উঠলেই, চোখ রাঙালেই মানুষটা একেবারে মিইয়ে পড়ে। রাধা নীচু করে ফুসফুসের ভয়ঙ্কর ওষুধ দেয়। তখন রাধা মনে মনে হাসে। এই লোকটা আসলে দেবে কিছু নিতে না। অসুখ তো পাঁচটার। এই মানুষটা একটানা ভুগে গেল। পৃথিবীর এত ডাক্তার, ওষুধ গেল, এত হাসপাতাল, লোক

কালীপুজোর মতন কি হয়েছিল। কত লোক এসেছিল এক রাত ধরে। সেসব কথা জানে না। মাতব্বরের সঙ্গে মেলার দিকে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তারপর বিড়ি, গাঁজা টেনে বাসায় ফিরেছিল। কি লোকের বাচ্চা। একে নিয়ে যে কী করবে, সংসারের দিকে মন নেই। অভিযোগ সব ঐ মাতব্বরই চায় যেন। সঙ্গে থাকে দুই-একদিন। আসল কোনদিন থাকেও না। একেবারে বাদুড়ে-স্বভাব। উঠোনেতে বসে একটার পর একটা বিড়ি খাবে। আর মাঝে মাঝে শব্দ করে কিচ কিচকের করে উঠবে — 'আল্লা'। 'ভগবান' বলবে না। এই 'আল্লা' কথা নিয়ে কতদিন রাধা বলেছে। হেসেহেসে কিচকের করে বলে

— "আমি যা বলি, তাতে তোর কি? তোর মুখের কথা বলবো? আমি, আমি যা ভাল বুঝেছি বলেছি। খবরদার, মুখের ওপর কথা বলবি না।"

রাধার বলে — "এ আবার কোন নিমি কথা শিখি? মাতব্বরের সঙ্গে থেকেও বুলি পাল্টায়নি। থাকুক আল্লা মাতব্বর। তাকে না বলেছি তো, আমার নাম রাধা-ই নয়।"

— "মাতব্বর দেখানি না আমার কথা। তোদের কাছে সে মাতব্বর হতে পারে, আমার নয়। আমি ওকে তোর দিইনি। তোরাই নিয়েছিস।"

— "বেইমান, তুমি যেতে কেন? তুমি ওরু যেতে। যেতে না কিন্তুই।"

— "কি নিয়ে, হারামজাদি? কি নিই? আমি ওটাকে খাই? আমাকে ও খায়।"

— "খবরদার, ও কথা বলো না" রাধা চারপাশে তাকাল। মাতব্বর আসছে না। মাতব্বরের আসা-যাওয়ার সময় নেই। আসলে মাতব্বরে যেতে এই পথেই হয়। আসা-যাওয়ার পথে কয়েক-অকারে একবার হাঁক দেয়। কোনদিন ইচ্ছে হল তো এক গ্লাস জল খেল। একটা বিড়িতে টান দিল। নয়তো, চলে গেল। কারোর কথা থাকলে বলল, নয়তো এধার-ওধার কথা বলে কাজে ফিরে গেল।

এই মাতব্বর অবশ্য-প্রকার। এদের সঙ্গে আমাদের আছে বলে অনেক কিছু বলতে সাহস পায় না। মনে সমীহ করে চলে। দু-চারজন অবশ্য সম্পর্কের কথা বলে। কিন্তু রাধা জানে লোকটা ভাল। সাদা-মানুষ। বাইরে-ভিতরে একইরকম মানসিকতা। মনে কোন প্যাঁচ নেই। কুমতি থাকলে মেয়েরা বুঝতে পারে। বিয়ের পর থেকেই দেখে আসছে। একবারের জন্যও মনে হয়নি যে লোকটার কোন কুমতলব আছে। সোনার মানুষ। একপক্ষে ভাল যে হরিগোপাল সন্দেহ করে না। অবশ্য ওর কি অতদূর ছোঁয় আছে? ওসব ব্যাপার কোন কত ছেড়ে! নিজের পাওনাটুকু পেলেই হল। ওসব খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। আসলে মুখ ভাল না হলেও, মনটা সাদা। এইজন্য রাধা মানুষটার ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারে না। মায়া হয়। কাছে টেনে নেয়। এসব ব্যাপার গা-সওয়া হয়ে গেছে। নিজের কাজ হয়ে গেলে, মানুষটার আবার যে-কে সেই রূপমূর্তি। এসব দেখে লোকে বলে — ওরা সংসার করে কিভাবে! যেন সাপে-নেউলে সম্পর্ক। মজাটা এখানেই। এ এক-রকমের মানুষ। রাধা নিজের মনেই হাসে।

— "কি লো হাসছিস যে?"

রাধা মুখ ঘুরিয়ে দেখে বাদুনদিদি। বাদুনদিদি বলে — "কার কথা মনে করে হাসছিস?"

— "আমার কার কথা?"

— "হাসপাতাল থেকে নিয়েছে?"

— "না।"

— "আসলের অবস্থা ভাল না। মেয়েদ মনে, বড় উঁচুরে। দেখছিস, আকাশটা মুখ গোমরা করে রয়েছে। তোর কি যেন ভয়-ভয় নেই? এখন এখন এই ঘাটে কতক্ষণ বসে আছিস?"

— "এই তো হয়ে গেছে। আমি।" রাধা কাপড়-কোপড় সব গুছিয়ে নিয়ে উঠল। আকাশের দিকে একবার তাকাল। সত্যি আকাশটা থমথম করছে। তাড়াতাড়ি পা চালাল, তার মনে বড় উঁচুরে।

রাধা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে ফিরতেই দেখল ছত্তরের পাহাড় পড়ে নয়েছে। যেন ঝোড়ো হাওয়া দিচ্ছে। চারপাশে গোঁ-গোঁ আওয়াজ। সুপারি গাছগুলো দোল খাচ্ছে। উঠোনে কাপড়-চোপড় তুলে নিতে নিতেই মুষলধারে পড়ল। টিনের চাল ছেয়ে যাচ্ছে। যেন বড় বড় আকারের শিল পড়ছে। সেইসঙ্গে কী চড়বড়-চড়বড় শব্দ। চারপাশে উথালপাথাল-ঠেসাঠেসি। রাধা ছেলেমেয়েদের নিয়ে চৌকির নীচে ঢুকে গেল। আকাশটা ভেঙে পড়ছে। এলোমেলো বাতাস। সঙ্গে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টি। উঠোনে সাদা ধবধবে শিলের পাহাড় হয়ে গেল। চৌকির নীচ থেকেই দেখছে রাধা। তার-সমান শিলের পাহাড়। এখন একটু কমেছে। রাধা চৌকির নীচ থেকে বেরিয়ে এলো। চারপাশে কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। ঈশান বাতাস বইছে। ঘড়ির কাঁটার দিকে দেখার উপায় নেই।

রাধা শীতে কাঁপছে। আকাশ যেন কারো কাছে হেরে ভেঙে পড়ছে। পাশের বাড়ি থেকে কে যেন ঝুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদছে কেন? কি হল আবার? ঘরের কোণ থেকে রাধা একটা কোদাল নিয়ে এল শিলের পাহাড় সরাবার জন্য। যদিও তা রাধার একার পক্ষে সম্ভব নয়। চিৎকার-কান্নাকাটি যেন থেমেই চলেছে। শিল অবশ্য এখন আর পড়ছে না। প্রত্যেক বাড়িতেই লোকের ঘটনা। এদিক-ওদিক-চারিদিকেই লোক ছোটাছুটি করছে।

কী চিৎকার করছে। 'রাধা' বলে ডাকছে। রাধা মুখ বাড়িয়ে দেখল বাদুনদিদি এই দিকেই ছুটে আসছে।

— "রাধা সর্বোনাশ হইসে।"

— "বাদুনদিদি, বল না কি হইসে।"

— "শাঙনের কোন ঘর ভাল নেই। শিল পইড়া, ভাইঙ্গা চুরমার হইয়া গেসে। কত লোক হাসপাতালে গেসে। বিলপাড়ার কেতা জানি মারা গেসে। রাধা ভাইঙ্গা চৌচির। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই আকাশ ফিকা পড়তাসে।"

— "তার বাবার তো অবশ্যও পাথরের ফিকা ফিরে নাই।"

— "বড় রাস্তায় বলে জোড়া লাল।"

— "কি কও বাদুনদিদি, কই।"

— "হ, হাছ কথা, কত লোক দেখতে গেসে।"

— "আমরা পরাণতলো ভাল লছে না। মাতব্বর জোর কইরা নিয়া গেল আর। যাইতে তো চাইছিল না।"

বাদুনদিদির সঙ্গে রাস্তায় বেরোল রাধা। কাকের ওপরে কি পা রাখা যায়। একে ঝড়, আবার তার শিলিল। চারপাশে ভাঙচুর। কারো মাথা ফেটেছে। কারো পায়ে লেগেছে। হাত ভেঙেছে। কোন বাড়িরই যে ঠিক অবস্থা নেই। সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। বাদুনদিদির সঙ্গে রাধা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সেই সময় পুবপাড়ার দিক থেকে মাতব্বরের বউ ছুটে আসছে। — "হায় আল্লা, কি হইল। আমার কি হইল।"

রাধাকে দেখে বাদুনদিদি থামকে দাঁড়াল। বলল — "দিদি, তুমহিনে লো পরে কিন্তু আসবার সময় শিল পইড়া সব শেষ। দিদি গো, আমি এখন কি করব।"

জহরাবিবির সঙ্গে সঙ্গে রাধাও গলা মিলিয়ে চিৎকার করে উঠল। — "আমার কি হইল গো। কেন গেল সহরে। হাসপাতালে যাইতে চাইছিল না। দিদি গো, কি করুম।"

— "চলো দিদি।"

জহরাবিবির সঙ্গে আরও দুজন মহিলা রয়েছে। রাধাও বামুনদিদির সঙ্গে। আরও অনেকেই ওদের সঙ্গে হাঁটছে। রাধা তো চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে জোর করে বলছে — "আমার কি হল গো। কেন গেল লোকটা।"

জহরাবিবিও কম যায় না। সেও চিৎকার করে বলছে — "আমার কি হইল গো।"

দলে দলে লোক ছুটছে। রাধার আঁচল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। জহরাবিবিরও তাই। গ্রামের কাছে আসতেই জটলা। চারপাশে লোক। পুলিশ কাউকেই লাশ ঘাটের কাছে যেতে দিচ্ছে না। থানার বড়বাবু এলে শহরে নিয়ে যাবে। লাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা। ঠেলেঠুলে সামনে গিয়ে রাধা চিৎকার করে বলছে — "আমাকে যেতে দাও।" পুলিশ যেতে দিচ্ছে না। জহরাবিবিও দেখবার জন্য পাগল। নিজের পুরুষমানুষটিকে দেখবার জন্য পাগল। পুলিশ কাউকেই কাছে যেতে দিচ্ছে না। কড়া হুকুম। বামুনদিদি রাধাকে ধরে রাখতে পারছে না। চুল সব এলোমেলো। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। জহরাবিবিরও সেই একই অবস্থা। দুজনেই কাঁদছে।

ওদের কান্না শুনে কেউ এগিয়ে আসছে না। কাছেও যেতে দিচ্ছে না। বাক্স ভর্তা করে পুলিশের ভ্যান এল। তারপর লোকজন সরিয়ে দিয়ে পুলিশ লাশ ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল শহরের দিকে। রাধা আর জহরাবিবি দুজনেই রাস্তার ওপরে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউই ওদের দুজনকে থামাতে পারছে না। ওদের কান্না শুনে পুবপাড়া থেকে আরও লোকজন ছুটে এল। পশ্চিমপাড়া থেকেও লোকজন এল। কিন্তু কেউ ওদেরকে থামাতে পারছে না। ওদিকে বেশ রাত হয়ে গেছে। সব লোকই যে যার নিজের নিজের কাজে চলে গেছে। এদিকে রাধা আর জহরাবিবি দুজনেই চিৎকার করে কেঁদে চলেছে। তাদের পাশে বামুনদিদি ছলছল চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গ্রামের লোকেরা একরকম জোর করেই ওদেরকে বাড়িতে নিয়ে এল। নিয়ে আসা তো নয়, যেন একটা যুদ্ধ জয় করা। ওদের কান্নায় গ্রামের সকলেই কাঁদছে। এইভাবেই ক্রমশ রাত শেষ হল। জহরাবিবিও তার নিজের বাড়ি যায়নি। রাধাদের ঘরেই রয়েছে। দিল সবই গলে জল হয়ে গেছে। আকাশ এখন ঝকঝকে পরিষ্কার। সূর্য খুব তেজ ছড়িয়ে আকাশে উঠেছে। আবার গ্রামের লোক বাড়ির বাইরে এসে ওদের দুজনকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে।

ওদের দুজনের কারোরই কোন হুঁশ নেই। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। গোঙাচ্ছে আর বিলাপ করছে। বলছে — "ওগো, কই গেলা গো! আমারে নিয়া যাও।" ওদের বিলাপ শুনে সব কাজ ফেলে দিয়ে হরিগোপালের উঠোনে সব লোকই ভিড় জমিয়েছে।

বামুনদিদি বলল — "আর কাঁদিস না বোন। ছেলে-মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়েও অন্তত এবার ক্ষামা দে রে তোরা। তুই যদি অমন করিস, তাহলে ওরা যাবে কোথায়? গতকাল থেকেই ওদের পেটে কিছুই পড়েনি। চুপ কর, একটু ধৈর্য ধর।"

রাধা কিন্তু সেকথা শুনতেই চায় না। বামুনদিদিকে ঘরে উঠে দাঁড়াতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। জটলার ভেতর থেকে কে একজন যেন বলল —

— "ঐ তো মাতব্বর আর হরিগোপাল দুজনেই ফিরছে।"

বামুনদিদি যেন তা দেখে মৃত দেহের মতো লাফিয়ে উঠল। বলল — "সত্যি, নাকি মিছা কথা।"

লোকটা বলল — "শিলপাড়ার জন্য গতকাল রাতে ওরা ফিরতে পারেনি।" কথাটা শুনে বামুনদিদি ছুটছে। জহরাবিবি রাধাকে ঘরে বলল — "চল বোন, ওঠ। ও তো ওরা দুজনেই আসছে।"

রাধার দুই চোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। জহরাবিবির চোখেও যেন বন্যার পানি। দুজনেই দুজনকে ধরে কাঁদছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। চোখের জলে নিজের মানুষটাকে ঝাপসা দেখছে। তারপর আস্তে আস্তে জল সরে গিয়ে ক্রমশ মানুষটা চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তবুও রাধার চোখে জল। রাধা জহরাবিবির বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

জহরাবিবির চোখেও জল। দুজনের চোখের জলে সমুদ্র হয়ে গেল নদী। ❐

শেষ সন্ধ্যা

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন ডালহৌসি পাহাড়ে।

সেবার সিপাহী যুদ্ধের বছর। বারুদের গন্ধে ম ম করছে ভারতবর্ষ। সেকালের ভারতবর্ষে না ছিল রেলগাড়ি, না মোটরগাড়ি। দেবেন্দ্রনাথ চলেছিলেন নৌকা করে। জলপথে। আম্বালা ফোর্টের তলা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন, হঠাৎ এক অপরূপ দৃশ্য তিনি দেখতে পেলেন। দেখলেন — শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শা-কে। কেল্লার বুরুজের ওপর দাঁড়িয়ে তিনি ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। সানন্দে সপারিষদ। চোখে মুখে সাম্রাজ্য জয়ের খুশি। তৈমুর-বাবরের বংশধর সেদিন ঘুড়ি খেলাতেই ব্যস্ত। ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি অতীতের স্মৃতিমাত্র।

কয়েক মাস পরে ডালহৌসি পাহাড় থেকে যখন নেমে আসছেন, তখন আর এক ছবি দেখলেন দেবেন্দ্রনাথ। কালকূটের কাছ দিয়ে চলেছেন তিনি। মিউটিনির পর্ব সমাপ্ত। আগে-পিছে সশস্ত্র পাহারা। বাহাদুর শা-কে ধরে নিয়ে চলেছে ইংরাজেরা। শেষ মুঘল দূতের অবসান ঘোষণা করে। ঘুড়ি ওড়ানোর পালা শেষ করে পা-পা করে চলেছেন কারাগারে। নির্বাসনে।

মুঘল-মহিমা এইভাবেই একদিন অস্ত গেল। ঐ অস্ত সন্ধ্যার মুহূর্তে দাঁড়াটির সাক্ষী হয়ে রইলেন কলকাতার এক বাবু। ইতিহাসে এ আরেক আশ্চর্য ঘটনা। বড়োই বিষাদে ভরা! — দেবেন্দ্রনাথকে এ-দৃশ্যও দেখতে হয়েছিল।

● কৈলাশ মুখোপাধ্যায়ের 'বাবু মৌরবের কলকাতা' গ্রন্থ হইতে সংকলিত।

WITH
BEST
COMPLIMENTS
FROM :

WATER WING CIVIL DEFENCE EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

Regd. No. : 11/Cal-1992

81/2/2/. PHEARS LANE
CALCUTTA-700 012
PHONE : 27 8033 (EXTN. 37)

সমবায় একমাত্র মুক্তির পথ। সমবায় মানুষের
অর্থনৈতিক উন্নতি ও অগ্রগতির একটি অংশ

**বর্ধমান হোলসেল কনজুমার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ**

মনিমার্ট, জি টি রোড, বর্ধমান
দূরভাষ : ৬২৩৭০

কৃষ্ণগোপাল বসু
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

দীপক পাল
চেয়ারম্যান

কাটোয়া ব্লক-১ তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং - ৪ কে টি তাং-২৩-২-৭৯
গ্রাম+পোঃ - পানুহাট, ভায়া-কাটোয়া, জেলা-বর্ধমান
দূরভাষ : ৫৫-৩৩৫/৫৫-২৯৯

সমিতির নিজস্ব কারখানায় শিল্পী দ্বারা উৎপাদিত শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, ছাপা শাড়ি, উলের তৈয়ারি যাবতীয় বস্ত্র, পলিয়েস্টার সার্টিং, টাওয়াইল, জামদানি শাড়ি, তসরের কাথা স্টিচ শাড়ি, কটন সার্টিং, গৃহস্থালী ব্যবহারযোগ্য বস্ত্র তৈয়ারি হয় এবং পাইকারি ও খুচরা বিক্রয় করা হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে অর্ডারকৃত বস্ত্র সামগ্রী সঠিকভাবে সরবরাহ করা হয়।

★ দি বর্ধমান সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক আমাদের ব্যাঙ্ক ★

রঞ্জন দেবনাথ
সম্পাদক

তাঁত-বস্ত্র উৎপাদন ও বিপণনের
ঐতিহ্যবাহী সমবায় প্রতিষ্ঠান

কাটোয়া শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

রেজিঃ নং ২২৪৬, তাং : ১৬.১০.১৯৫৪

প্রধান কার্যালয় ও উৎপাদন কেন্দ্র
ঘোষহাট, পোঃ কাটোয়া, জেলা : বর্ধমান

বিক্রয় কেন্দ্র :
★ শিল্প সমবায় - কাটোয়া বড়বাজার চৌরঙ্গী
★ শিল্প সমবায় - কাটোয়া সার্কাস ময়দান
★ শিল্প সমবায় - ৮ নং বি সি রোড,
পূর্বস্থলী মুখার্জি মার্কেট, বর্ধমান

পাইকারি বিক্রয় :
ঘোষহাট, কাটোয়া, বর্ধমান

শারদীয়া পূজায় ও দেওয়ালীতে বিশেষ আকর্ষণ

২০% বিশেষ ছাড়

শারদীয়া শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :-

আরাণ্ডী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাঃ+পোঃ - আরাণ্ডী, জেলা - হুগলি

(আই সি ডি পি সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

এলাকার চাষিদের সুলভ মূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়া স্বল্প সুদে বিভিন্ন খাতে ঋণ দেওয়া হয় ও ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবস্থা আছে।

কার্তিক ভূঁইয়া	শক্তি মণ্ডল	তারাপদ বাগ
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শারদীয়া

অভিনন্দন

সহ

পূর্বশিবপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম - পূর্বশিবপুর, পোঃ মধুরপুর

জেলা - হুগলি

মানিকমোহন মাল	রাধাগোবিন্দ রায়	সুকুমার রায়
সভাপতি	*সম্পাদক*	*ম্যানেজার*

শুভ বিজয়ার

অভিনন্দন

গ্রহণ করুন

পূর্ব হরিপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজি. নং - ৬৪, তাং - ১৭-৫-৬২

গ্রাম - পূর্ব হরিপুর, পোঃ - বাহুনড়ী,

ব্লক-আরামবাগ, জেলা - হুগলি

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ	ওপধর রায়	হারাধন মালিক
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

শুভ বিজয়ার

অভিনন্দন

গ্রহণ করুন

মলয়পুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম-পোঃ - মলয়পুর, ব্লক - আরামবাগ

জেলা - হুগলি

রেজিঃ নং - ৬০ এইচ জি তাং - ০২/০৫/৬১

(সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প হুগলি-এর সহায়তাপ্রাপ্ত সমিতি)

সদস্যদের স্বল্প মেয়াদি কৃষিঋণ দাদন, বন্ধকি দ্রব্য। আমানত বিভাগ, কৃষি সার ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য পাওয়ার টিলার ইত্যাদি স্বল্প সঞ্চয়ে উৎসাহী করার প্রয়োজনে নিয়োজিত।

চণ্ডীচরণ দলুই	আনোয়ার আলী মিস্ত্রি	সুকুমার চ্যাটার্জি
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

With Best Compliments From :

লোহাচুর বড়গাছী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম : বড়গাছী, পোঃ - মোরাইল, বর্ধমান

সমিতি কৃষি কাজের ব্যবহারের জন্য সার, বীজ, অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করে। সেচের ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আছে।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে
জগন্নাথ মণ্ডল
ম্যানেজার

বড়েয়া নতুনপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি

আমাদের নিজস্ব তাঁতে উৎপাদিত কাপড়
১০০×১০০
জামদানি ও শাড়ি যত্ন সহকারে সরবরাহ করা হয়।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে
দুলাল দেবনাথ
সম্পাদক

শারদীয় ভাণ্ডার পত্রিকার গ্রাহকগণকে
জানাই আন্তরিক অভিনন্দন

কেতুগ্রাম থানা তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম+পোঃ - নিরোল, বর্ধমান

সমিতির নিজস্ব উৎপাদিত বস্ত্র
১০০×১০০ শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ও সার্টিং।

জয়তু সমবায়

সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে
[illegible]
ম্যানেজার

With Best compliments From :

আমাদের সমিতিতে কাপড়, গামছা ও
জামদানি শাড়ি উৎপাদন হয়।

[illegible]

ঘোষহাট তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম - ঘোষহাট, পোঃ - কাটোয়া, জেলা - বর্ধমান
সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

হিরালাল দেবনাথ
সম্পাদক

WITH BEST
COMPLIMENTS FROM

বাগনাগরা বাগটোনা
এস কে ইউ এস লিঃ

আমাদের কৃষি ঋণ দাদন করে।
কনজিউমার্সের ব্যবসা করে।

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

জয়তু সমবায়

সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

বরু সাহা
ম্যানেজার

বিনয় সাহা
সম্পাদক

সমিতির নিজস্ব সভ্য ও শ্রমিক দ্বারা উৎপাদিত
তাঁত বস্ত্রের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

প্রভাপ্রভূপাড়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

আমাদের সমিতির নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্র
কাটোয়া সার্কাস ময়দান
দুর্গাপুর, বেনাচিতি

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক

সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

বিনোদবিহারী দেবনাথ
সম্পাদক

তামাঘাটা টাঙ্গাইল তন্তুবায়
সমবায় সমিতি লিঃ

পোঃ মাজিদা, জেলা - বর্ধমান

শারদীয়ায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নকে,
ভাণ্ডার গ্রাহকগণকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমাদের সমিতির উৎপাদিত (নিজস্ব) শিল্পীদের
১০০×১০০ জামদানি শাড়ি উৎপাদন করা হয়।
১৯৮৪ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত।
সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হউক।

জয়তু সমবায়

পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষে

বাসন্তীচন্দ্র কুণ্ডু
সম্পাদক

With
Best
Compliments
from

Paharhati 'O' Uttar Memari Co-operative Agricultural Marketing Society Limited

Business of : Fertiliser & Seeds Cloth, Agricultural Implements, Pesticides & Insecticides, Potato cold Storage Capacity Unit - I 4000 Mt, Unit - II 8000 Mt

নদীয়া কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

সহজ শর্তে এবং অপেক্ষাকৃত কম সরল সুদের বিনিময়ে ঋণ দিচ্ছে।

"ভূমিশ্রী"

দূরভাষ : ৫২২৪৭ ও ৭২১৪৭
কৃষ্ণনগর, নদীয়া

শাখা অফিস : মেইন ব্রাঞ্চ (কৃষ্ণনগর), তেহট্ট, করিমপুর, রাণাঘাট, বেথুয়াডহরি।

দূরভাষ : ৫৪০৪৬, ৫০২৩১, ৫৫১৭৮, ৫৫০০৭, ৫৫৩৫২

উপরোক্ত শাখাগুলিতে বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করা যাইতে পারে।

শারদীয়া শুভেচ্ছা সহ

রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজি নং : ১৮ এইচ ডি ক তারিখ ১৪-৫-৭২
রাধানগর, পো: - গোপীনগর, হুগলি

নিত্যানন্দ হাইত	বামনচন্দ্র ঘোষ	বিকাশচন্দ্র ভট্টাচার্য
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

দীর্ঘ ৪৫ বৎসরেরও বেশি সময় ধরে খানো ও বড় সোনার চাষিভাইদের উন্নতিতে নিয়োজিত

খানো কুণ্ডপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম ও পোঃ - খানো, জেলা - বর্ধমান

এলাকার কৃষক ও চাষী ও কৃষিজীবী মানুষের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

রাসায়নিক সার, কীটনাশক, উন্নতমানের বীজ, নলকূপ ও অগভীর নলকূপের পাইপ ও সরঞ্জাম বিক্রয়ার্থে সর্বদা মজুত থাকে।

* সমিতির হিমঘরে যত্ন সহকারে আলু সংরক্ষণ করা হয়

স্নেহপরম সাহা
সভাপতি

প্রবন্ধ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও রিও-র উইল

তোলানাথ দত্ত

১৯৯২ সালের জুন মাসে রিও-ডি-জেনিরোতে "বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক" অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারপরে ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সেই বৈঠকের মূল আলোচ্য বিষয় ছিল "পরিবেশজনিত সহনশীল বিশ্ব অর্থনীতি" বা "সহনশীল উন্নয়ন"। মূল্যায়নে দেখা যায় যে এই বৈঠকের পরে এই ধরায় ৪৫০ মিলিয়ন নতুন মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বা গ্রীন হাউস সৃষ্টির সহায়ক, তা অতিমাত্রায় বেড়েছে এবং বায়ুমণ্ডলের গঠনকেও বদলে দিয়েছে। উপরন্তু পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ, চিন প্রভৃতি দেশে জলোচ্ছ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ উপাদানগুলি ক্ষিপ্রতার সাথে ও পরিবর্তিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। পুরনো বনাঞ্চলকে কেটে ফেলা হয়েছে, উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। জীব সম্পদে সমৃদ্ধ জলাভূমি ও প্রবাল-প্রাচীরের অবস্থাও তথৈবচ। অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ১-৩ বিলিয়ন মানুষ এখনই দরিদ্র যে তারা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্য বা বাসস্থানের সংস্থান করতে পারছেন না।

আশা ও সম্ভাবনার মাপকাঠিতে বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল আশানুরূপ নয়। কয় যুগের সঞ্চিত অব্যবস্থা মাত্র ছয় বছরের মধ্যে শোধরানো যাবে তা ভাবা উচিত নয়। খুব কম সংখ্যক সরকার সহনশীল উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নে অগ্রণী হয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করেছেন। ছয়-সাতটি দেশ উপকরণ ও শক্তি ব্যবহারে অসহনীয় পথে যাওয়ার বাধা সৃষ্টিতে কর আরোপের ব্যবস্থা চালু করেছেন। যথেচ্ছ বনাঞ্চল ধ্বংস রোধে, অথবা শক্তি ব্যবহারে, জল ও খনিজ সম্ভারহারে অনেক দেশই উদ্যোগী হয়েছেন। রিও বৈঠকের একটা ভাল দিক হল পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় সরকারি ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি নজর দিচ্ছে। সেই বৈঠকে অনেক রাষ্ট্রপ্রধান, অর্থমন্ত্রী, পরিবেশমন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনেকেই আশা করেছিলেন যে যেহেতু সর্বকালীন সময়ে এত বড় শীর্ষ বৈঠক এর আগে কখনও সংগঠিত হয়নি তাই "মার্শাল প্ল্যানে" পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পরিবেশ তহবিলে ন্যূনতম চাঁদা সংশ্লিষ্ট দেশগুলি না দেওয়ায় অর্থকষ্ট থেকে গেছে। এছাড়া ঐক্য বজায় রাখার জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মধ্য ইউরোপের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রাশিয়া ও ইউক্রেন ইত্যাদি দেশের অবস্থানের পরিবর্তন সূচিত হয়।

আর একটি অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, সেটা হল দারিদ্র্যই হল পরিবেশ অবনয়নের অন্যতম কারণ। এই বৈঠকের পরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মানের প্রভূত অবনমন হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সরকার তাদের জন্য কোন নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টি করতে পারেনি। অনেক দেশের পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যা জাতিগত উন্মাদনা সঞ্চারে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু সৃষ্টিতে ও সময় সময় গৃহযুদ্ধের সংঘর্ষে লিপ্ত করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বেশির ভাগ সরকার চিরাচরিত পথে অসহনীয় উন্নয়নে অগ্রহী কেননা দীর্ঘমেয়াদি সহনশীল পথে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়।

সহনীয় উন্নয়ন প্রাপ্তিতে বসুন্ধরা বৈঠকের আজেণ্ডা-২১ তে ৪০টি চ্যাপ্টার প্ল্যানের উল্লেখ আছে। ঔপনিবেশিক যুগ থাকিয়েকে প্রকৃতিক সম্পদ রক্ষণ ও সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জলাভূমি ও মরুভূমি রক্ষার্থে, বায়ু ও জল দূষণ রোধে, শক্তি ও কৃষি প্রযুক্তির উন্নতিকল্পে, রাসায়নিক বিষ ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় এবং রোগ ও অপুষ্টি কমানোর ব্যবস্থাদি আজেণ্ডা-২১তে অন্তর্ভুক্ত আছে। উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের ক্ষমতা সীমিত। বৈঠকের সিদ্ধান্তানুসারে ইউনাইটেড নেশনস্ কমিশন অন সাসটেনেবল্ ডেভেলপমেন্ট নামে সংস্থা গঠিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের মধ্যে ১১৭টি সরকার এই উদ্দেশ্যে জাতীয় কমিশন গঠন করেছে যাতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি সুসামঞ্জস্য করা যায়। বহু স্বেচ্ছাসেবী বেসরকারি সংস্থা এই কাজে সরকারি সংগঠনের সাথে সাথে নিজেদের নিয়োজিত করেছেন। জীব প্রযুক্তির নিরাপত্তার নির্দেশাবলী রচনায়, জাতীয় জলসীমানার মধ্যে মাছের রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি কার্যকরী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উপরন্তু একটি নতুন মরুভূমি সংক্রান্ত কনভেনশনের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তাতে স্বাক্ষর করেছেন। উন্নয়নশীল দেশে বিপদসঙ্কুল বর্জ্য পদার্থ রপ্তানিতে বাধা আরোপিত হয়েছে এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষার্থে ভূমিজনিত দূষণের অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে তারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই বিশ্ব অর্থনৈতিক নীতি রূপায়ণে পরিবেশ পরিচালনা কৌশলসমূহের সমন্বয় সাধনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণে এখনও অপারগ।

রিও-র অ্যাজেণ্ডার অধিকতর আর্থিক সুবিধার নিমিত্তে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফেসিলিটির (GEF) জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক, ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম এবং ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট ফান্ড-এর তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ তহবিল পরিচালিত হতে থাকে। এই তহবিল থেকে জলবায়ু ও জীব-বৈচিত্র্য কনভেনশনের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া দেশে দেশে জাতীয় উদ্যান স্থাপনে, বিরল প্রজাতি রক্ষণে, সৌরশক্তি ব্যবহারে, শক্তির দক্ষতাবৃদ্ধি ব্যবহারে, জীবাশ্ম জ্বালানির বিকল্প নির্ণয়ের জন্য এই তহবিল থেকে অর্থের সংস্থান করেছে। ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে মানুষের পরিবেশের উপর নজর দেওয়া হয়েছিল, ফলে বেশির ভাগ শিল্প উন্নত দেশের বায়ু ও জলের যে দূষণ সেইসময় দেখা গিয়েছিল তা বর্তমানে খুবই কম। ১৯৯২ সালে দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে (১) জলবায়ু পরিবর্তনে কনভেনশন ও (২) জীব বৈচিত্র্য কনভেনশন। ১৯৯৪ সালে প্রথমোক্তের অনুসমর্থন হয়।

বর্তমান বিশ্বে আটটি পরিবেশগত হেভিওয়েট দেশ আছে, তাদের 'ই-৮' নামে ডাকা হয়। চারটি শিল্প-উন্নত ও চারটি উন্নয়নশীল দেশ। তারা চিন, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান, ইউনাইটেড স্টেটস্, ভারত, ব্রাজিল ও ইন্দোনেশিয়া। এরা পৃথিবীর জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ, অর্থনৈতিক উৎপাদনের শতকরা ৫১ ভাগ, কার্বন ত্যাগের শতকরা ৫৮ ভাগ এবং বনাঞ্চলের শতকরা ৫০ ভাগ ধারণ করে। জনসংখ্যায় চিন, আমেরিকা ও কার্বন ত্যাগে ইউনাইটেড স্টেটস্, জীব-বৈচিত্র্যে ব্রাজিল প্রথম স্থান দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিশ্বঅর্থনীতি জি-৭ দেশের কব্জায় এসে পড়ে কিন্তু পরিবেশগত দিকে ই-৮ দেশগুলি ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে। পরিসংখ্যানগত ই-৮ দেশগুলির চিত্র হল :

দেশের নাম	১৯৯৬ সালের জনসংখ্যার অংশ	১৯৯৪ সালে গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট-এ অংশ	বিশ্বে কার্বন ত্যাগের অংশ ১৯৯৪ %	বিশ্ব বনাঞ্চলে অংশ ১৯৯০	বিশ্ব অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রত্যাশিত অংশ ২০২০
ইউনাইটেড স্টেটস্	৫	২৬	২০	৬	৮
রাশিয়া	৩	২	৭	২১	৯
জাপান	২	১৭	৫	০.৭	২
জার্মানি	১	৮	৪	০.৩	১
চিন	২১	২	১৩	৪	১২
ভারত	১৭	১	৪	২	৬
ইন্দোনেশিয়া	৪	০.৭	১	৩	৮
ব্রাজিল	৩	২	১	১৬	২২
ই-৮	৫৬	৫৯	৫৮	৫৩	—

ই-৮-এর অনেক দেশই জি-৮-এর সদস্য। জি-৮-এর সদস্যরা অনেকবারই নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন, কিন্তু পরিবেশের ব্যাপারে ই-৮ দেশগুলি নিয়মিত বৈঠক করলে ভাল হত।

জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে কার্বনের নির্গমন, ই-৮ (১৯৯৫)

দেশ	মোট নির্গমন (বিলিয়ন টন)	কার্বন নির্গমনে বিশ্বের দেশের অংশ (শতকরা)	নির্গমনের পর কাপিটা (টন)	নির্গমনের বৃদ্ধি শতকরা
ইউনাইটেড স্টেটস	১৩৯৪	২২.৯	৫.৩	৬.২
রাশিয়া	৪৩৭	৭.২	২.৯	-২৭.৭
জাপান	৩০২	৫.০	২.৪	৮.৭
জার্মানি	২৩৪	৩.৮	২.৯	-১০.২
চিন	৮৩৭	১৩.৩	০.৭	২৭.৫
ভারত	২২৯	৩.৮	০.৩	২৭.৭
ইন্দোনেশিয়া	৫৬	০.৯	০.৩	৩৮.৮
ব্রাজিল	৯২	১.০	০.৪	১৯.৮
ই-৮	৩৪২১	৫৭.১	০.৯	—

কয়লার খনির জন্য প্রাথমিকভাবে জাতীয় অরণ্যে বার্ষিক ১.৬ বিলিয়ন টন অতিরিক্ত কার্বন নির্গত হচ্ছে। সি এফ সি গ্যাস নির্গমন গ্রীন হাউস গ্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী উপাদান, তবে বর্তমানে গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমের দিকে আছে যেহেতু ওজন স্তর রক্ষার্থে কিছু কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এটা দেখা গেছে যে গ্রীন হাউস গ্যাসে হাইড্রোফ্লুরো-কার্বন ও মিথেনের পরিমাণ বেড়েছে।

সংরক্ষিত এলাকা এবং বিরল প্রজাতি, ই-৮ দেশসমূহ বনাঞ্চলের দশকে

দেশ	সংরক্ষিত এলাকার জমি ১৯৯৬ (মিলিয়ন হেক্টর)	সংরক্ষিত এলাকার জমির অংশ (শতকরা)	বিরল প্রজাতি উদ্ভিদ (সংখ্যায়)	বিরল প্রজাতি প্রাণী (সংখ্যায়)
ইউনাইটেড স্টেটস্	১৩০	১৩	১৮৪৫	২৮১
রাশিয়া	৭১	৪	১২৭	৫১
জাপান	৩	৭	৭০৪	৭১
জার্মানি	১	২৬	১৬	১১
চিন	৫৮	৬	৩৪০	১৫০
ভারত	১৪	৪	১২৫৬	১০৭
ইন্দোনেশিয়া	১১	১০	২৮১	২৪২
ব্রাজিল	৩২	৪	৪৮৩	১৬৭
ই-৮ মোট	৩৩৬	৭	—	—

ব্রাজিলে আমাজন বেসিনে পৃথিবীর বৃহত্তম একক জীববৈচিত্র্য দেখা যায়। ব্রাজিল জীববৈচিত্র্য রক্ষার কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ৩৪ শতাংশের অধিক বনাঞ্চল কাটা হয়েছে। ব্রাজিলের পরে জীববৈচিত্র্যে স্থান ইন্দোনেশিয়ার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে প্রথম জাতীয় উদ্যান স্থাপন করে।

জনসংখ্যার গতিরোধ কিছু সাফল্য পাওয়া গেছে। ষাটের দশকে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১ শতাংশ যেটা ১৯৯৬ সালে নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশে। ফার্টিলিটি রেট ভারতের ৪১ শতাংশে, ইন্দোনেশিয়ার ৪৬ শতাংশে, ব্রাজিলের ৫৫ শতাংশে ও চিনের ৪১ শতাংশে ষাটের দশক থেকে কমে দাঁড়িয়েছে। বিবাহিত মহিলারা জন্ম নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ব্রাজিলে ৭৬ শতাংশে, চিনে ৮৩ শতাংশে, জার্মানিতে ৭৫ শতাংশে ও রাশিয়ায় ২২ শতাংশে। ইন্দোনেশিয়া জনসংখ্যা রোধে গ্রামভিত্তিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ভারতও অনুরূপ কর্মসূচি নিয়েছে। চিনে মহিলারা দুটির বেশি সন্তান প্রসব করতে পারবেন না বলে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও জার্মানির জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সীমারেখার মধ্যে বিরাজ করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সুষম জনসংখ্যার প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যা ও সংশ্লিষ্ট সামাজিক দিক, ই-৮ দেশসমূহ

দেশ	জনসংখ্যা ১৯৯৬ (মিলিয়ন)	বার্ষিক বৃদ্ধির হার ১৯৯০-৯৫ (শতকরা)	মোট ফার্টিলিটি রেট ১৯৯০-৯৫ (মহিলা প্রতি শিশুর সংখ্যা)	জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার রেট ১৯৮৮-৯২ (শতকরা)	মেটারন্যাল মর্টালিটি রেসিও ১৯৮৭-৯১ (১লক্ষ জন্মের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	২৬৫	১.০	২.১	৭৪	২২
রাশিয়া	১৪৮	-০.১	১.৫	২২	৭৫
জাপান	১২৬	০.৩	১.৫	৬৪	১৮
জার্মানি	৮২	০.৬	১.৩	৭৫	২২
চিন	১২১৮	১.১	২.০	৮৩	৯৫
ভারত	৯৫০	১.৯	৩.৮	৪৩	৫৭০
ইন্দোনেশিয়া	২০১	১.৬	২.৯	৫০	৬৫০
ব্রাজিল	১৬১	১.৭	২.৯	৬৬	২২০
ই-৮ মোট	৩,১৫১	১.৩	—	—	—

দিও দীর্ঘকে বসুন্ধরা মহাবৈঠকের পর পরিবেশ সম্পর্কে জনচেতনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবাদপত্র ও গণমাধ্যম এ-বিষয়ে তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছে। ৫১টি দেশের ১৫০০ শহরে অ্যাজেন্ডা ২১ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৯৯২ সালে বসুন্ধরা থেকে সরকারি প্রতিনিধি ছাড়াও ২০,০০০ ব্যক্তিবিশেষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশে এক হাজার বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ভারতে দশ হাজার সংগঠন পরিবেশ উন্নয়নে কাজ করতে চলেছেন।

গত শতাব্দীতে উন্নত ও উচ্চ প্রযুক্তসম্পন্ন সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছে। ফলে পরিবেশগত নানান সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে যা পূর্বপুরুষের এককেরও অজানা ছিল। এই সমস্ত সমস্যার স্বরূপ জানার চেষ্টা চলেছে বর্তমান শতাব্দীতে। আশা করা যায় পরবর্তী সময়ে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হবে। ❐

শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন :

ধনিয়াখালি থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ

(রেজিঃ নং - ৭৯ তাং : ১৯-১২-৬২)

পোঃ - ধনিয়াখালি জেলা : হুগলি

সমস্ত রকম রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধাদি, কৃষি সরঞ্জাম, বস্ত্র, ভোগ্যপণ্য, পেট্রোল, ডিজেল, মোবিল ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডিলার :

পারাদ্বীপ ফসফেটস্ লিমিটেড

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন

শেখ আবুল জলিল	বিশ্বনাথ সাহু	সত্যসাধী চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি	সহ-সভাপতি	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

আমাদপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

রেজিঃ নং ২৩৪৭ তাং ঃ ২৮.২.৫৭

এখানে সমস্ত রকম ব্যাঙ্কিং-এর সুবিধা আছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে .৫% সুদ বেশি দেওয়া হয়। এছাড়া, চাষের ঋণ ছাড়াও বহু রকমের ঋণ দেওয়া হয় এবং রাসায়নিক সার, ঔষধ, বীজ বিক্রয় হয়।

মহাদেবপ্রসাদ চন্দ্র

চেয়ারম্যান

বেগুনী-নীল-আসমানী

হতাশা নয়, শোন জীবনের বাণী,

সবুজ হলুদ কমলা লাল

সমবায়ের আঙ্গীনায় কঠোর মনোবল

হবে বাধার প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা

বে নী আ স হ ক লা

স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স কো-অপারেটিভ অর্গানাইজেশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল

(সেকো)

৮, কালনা রোড, বাদামতলা, বর্ধমান - ৭১৩ ১০১

দূরভাষ : ৬২৩৩৩

আঞ্চলিক কার্যালয়

বাঁকুড়া ★ বহরমপুর ★ কৃষ্ণনগর ★ শিলিগুড়ি

ঝাড়গ্রাম কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিঃ

ঝাড়গ্রাম মহকুমার একমাত্র সমবায় ব্যাঙ্ক যা শুধু ঝাড়গ্রামের জনগণের সেবায় নিবেদিত।

এই ব্যাঙ্ক কৃষি ও অকৃষির ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দাদন করে।

কৃষি	ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, পাম্পসেট, স্যালো, বলদ ও বলদগাড়ি, পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, মৎস্যচাষ, পোল্ট্রি, ডেয়ারি, ফিসারি, বনসৃজন।
অকৃষি	১৬.২ টন পর্যন্ত ট্রাক, মিনি ট্রাক, বাস, মিনি বাস, ট্রেকার, জিপ, কার, ত্রিচক্র যান (ডিজেল ও পেট্রোল চালিত) শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য।
গৃহ নির্মাণ	HUDCO এবং NHB-র নিয়ম অনুযায়ী গ্রামীণ গৃহনির্মাণ প্রকল্প।
ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প	DIC অনুমোদিত সর্বপ্রকার ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ঋণ।

বিশদ জানার জন্য ব্যাঙ্কের ঝাড়গ্রামস্থ অফিসে যোগাযোগ করুন।

অবনী মাহান্ত	**মানিকচন্দ্র দাস**	**নিশীথচন্দ্র মাণ্ডি**
সভাপতি	সহ-সভাপতি	চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

দি প্রণবানন্দ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বর্ধমান

রেজিঃ হেড অফিস - "শীলা সদন"

৬৩, আর বি ঘোষ রোড

বর্ধমান - ৭১৩ ১০১

(বর্ধমান জেলার কুড়িটি শাখা ও ১টি কালেকশন্ সেন্টারের মাধ্যমে বর্ধমান জেলাবাসীকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ দেওয়া হয়।)

সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় করুন

শহরের টাকা শহরে রাখুন

প্রবন্ধ

পান বৃত্তান্ত

ড. মুকুলচন্দ্র সেন

বিখ্যাত গ্রিক দূত মেগাস্থিনিস, বিন্দুসার মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় এসেছেন। বিদেশি দূত বলে কথা। অতএব তাঁর আপ্যায়নের যাতে কোনওরকম ত্রুটি না হয় সেইজন্য সম্রাট তাঁর যথাযথ দেখাশোনার জন্যে কয়েকজন সুন্দরী তরুণীকে আপ্যায়নকার্যবিভাগে তাঁর কাছে পাঠান। সুসজ্জিতা বালিকাদের টুকটুকে লাল ঠোঁট দেখে মেগাস্থিনিস বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যান এবং পরে কথা প্রসঙ্গে সম্রাটের কাছে এর রহস্য জানতে চাইলে তিনি জানান যে পানের সঙ্গে চুন, খয়ের, সুপুরি ইত্যাদি দিয়ে খাওয়ার ফলেই ওদের ঠোঁট ওরকম রক্তিম হয়ে ওঠে। ব্যস, সেই থেকে মেগাস্থিনিসও পানের প্রতি এমন অনুরক্ত হয়ে পড়লেন যে দেশে ফিরে পানের ওপর প্রভাব করতে লাগলেন। এভাবে আড়াই হাজার বছর আগে থেকেই বিদেশেও পানের প্রচলন শুরু হয়ে যায়। আমাদের দুঃখ, বহু সাহেবদের পদধূলিধন্য হওয়া গেলেও অথর্ববেদে কিন্তু এর উল্লেখ আছে।

শুদ্ধ বাংলায় পানকে তাম্বুল বলা হয়। এর ইংরেজি নাম বিটেল লিফ (betel leaf)। আর পানের বৈজ্ঞানিক নাম হল সপ্তশিরা। প্রত্যেক পানেই সাতটি করে প্রধান শিরা বিদ্যমান। এজন্যেই সংস্কৃতে পানকে ওই নাম দেওয়া হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন ধরনের পান পাওয়া যায়। রকমভেদে এদের স্বাদ, গন্ধ ও সাইজের তারতম্য ঘটে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত তিন রকম পানের চাষ হয়। যথা বাংলা, সাঁচি ও মিঠে। বাংলা পান আবার অনেক রকমের হতে পারে। যেমন কড়ে বাংলা, ছবলী বাংলা, ডালি বাংলা প্রভৃতি। এই পানে ঝাল বেশি। এবং এর একটা ঝাঁঝ থাকে। সাঁচি পানে একটা সুন্দর গন্ধ থাকে এবং এই পানের ঝাঁঝ বাংলা পান অপেক্ষা কম। সাঁচি পান সাইজেও বাংলা পানের থেকে ছোট হয়। সাঁচি পান খেতে বেশ মোলায়েম লাগে। এই পানের প্রায় সবটাই আজকাল বিদেশে চালান যায়। এবার আসা যাক মিঠে পাতার পানের কথায়। বাংলা পানের ন্যায় মিঠে পানও নানা রকমের হয়ে থাকে। যেমন মিঠে বাংলা, ধোকাপালা মিঠে, গাঁঠপালা মিঠে ইত্যাদি। নাম শুনেই বোঝা যায় যে এই পান স্বাদে মিষ্টি এবং এতে ঝাল কম থাকে। এই পানকে সেইজন্যে অনেক সময় মিষ্টি পাতার পানও বলা হয়ে থাকে। এর সুন্দর স্বাদের জন্যে এই পানের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। তবে পানের যতই রকমফের থাকুক না কেন, উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের মতে কিন্তু সব পানই *Piperaceae* পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। পানের বৈজ্ঞানিক নাম *Piper betel Linn.*।

পান গাছ লতানে মুখি গাছ। এই গাছ বেশ একেবারে সহ্য করতে পারে না। এই গাছের জন্যে জলও প্রচুর লাগে। এটা এক ধরনের লতান গাছ। রোদ্দুর সহ্য হয় না বলে, পান চাষ ছায়া জায়গাতেই করা হয়। পান চাষের জায়গাকে পানের বরজ বলা হয়ে থাকে। এই বরজ দেখলেই বোঝা যায় পান গাছকে কত যত্নে লালন-পালন করা হয়। পানের আর একটা বড় দোষ হল যে এরা খুব দ্রুত পচনশীল। একটা পচা পান-পাতা অনেকগুলো ভাল পান পাতাকে সত্বর নষ্ট করে দিতে পারে। সেইজন্যে দূরে পান পাঠানোর সময় সাবধানে, কায়দা করে পান প্যাকিং করা হয়ে থাকে।

পান নিয়ে আমাদের গ্রামবাংলায় আজও নানা সরস লোককথার প্রচলন আছে। এদের মধ্যে কয়েকটা এখানে তুলে ধরা হল। যেমন (১) পান থেকে চুন খসলেই বিপদ, (২) ছাগলের মুখে পড়ল পান, পান বলে মোর গেল জান, (৩) পানের দিকে যেতেছে নয়ান, বানর মুখে কি শোভে পান? (৪) ভালবাসায় এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমনি চুন, বেশি হলে পোড়ে গাল, কম হলে লাগে কাল।

বাঙালিদের মধ্যে 'বারুজীবী' এবং অবাঙালিদের মধ্যে 'চৌরাশিয়া' নামে দুই সম্প্রদায় বিরাজমান, যাদের পূর্বপুরুষের জীবিকা ছিল মূলত পান চাষ।

আগেকার অনেক নবাব, বাদশারা পর্যন্ত পানবিলাসী ছিলেন। পান খাওয়া যেমন কারও কাছে বিলাস, কারও কাছে অভ্যাস, তেমনি কারও কারও কাছে এটা নেশার সামগ্রীও বটে। যারা রোজ ২-৩টে করে পান খায় তাদের পান খাওয়া অভ্যাসের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু যারা সারাদিন ধরে জর্দার কাটার ন্যায় পান চিবিয়ে যাচ্ছে এবং রোজ যাদের ১৫-২০টা পান না হলে চলে না, তাদের কাছে পান নেশার সামগ্রী ছাড়া আর কী? আর পান খাওয়া ভাল না খারাপ? এ নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই। যাই হোক, আপনাদের জ্ঞাতার্থে সংক্ষেপে এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

পুষ্টিগুণ

অধিকাংশ মানুষ পানকে নিছক এক মুখশুদ্ধি বা নেশার সামগ্রী বলে মনে করেন। তাদের ধারণা পুষ্টিগুণের বিচারে পানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু একটা নেই। কিন্তু এই ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কারণ নথিপত্র ঘাটতে ঘাটতে দেখা গেল যে পান ক্যারোটিনের (অর্থাৎ ভিটামিন-এর প্রাক অবস্থার) বিশাল এক ভাণ্ডার। হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রতি ১০০ গ্রাম পানে প্রায় ৫৭৬০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন বর্তমান। আর পান নিজেও ক্যালসিয়ামের ভাল উৎস। প্রতি ১০০ গ্রাম পানে ২৩০ মিলিগ্রাম মতো ক্যালসিয়াম মজুত থাকে। এছাড়া প্রোটিন, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস, ফসফরাস এবং আয়রনের পরিমাণও পানে কম নয়। প্রতি ১০০ গ্রাম পানে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩.১ গ্রাম, ২.৩ গ্রাম, ৬.১ গ্রাম, ৪০ মিলিগ্রাম, এবং ৭.০ মিলিগ্রাম। এদের সঙ্গে সামান্য মাত্রায় ফ্যাট, ফাইবার, ভিটামিন-এ, বি, সি এবং নিয়াসিনও পানে উপস্থিত থাকে। আর ১০০ গ্রাম পান হতে আনুমানিক ৪৪ কিলো ক্যালোরি এনার্জি বা শক্তিও মেলে। পানে জলীয় অংশের পরিমাণ থাকে শতকরা ৮৫.৪ ভাগ।

ঔষধিক গুণ

আয়ুর্বেদিক মতে পান নানা ঔষধিক গুণের অধিকারী, যেমন :

কান কামড়ানোতে : যদি কারও কান কামড়ায়, সে যাচ্ছা হোক অথবা মুড়ো খেই হোক না কেন, তাহলে পান ছেঁচে তার রস নিয়ে গরম করে সহনীয় অবস্থায় ওই রস দু-তিন ফোঁটা করে কানে দু-তিনবার দিলে উপকার পাওয়া যায়।

উকুনের সমস্যায় : আপনার মাথায় যদি উকুন থাকে, তাহলে পান পাতার রস মাথার কয়েকদিন লাগালেই দেখবেন উকুন আপনার মাথা ছেড়ে পালিয়েছে।

ঘাম ও দুর্গন্ধনাশিতে : কারও ঘাম যা দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে থাকলে, যেখানে হয়েছে তার উপরে পানের রস ঘষে দিলে, কয়েকদিনের মধ্যেই আরাম পাওয়া যাবে।

ছাত-পায়ের ছালায় : একদিকে পানের রস গরম করে গরিতে তবে যাচ্ছা অংশে লাগিয়ে রাখুন। দিন কয়েকের মধ্যেই উপকার টের

পারেন। তবে কায়দাটা পরিষ্কার না করলে, ওটা আসর হবে।

ঠোঁটরাঙে ঃ পুরনো পান পাতা খেলে, ঠোঁট ফিকটে করে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, নতুন পান হলে সেটা আসর ঠোঁট বৃদ্ধি করে।

মধ বৃদ্ধিতে ঃ যারা এতে কষ পাচ্ছেন, তারা পানের রস পান করে দিনে তিন থেকে চার বার নখের কোণে দিলে ফলদায় উপশম হবে। তবে মধের অতিরিক্ত বৃদ্ধিটুকু কিন্তু কেটে ফেলতেই হবে।

মাড়ির ঘরে ঃ আজকাল প্রায় লোকেরই দাঁতের রোগে ভুগতে দেখা যায়। কোন মানুষের মাড়িতে যা হয়ে পুঁজ জমতে শুরু করেছে, তারা যদি পানের রসের সঙ্গে কিঞ্চিৎ জল মিশিয়ে কয়েকদিন আসরেক্ষ করে কুলকুচি করেন, তাহলে ঘায়ে পুঁজ জমা বন্ধ হবে এবং ঘাও ক্রমশ শুকিয়ে যাবে।

বর্তনিরোধ ঃ পানের শিকড় বেটে খেলে যে পর্তনিরোধকরণে কাজ করে, একথা প্রাচীন কবিরাজদের জানা ছিল। বর্তমানের প্রাবান্য গ্রন্থেও একথা স্বীকার করা হয়েছে।

পোড়া ঘকে ঃ কোনও কারণে ঘক পুড়ে গেলে পানের রস পোড়া ঘকের উপর লাগালে ঘাসর করবে।

কোঁড়াতে ঃ কোঁড়া হলে পান পাতার সেকাদিটে পুরনো ঘি মাখিয়ে কোঁড়ার উপর লাগিয়ে দিলে কোঁড়া সেকে ওঠে ও ফেটে যায়। এখানে আর একটা কথা, পানপাতার মধ্যে যে উদ্বায়ী তেল আছে, সেটা কোঁড়াকে বিষিয়ে না যেতে সাহায্য করে।

হজমে। খাওয়া-দাওয়ার পর প্রত্যহ দুবেলা একটা করে পান খাওয়া আমাদের পক্ষে ভাল। কারণ এটা হজমে সাহায্য করে। আসলে পান চিবানোর সময় আমাদের মুখের মধ্যে যে লালা বা রস নিঃসরণ হয় সেটা হজম শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। তাছাড়া পান চিবানোর ফলে পাকস্থলির পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের গতি বৃদ্ধি পায়, যার ফলে খাদ্য তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়।

পানের অপকারিতা

রোজ দুটো করে পান খাওয়া যেমন আমাদের পক্ষে ভাল, তেমনি বেশি পান খাওয়া আমাদের পক্ষে খারাপ। অধিক পান খেলে শরীরে একাধিক অসুবিধা দেখা দিতে পারে। যেমন ঃ

★ মুখের আলসার এবং অর্বুদ সৃষ্টি করে।
★ দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে।
★ ক্যানসারের সম্ভাবনা থাকে।
★ হজমের ব্যাঘাত ঘটায়।
★ পানের রস শরীরের ঘকে ক্ষার করে।
★ দাঁতে পান-কালার ছোপ ধরে ও সৌন্দর্যের হানি ঘটে।
★ নতুন পান রোগ বৃদ্ধি করে।
★ শরীরে শক্তি হ্রাস পায়।

পানের রস তিন প্রকার দোষ হর, সুপুরি ও খয়ের। এই তিনের কোনও একটা অনুপস্থিত থাকলেই পান খাওয়ার আরাম ও আমেজই যেন মাটি হয়ে যায়। এদের সঙ্গে প্রায়ই আমরা নানা রকমের সুগন্ধি জর্দা মিশিয়ে পানকে আরও মনোরোচক করে তোলার চেষ্টা করি। তাদের তৃপ্তি মেটাতে যত নিম্নীয় মানুষ এর ভাঁজে পা দেন। প্রথম প্রথম দু-একটা সাদা পান মুখে নিয়ে আমার আরা শুরু হয়, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে ওই সাদাকে ছেড়ে দিয়ে পান খাওয়া যখন নেশার পর্যায়ে চলে যায় তখন পানের সঙ্গে তার সাকরেদদের উপস্থিতিও হয়ে ওঠে একান্ত জরুরি। এবং ক্রমশ তারা অধিকারের শরীরে প্রবেশ করে, নিঃশব্দে আমাদের অজান্তেই শরীরের নানা অনিষ্ট করে থাকে। যেমন ঃ

★ অনবরত চুন এবং জর্দা মেশানো পান পাতা চিবানোর ফলে মুখের মধ্যে এক ধরনের ঘা-র সৃষ্টি হয় যেটা সহজে সারতে চায় না। পরবর্তীকালে এই ঘা-ই ক্যানসারে আক্রান্তকরণ করে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে কেবল পান খাওয়ার অভ্যেস আছে প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষ গলার ক্যানসারে ভোগেন।

★ সুপুরির মধ্যে 'অ্যারেকোলিন' নামে এক রাসায়নিক উপাদান থাকে যেটা কোষের ক্ষতি করে। এছাড়া সুপুরিতে উপস্থিত 'ট্যানিক অ্যাসিড' কোষের মধ্যে অবস্থিত জিনকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যে শারীরিক বিকৃতি ও নানা জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। উপরন্তু অধিকাংশ সুপুরিই 'অ্যাফলাটক্সিন' নামে এক ধরনের বিষাক্ত ছত্রাক আক্রান্ত হয়। এই সুপুরি শরীরে বেশি দিনের জন্য গিয়ে ক্যানসার হতে পারে। বাজারে বিক্রিত বেশির ভাগ মিঠি সুপুরিও এই দলেই পড়ে। আরও মিঠি সুপুরিতে যে লাল বা গোলাপি রঙ ব্যবহার করা হয় তার কোনও গুণ তো নেই-ই, এমনকী অনেক ক্ষেত্রে তারা অতি নিকৃষ্ট।

★ পানের সঙ্গে সুপুরি বেশি খেলে চুলকানি হতে পারে।

★ খয়েরের মূল উপাদান হল ট্যানিন। অধিক ট্যানিন শরীরে গেলে ক্যানসার হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং প্রকাশও করেছে, পারে।

★ অতিরিক্ত খয়ের খেলে ঘুমপুস ও অম্বের রোগ দেখা দেয়।

পান আমরা সব সময় সাদা খাওয়াও ঠিক নয়। আয়ুর্বেদিক মতে পান কখনও আমাদের খাওয়া উচিত নয়, সেদিকে এবার একটু আলোকপাত করা।

□ বেশি নেশা করার পর □ রোগা ও দুর্বল মানুষের □ মূর্ছা বা বেশম বমি □ রক্তপিত্তে আক্রান্ত রুগী পাচ্ছেন □ বদ্ধ কোষ্ঠ □ আমের চোখ উঠেছে।

বাণিজ্যিক মূল্য

পানের বাণিজ্যিক মূল্যও নেহাত কম নয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পান সবচেয়ে উন্নত। বছরে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার পান এরাজ্যে উৎপন্ন হয়। এখান থেকে পান নেপাল, ভুটান, চিন, আরব, আইসল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হয়। এর ফলে বেশ কিছু বিদেশি মুদ্রাও আয় হয়। প্রায় ২০ লক্ষ পরিবার এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত।

পানের তেল ঃ পান থেকে তেলও নিষ্কাশন করা হয়। হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রায় ৫০ হাজার পান পাতা থেকে ১ কেজি মতো তেল পাওয়া যায়। এক কেজি এই তেলের মূল্য ২০ হাজার টাকার উপর। এই তেল নানা ধরনের কসমেটিক্স ও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ তৈরি করতে লাগে। এছাড়া বিভিন্ন সুগন্ধি বানাতেও কাজে লাগে।

পানের মধ্যে আবার হাইড্রক্সিক্যাভিকল (hydroxychavicol) নামে এক রাসায়নিক যৌগের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেটা তেল, ঘি বা স্নেহজাতীয় পদার্থকে কটু গন্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। কারণ ওই হাইড্রক্সিক্যাভিকলের মধ্যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ধর্ম নিহিত রয়েছে।

পান চাষ করে প্রতি বছরে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রায় ৩৪ কোটি টাকারও বেশি আয় করে। অতএব পান যে এক ভাল অর্থকরী ফসল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও আফসোসের বিষয় এই যে পান অর্থকরী ফসল বলে গণ্য হলেও কৃষিজ পণ্য হিসাবে এখনও অবহেলিত রয়ে গেছে। □

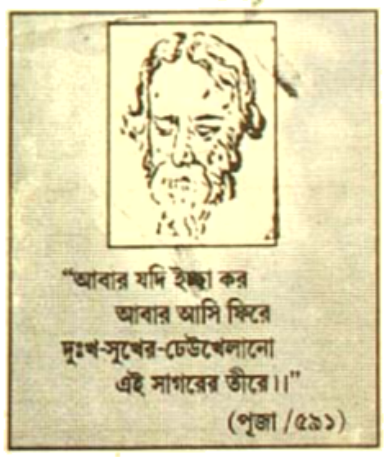

চাগ্রাম নোয়াড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

গ্রাম ও পোঃ — গ্রাকচাগ্রাম
জেলা - বর্ধমান

সমিতিতে এলাকার চাষিভাইদের সুবিধার্থে নল-কন্ট্রোল, কন্ট্রোল কনজিউমার্স দ্রব্যাদি সুলভে বিক্রয় করা হয়।

ইহা ছাড়া চাষের সুবিধার্থে সার, কীটনাশক ঔষধ, ভাল বীজ সরবরাহ করা হয়। ইহা ছাড়া ট্রাক্টর ভাড়া পাওয়া যায় এবং চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয়, মিনি ডিবাটিউবওয়েল-এর মাধ্যমে। সমস্তরকম ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা আছে। বিভিন্ন প্রকার কৃষিঋণ চাষিদের দেওয়া হয়।

With Best Compliments from

Visit **DIGHA** and stay in our
HOLIDAY HOME

* Attractive Location (Old Digha)
* Newly constructed Building (1st Floor)
* Sophisticated amenities

for Details
Please contact

COAL MINES AUTHORITY EMPLOYEES' CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD.

"COAL HOUSE"

13, R. N. Mukherjee Road
Calcutta - 700 001
Phone : 248 - 6268

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

৪ নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সরণি, কলিকাতা - ৭০০ ০০১
দূরভাষ - ২২০-০৮৪১

অশোককুমার ঘোষ
চেয়ারম্যান

অপূর্ব মজুমদার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আপনার ছুটি ও বেড়ানোর দিনগুলি আনন্দময় হয়ে উঠুক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের হলিডে হোমগুলিতে : পুরী, দিঘা, দিল্লি, হরিদ্বার, মুসৌরী, রাজগীর, খাটশিলা, দেওঘর, গ্যাংটক, দার্জিলিং, পেলিং এবং কলকাতা।

চেন্নাই-এ আমাদের হলিডে হোম খোলার পথে।

বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

সিউড়ি, বীরভূম

"আজ ভারতবর্ষের জীবিকা যদি সমবায় নীতির
উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তবে ভারত সভ্যতার ধাত্রীভূমি
গ্রামগুলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত দেশকে বাঁচাবে।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপনার কষ্টার্জিত অর্থ বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ-এ রাখিবেন কেন?

যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অপেক্ষা যে কোন আমানতে অধিক সুদ দেওয়া হয়।

২। জেলার টাকা জেলার উন্নয়নের স্বার্থে বিনিয়োগ করা হয়।

৩। সংশ্লিষ্ট DICGC দ্বারা আপনার অর্থ সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত।

৪। জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে আপনার অবদান, আপনার ও জেলাবাসীর স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়।

৫। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষেত্র এই জেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

শশাঙ্কশেখর মণ্ডল
সভাপতি

রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস
চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার
ও
ডি অর সি এস

খাজুরডিহি সমবায় হিমঘর লিমিটেড

রেজিঃ নং - ৩৯/৬৫ গ্রাম + পোঃ — খাজুরডিহি
জেলা - বর্ধমান
ফোন - ৫৫-১২৬ কাটোয়া

স্থানীয় চাষিভাইদের উৎপাদিত আলু সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ; প্রয়োজনে বিপণনও করা হয়।

এছাড়া উন্নতমানের আলু বীজ ও সার যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় চাষী ভাইদের সহানুভূতি ও সহযোগিতা আমাদের পাথেয়

চন্দ্রনাথ মুখার্জি
সভাপতি

কালনা ২ নং-সি এ ডি পি ফার্মার্স সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড নং — ১৩ ● কাটোয়া — ১৯৭৬ ● পোঃ — কৈথাপুর ● জেলা : বর্ধমান —৭১৩ ১২২
ফোন: এস টি ডি — ০৩৪৫৪
অফিস : কৈথাপুর ৫২ ২৩১, হিমঘর : কৈথাপুর ৫২ ২৭১

আমাদের মূল পরিষেবা

* উন্নতজাতের শংসিত আলু বীজ, ধান বীজ উৎপাদন ও বিপণন।
* মরশুমে কৃষি উপকরণ দাদন ও বিক্রি।
* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা ১/২% অতিরিক্ত সুদে জমা প্রকল্প।
* হিমঘরে চাষিভাইদের বীজ সংরক্ষণ।

অন্যান্য পরিষেবা

* অস্থায়ী মরশুমে নামমাত্র সুদে বন্ধকি সহায়তা।
* ৭৭টি বিনি ফিল মরশুমে জল সেচ।
* মৃত্তিকা পালন।
* কনজুমার্স মারফতে কাপড় জামা বিপণন।
* উন্নতমানের বলদ গরুর চারা সরবরাহ।
* অন্যান্য

এগরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

এগরা : মেদিনীপুর ◆ পিন : ৭২১ ৪২৯
এস টি ডি - ০৩২২০ ◆ ফোন : ৪৪০৪০
রেজি : নং। ৬৬ মিড ◆ তারিখ : ১৩-১-৫৮

কার্যকারী মূলধন : ১০ কোটি টাকার অধিক ; তন্মধ্যে সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ : ৯.২৫ কোটি টাকা

সদস্য সংখ্যা - ৩৬০০

কর্মচারী সংখ্যা - ২৫

ব্যবস্থাপনা : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত বোর্ড

* প্যাক্স হিসাবে সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর কাছে এ এক গর্ব।
* সার্বিক চিন্তা-ভাবনা এবং সমবেত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাই আমাদের সাফল্যের একমাত্র হাতিয়ার।
* সমিতিতে "EARN AND SAVE POLICY"-র মাধ্যমে সকলকে সঞ্চয়ে ব্রতী করার কাজ ছাড়াও কৃষি ও অকৃষি খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পরিষেবা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই তো আমাদের আহ্বান

আমাদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে হোক সমবায়

- আপনার সুখ দুঃখের সঙ্গী হোক সমবায়
- সমবায় দীর্ঘজীবী হোক

কানাইলাল মাইতি	তপনকান্তি কর	দিলীপকুমার সাহু
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

IN THE
CHANGING SCENARIO
AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION
INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOU SAVINGS WITH

HE BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind
in Eastern India, rendering services
for 79 years by a net-work of 35 branches
throughout the district in the field of
Agriculture, Cottage and Small Industries, etc.

SAVE WITH

BURDWAN CENTRAL CO-OPERATIVE BANK

FOR

YOUR SAFTY

Phone (0342) 62-163 / 169 / 165
33-132 / 161 / 162

JOIN WITH US IN THE CO-OP. MOVEMENT FOR A HAPPY SOCIETY

মেদিনীপুর জেলাবাসীর সেবায়

বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

মেদিনীপুর

হেড অফিস : মেদিনীপুর

দূরভাষ : ৬২৪১১/৬২৭৫৯/৬২৭৪৪

ফ্যাক্স : ০৩২২৬-৬২৪১১

* বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা আমানতের উপর অধিক সুদ।
* ৩৪টি শাখা অফিস ও দুটি পে-অফিসের মাধ্যমে সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম করা হয়।
* ব্যক্তিগত, সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে স্বনির্ভর প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান।
* মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও খড়্গপুর শাখা অফিসের মাধ্যমে লকারের সুবিধা।
* সান্ধ্যবিভাগের মাধ্যমে মেদিনীপুর নাগরিকগণের পরিষেবা দান।

সততা, নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিষেবাই আমাদের একমাত্র মূলধন

আসুন আমরা একসাথে এগোই

মৃগাঙ্কশেখর কর

সভাপতি

পত্রিকাটির স্বত্ব সর্বস্বত্ব ইউনিয়নের পক্ষে সম্পাদক কর্তৃক ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (আটতলা), কলিকাতা ৭০০ ০০১, ফোন থেকে প্রকাশিত এবং আরতি প্রিন্টার্স, ১৮৩ বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলিকাতা - ১২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৪১-৭৫৫৮। মূল্য :